মাসুদ রানা

বিস্মরণ

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

বিস্মরণ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7605

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৮
পঞ্চম প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
RANA SHABDHAN
BISHMARON
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনা

চুয়াল্লিশ টাকা

বিস্মরণ ৯৬—২৫৬

সস্তায় মাসুদ রানার বইঃ ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৬/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪২/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	২৮/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪৪/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৩৮/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৪/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩২/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	২৭/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩০/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিন শত্রু	৩৪/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪০/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৬/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৬১-৬২	আক্রমণ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৫/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা (একত্রে)	৪০/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৫৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৩৭/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ (একত্রে)	৪১/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২	৫০/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪১/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৬-২৭৪	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪১/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৪৭/-
২৮০-	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৩৮/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪০/-

বিস্মরণ

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৬৮

এক

ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্, ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্। কু···উ···উ···

মনটা পালাই পালাই করছিল। ভাল লাগল না রানার কাছে কলম্বো। প্রকাণ্ড সব অট্টালিকা, প্রশস্ত সব রাজপথ, লোকে লোকারণ্য বাজার। দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠল সে। বন্দরের সার্বক্ষণিক কর্মব্যস্ততা থেকে পালিয়ে তাই চলেছে রানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খোঁজে—সিলোনের অন্তরের কাছাকাছি। কাণ্ডিতে দু'দিন জিরিয়ে নিয়ে কর্ণগাল, অনুরাধাপুর হয়ে চলে যাবে জাফনা কিংবা মান্নার। তারপর যাবে ঈস্টার্ন প্রভিন্সের ট্রিঙ্কোমালি, বাটিকালোয়া। যদি ভাল না লাগে সাউদার্ন প্রভিন্সের গল্-এ গিয়ে কাটিয়ে আসবে ক'দিন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্যাসিনো দেখার ইচ্ছে ছিল—দেখে নেবে এবার। মন যা চায় তাই করবে সে এই একমাস। ছুটি।

ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্, ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্। কু···উ···উ···

পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। ব্রডগজ লাইন—প্রাণ খুলে স্পীড তুলেছে ড্রাইভার। হেনারাতগোদা, পল্ পাহাবেলা ছাড়িয়ে পুব দিকে চলেছে এবার ট্রেন। বাইরে সবুজের সমারোহ। ফার্স্ট ক্লাস কামরার এক কোণে নরম গদিতে হেলান দিয়ে বসে ট্রেনের দোলায় দুলছে রানা, আর তাকিয়ে আছে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে। কখনও জঙ্গল, কখনও চা বাগান, কখনও রাবার গাছের সারি, আবার কখনও মাঠভর্তি সবুজ ধান দুলে উঠছে হাওয়া লেগে। সারাটা দেশ জুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে একপায়ে। নিঃসঙ্গ।

এবার ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠছে ট্রেন। মাঝে মাঝে উঁচু পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে, কোথাও গভীর খাদ, কোথাও উচ্ছল ঝর্ণা, কোথাও ছোট্ট জলপ্রপাত। কখনও বা ট্রেন চলেছে টানেলের মধ্য দিয়ে। অপূর্ব সব দৃশ্য।

রানা ভাবছে, সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছে সে। বিশ্রাম দরকার। এবারের ছুটিতে দেহমন থেকে সমস্ত গ্লানি, সমস্ত কালিমা মুছে ফেলতে হবে। অনেক, অনেক মানুষের রক্ত লেগে গেছে ওর হাতে। মানুষের জীবন নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলা খেলেছে সে। হুকুমের চাকর মনে করে নিজেকে যতই ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করুক না কেন, কর্তব্য ইজ কর্তব্য বলে যতই প্রবোধ দিক মনকে, যতই ভাবুক এসব কথা ভাবব না—অনেক দিন থেকে ধীরে ধীরে জমেছে এই কালিমা। হাঁপিয়ে তুলেছে রানাকে। নিজেকে ভিখিরির ছেঁড়া, নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত কাঁথার মত মনে হচ্ছে ওর।

হত্যাকে ঘৃণা করে রানা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'হয় মারো, নয় মরো' অবস্থা বাধ্য করেছে ওকে নরহত্যায়। ওকে শেখানো হয়েছে, একজন স্পাই হিসেবে

ডাক্তারের মতই ঠাণ্ডা মাথায় গ্রহণ করতে হবে মৃত্যুকে। বিচলিত হলে চলবে না। তেমন কিছু যদি ঘটে, ভুলে যেতে হবে তৎক্ষণাৎ। আত্মগ্লানিকে প্রশ্রয় দিলেই চেপে ধরবে সে আরও।

কিন্তু ও কি কসাই? এইসব মহারথীদের কি করে বোঝাবে রানা, চোখের সামনে একটি প্রাণকে স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখলে ভুলে থাকা যায় না কিছুতেই। কি আশ্চর্য ভাবে বদলে যায় মানুষ মৃত্যুর ঠিক পরমুহূর্তেই। এই ছিল, এই নেই। লোকটার একটা নাম ছিল, একটা ঠিকানা ছিল, হয়তো একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল—কি যেন বেরিয়ে গেল ওর মধ্যে থেকে, ব্যস, সব আবর্জনা।

আবার ভাবছে কেন সে? মন থেকে এই সব ভাবনা দূর করবার জন্যেই না সে ছুটি নিয়ে এসেছে সিংহলে? অতীত ভুলে যাবে রানা। সব ভুলে যাবে। বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে হালকা করে নেবে মনটাকে। বর্তমান ছাড়া আর কোন কিছুই সত্য নয় ওর কাছে।

সহযাত্রীদের উপর আরেকবার চোখ বুলাল রানা।

কামরায় প্যাসেঞ্জার মোট পাঁচজন। এক পিনে আশি রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন সিলোন ইউনিভারসিটির একজন প্রবীণ আত্মভোলা প্রফেসর—দুইজন ছাত্র গোগ্রাসে গিলছে সে-সব। প্রফেসরের দুই কানের পাশে সামান্য পাকা চুল, আর সারাটা মাথা জুড়ে রাজত্ব করছে একটি চকচকে প্রতিভাদীপ্ত টাক। রানাকেও দলে টানবার চেষ্টা করেছিলেন বৃদ্ধ নানান কৌশলে, কিন্তু রানা কিছুতেই টোপ গেলেনি, মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে সায় দিয়েই আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে যাওয়ার ভান করেছে বাইরের দিকে চেয়ে। বার কয়েক চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে দুই শ্রোতাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে প্রফেসরকে। অনর্গল জ্ঞানবর্ষণ করে চলেছেন তিনি অনন্যোপায় দুই যুবকের উপর। সিলোনের ন্যাশনাল ইকনমির উপর বক্তৃতা চলেছে এখন। প্রয়োজনের অর্ধেক খাদ্য উৎপাদন করছে সিলোন, ভরসা এখন চা, রাবার এবং নারকেল। কিন্তু ওয়ার্লড মার্কেট যেভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, তার উপর লোকসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে আগামী পাঁচ বছরেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

পঞ্চম যাত্রীটি গত স্টেশন থেকে উঠেছে। ওর দিকে একবার চেয়েই নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে দিয়েছেন ওকে প্রফেসর। অত্যন্ত রোগা চেহারা, মুখ ভর্তি বসন্তের দাগ, তার উপর বেঁটে। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। পরনে সাদা কালো কাজ করা সারং (লুঙ্গির মত সিংহলী কাপড়), গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা কলারহীন সাদা লম্বা শার্ট, আর শার্টের উপর একটা ওয়েস্ট কোট। চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। হাতে একটা দামী ব্রিফকেস। বেমানান বেখাপ্পা লাগছে ওকে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে। রানার মুখোমুখি কাঁচুমাচু মুখে জড়সড় ভঙ্গিতে বসে আছে লোকটা। যেন সবার অবহেলা আর অবজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন সে।

চায়ের তেষ্টা পেতেই বাঙ্কের উপর থেকে ফ্লাস্কটা নামাল রানা। ভদ্রতার খাতিরে সামনের লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'খাবেন? দেব এক কাপ?'

এই একটি কথায় যেন পাল্টে গেল লোকটির জগৎ। অদ্ভুত এক কৃতার্থ

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সঙ্কুচিত লোকটার মুখ। চলে এল সে রানার পাশে।

'দেবেন? দেন, খাই এক কাপ। বলছেন যখন, খাওয়াই উচিত। কিন্তু ফ্লাস্কে রাখা চা—ও চা কি আর খাওয়ার যোগ্য আছে, মশায়? বত্রিশ রকমের চা বানাতে পারি আমি। আমাকে আপনি কি চা খওয়াবেন, আমার হাতের চা খেলে জীবনে ভুলতে পারবেন না।' হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্তন করে বলল, 'বেড়াতে এসেছেন বুঝি? টুরিস্ট?'

'হ্যা।'

ফ্লাস্কের এক্সট্রা কাভারে চা ঢেলে এগিয়ে দিল রানা। প্রথমেই নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখল লোকটা। বলল, 'অরেঞ্জ পেকো। এর সাথে বাজে চা-ও মেশানো আছে। আপনাকে সোজা লোক পেয়ে ঠকিয়ে দিয়েছে। পড়ত যদি আমার পাল্লায়!' সুড়ুৎ করে একটা টান দিয়েই প্যাঁচার মত হয়ে গেল লোকটার চেহারা। 'ইশশ্! অরেঞ্জ পেকোর জাত মেরে দিয়েছে, মশাই। নাহ্, আপনাকে এক কাপ চা না খাওয়াতে পারলে মনের খেদ যাবে না আমার। চলেছেন কোথায়? কাণ্ডি?'

'হ্যাঁ।'

'উঠছেন কোথায়? নাথ হোটেলে নিশ্চয়ই?'

'ঠিক নেই…'

'তবে চলুন আমার ওখানে উঠবেন। অবশ্যি গরীবখানা। আপনার রুচিতে…'

'আমার পরিচয় জানলে এ অনুরোধ হয়তো করতেন না আপনি।'

'কেন? আপনি বাঘ না ভাল্লুক?'

'আমি মুসলমান।'

হো হো করে হেসে উঠল দুর্বল লোকটা। বলল, 'পাঁচ লাখ মুসলমান আছে সিংহলে, তা জানেন? আমরা ওদেরকে ''মুর'' বলি। ওদের সঙ্গে তো আমাদের কোন ঝগড়া নেই। রায়ট হয় সিংহলী আর তামিলের মধ্যে। আর মুসলমান হলে কি হয়েছে, আমার হোটেল হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-কিশ্চান সবার জন্যে খোলা।'

'হোটেল আছে নাকি আপনার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বাহ্! হোটেল নেই? তবে আর বললাম কি? নিজের হাতে চা বানিয়ে বেচে ছোট্ট রেস্টুরেন্টকে দোতলা হোটেল বানিয়ে ফেলেছি না? এক বছর হলো বিয়েও করে ফেলেছি। খুব সুন্দর বউ। ওকেও শিখিয়ে দিয়েছি চা বানানো। চলেন না আগে, সবই দেখতে পাবেন। আপনি আমার গেস্ট।'

রানা ভাবল, আরে, এ দেখছি আরেক প্রফেসর। চা খাইয়ে মহা ঝামেলায় পড়া গেল তো। হ্যাঁ-না কোনও জবাব দিল না সে, ভাবল, স্টেশনে নেমে কাটিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু চা শেষ করেই আবার প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করল রানাকে দুর্বল লোকটা।

'নামটা কি মশায়ের?'

'মাসুদ রানা। আপনার?'

'আমার নাম থিরুগনসম্পন্দমুথিউনাইনার পিল্লাই।'

রানার মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে গেল, 'শাব্বাশ!'

কথাটা গায়ে মাখল না লোকটা। বলল, 'হ্যাঁ। নামটা একটু বড়ই। ইচ্ছে করলে থিরু বলতে পারেন, কিংবা পিল্লাই-ও বলতে পারেন।'

কাণ্ডি স্টেশনে গাড়ি থামতেই হুড়মুড় করে উঠে এল দু'তিনটে কুলী। একজনের মাথায় সুটকেসটা চাপিয়ে দিয়ে রানাকে ইঙ্গিত করল থিরু ওর পিছন পিছন যাবার জন্যে। বীর হনুমানের মত চলল সে আগে আগে। উপায়ান্তর না দেখে ওর পিছন পিছন স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে এক্কা গাড়িতে চেপে বসল রানা থিরুর পা.শ।

সন্ধের আর বেশি দেরি নেই। কাণ্ডির দর্শনীয় জিনিসগুলো দেখাতে দেখাতে চলল থিরু। প্রকাণ্ড একটা পাঁচতলা দালানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখেন নাথ লাগজারি হোটেল। মালিক হচ্ছেন রঘুনাথ জয়ামান্নে। ওই যে স্টেডিয়াম দেখা যাচ্ছে—ওইটাও। শুধু এগুলো কেন, কাণ্ডির অর্ধেকই আসলে রঘুনাথের।'

রানা চেয়ে দেখল একটা পাহাড়ের মাথায় বেশ বড় একটা স্টেডিয়াম দেখা যাচ্ছে। মাঠের চারদিক থেকে ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা দেখে মনে হলো রাতেও খেলা হয় এখানে।

'স্টেডিয়ামটা সরকারী না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। কাণ্ডির আইন-কানুন আলাদা। ওটা রঘুনাথের। ও হচ্ছে কাণ্ডির রাদালা (সরদার)। সাঙ্ঘাতিক ক্ষমতা ওর। সবাই ভয় করে চলে ওকে। প্রত্যেক রবিবার কুস্তি হয় ওই স্টেডিয়ামে। এটা তো কিছুই না, মস্ত বড় দুটো টী এস্টেট আছে রঘুনাথের। এছাড়াও আছে রাবার আর নানান ধরনের দামী পাথরের ব্যবসা। যাকগে, ওর আছে, থাকুক। এবার বাঁয়ে যেতে হবে। এই গাড়োয়ান...'

থিরুগনসম্প..., মানে প্রকাণ্ড নামের এই দুর্বল লোকটাকে রানার বেশ ভাল লাগল। খুবই সদালাপী। চেহারা যেমনই হোক ভিতরে একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ আছে। এই অল্পক্ষণের আলাপের মধ্যেই বহু গল্প শুনিয়ে ফেলেছে সে রানাকে। ওরা তামিল। বিশ-তিরিশ পুরুষ ধরে আছে কাণ্ডিতে স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে। খুবই গরীব অবস্থা থেকে পরিশ্রম এবং বুদ্ধি বলে আজ কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখতে পেয়েছে। বউ ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। পল্ পাহাবেলা গিয়েছিল ব্যবসার কাজে।

নিচে রেস্তোরাঁ, দোতলায় হোটেল। একটা বেয়ারার মাথায় রানার সুটকেস চাপিয়ে দোতলায় পাঠিয়ে দিল থিরু। রানাকে বলল, 'চলেন, আগে চা খাওয়া যাক।'

তিনটে ধাপ উঠেই ছোট্ট একটা বারান্দা পেরিয়ে রেস্তোরাঁর সুইং ডোর। দু'পাট খোলা রয়েছে সুইং ডোর, ম্লান ফ্লোরেসেন্ট আলোয় ভিতরটা এক নজর দেখে নিল রানা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। থিরুও।

বেশ বড় ঘর। আট-দশটা টেবিল ছড়ানো ছিটানো আছে ঘরের মধ্যে। মাত্র তিনটে টেবিলে লোক, বাকিগুলো খালি। একটা টেবিলে বেয়ারা নাস্তা দিচ্ছে,

খরিদ্দারের চেহারা দেখা যাচ্ছে না। দরজার কাছের টেবিলটায় আধ-ময়লা কাপড় পরা দু'জন মাঝবয়েসী লোক। আর কোণের টেবিলে প্রকাণ্ড চেহারার একজন লোক বসে আছে দরজার দিকে পিছনে ফিরে। বিরাট কাঁধ, ঢোলা শার্টের হাতা গুটানো, ভীম দুই বাহু দেখা যাচ্ছে। তার উল্টোদিকে বসে আছে টাকমাথা মোটাসোটা এক বয়স্ক লোক।

অল্পবয়েসী চলনসই-সুন্দরী একটি মেয়ে চার-পাঁচটা চায়ের কাপ সাজানো একটা ট্রে দু'হাতে ধরে এসে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড লোকটির টেবিলের সামনে। একটা কাপ মাত্র নামিয়েছে, এমন সময় মেয়েটির দিকে চেয়ে অশ্লীল হাসি হেসে চোখ টিপল প্রকাণ্ড লোকটা। ডানহাতে মেয়েটির হাঁটুর কাছে চেপে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত আড়ষ্ট হয়ে গেল মেয়েটির শরীর। ট্রে-টা পড়ে যাচ্ছিল হাত থেকে, সামলে নিয়ে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু পারল না। শক্ত করে পা-টা চেপে ধরে বেহায়ার মত হাসছে লোকটা। রানা ভাবল এখুনি চটাশ করে চড় মারবে মেয়েটি। কিন্তু তা না করে নিচু হয়ে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করছে সে। হোটেলে অশোভন কেলেঙ্কারি কোনও কাণ্ড ঘটাতে চায় না সে। কিন্তু শক্তিতে কুলাল না। হাতটা হাঁটু বেয়ে উঠে আসছে উপরে।

এগোতে গিয়েও থেমে গেল রানা। কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলেও বুঝতে পেরেছে সে এই মেয়েটিই থিরুর সুন্দরী স্ত্রী। থিরুর সামনে রানা তার স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে ওর আত্মসম্মানে লাগতে পারে।

বুলেটের মত ছুটে গেল থিরু কোণের টেবিলটার দিকে।

থিরুকে দেখতে পেয়েই প্রকাণ্ড লোকটার বাহুর উপর দুটো টোকা দিয়ে কি যেন বলল মোটা লোকটা। বাম হাতে এক ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল সে মোটা লোকের হাত। ব্যথা পেয়ে মুখ কুঁচকাল মোটা। ঘাড় ফিরিয়ে থিরুকে দেখল একবার দৈত্য। তাচ্ছিল্য ফুটে রয়েছে সে দৃষ্টিতে।

'শালা, রোদিয়ার (গণিকা) বাচ্চা, হারামখোর...'

ধাঁই করে এক কিল মারল থিরু লোকটার নাকের উপর। মেয়েটার পা ছেড়ে দিয়ে এক ধাক্কায় পাঠিয়ে দিল লোকটা তাকে দশ হাত তফাতে। একটা চেয়ার উল্টে টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেয়েটা। ট্রে-টা হাত থেকে পড়ে ঝন্ঝন্ করে ভেঙে গেল তিনটে কাপ তশতরী। আরেকটা ঘুসি মারল থিরু, চেয়ার ছেড়ে না উঠেই বিদ্যুৎগতিতে মাথাটা একটু পিছনে সরিয়ে নিল লোকটা। ঘুসি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ব্যালান্স হারিয়ে সামনে এগিয়ে গেল থিরু খানিকটা। ঠিক সেই সময়ই পেটের উপর দড়াম করে ঘুসি পড়ল একটা। ব্রিফকেসটা খসে পড়ল বাঁ হাত থেকে, ছিটকে কাউন্টারের পিতলের রেলিং-এর উপর গিয়ে পড়ল থিরু, ওখান থেকে ঝুপ করে মাটিতে। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসে হাঁপাচ্ছে সে। দম নিতে পারছে না ভাল মত।

উঠে দাঁড়াল প্রকাণ্ড লোকটা চেয়ার ছেড়ে। রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রয়েছে ঘরের সবাই ওর দিকে।

'চল হে, যাই। জমবে না এখানে,' বলল সে মোটা টেকো লোকটাকে।

'ছি! এটা কি করলে, বীরবর্ধন? কাজটা কি···' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে মোটা লোকটা।

'চোপ রাও!' এক কথায় থামিয়ে দিল বীরবর্ধন মোটাকে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল খিরু। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল সে খিরুর কাছে। বলল, 'অতিরিক্ত আস্পর্ধা হয়ে গেছে তোর, ব্যাটা ইঁদুরের বাচ্চা! আমার গায়ে হাত তুলিস! পিষে ফেলে দেব না!' প্রচণ্ড এক লাথি তুলল সে।

তিন লাফে পৌঁছে গেল রানা। পিছন থেকে ধরে ফেলল বীরবর্ধনের শার্টের কলার, সরিয়ে আনল দুই "' পাঁই করে একপাক ঘুরে রানার দিকে ফিরল দৈত্য। টাশ্‌শ্ করে পিস্তলের আওয়াজ তুলল রানার হাতের শক্ত চড় লোকটার গালে লেগে।

প্রচণ্ড জোরে মেরেছে রানা চড়টা। ব্যথা দেবার উদ্দেশ্যেই। দু'পা পিছিয়ে গেল বীরবর্ধন। পানি বেরিয়ে এল দুই চোখ থেকে। মোলায়েম কণ্ঠে বলল রানা, 'লাথি যদি মারতেই হয়, আমাকে মারো, বাছা। পা দুটো ভেঙে দিয়ে ঠেলাগাড়িতে করে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।'

পাগলের মত ঘুসি বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বীরবর্ধন রানার উপর। রাগে অন্ধ না হয়ে গেলে কেউ কাউকে এভাবে আক্রমণ করে না। ওই ঘুসি হাতীর পিঠে পড়লে সে-পিঠ বাঁকা হয়ে যাবে। কিন্তু রানাকে এতখানি তুচ্ছ মনে না করলেই ভাল করতো বেচারা। অন্তত ডিফেন্স গার্ড রেখে তারপর এগোনো উচিত ছিল ওর।

বিদ্যুৎবেগে সেঁটে গেল রানা বীরবর্ধনের গায়ের সঙ্গে। মাঝের আঙুলটা আধ ইঞ্চি সামনে বাড়িয়ে রেখে ছয় ইঞ্চি তফাৎ থেকে ঘুসি চালাল রানা ওর টাক্‌রার নরম মাংসের উপর। পরমুহূর্তে বাঁ হাতের আঙুলগুলো সোজা রেখে ঝটাং করে মেরে দিল নাকের দুই ফুটোর মাঝখানের নরম হাড়ের উপর। কলকল করে রক্ত বেরিয়ে এল নাক থেকে। টলছে বীরবর্ধন। এক পা পিছিয়ে এসে নক্ আউট পাঞ্চ কষাল রানা এবার ওর চোয়ালের ওপর। দড়াম করে শানের উপর আছড়ে পড়ল বীরবর্ধনের পাহাড়-প্রমাণ ধড়। নাকটা ভেঙে গিয়েছে আগেই, এবারে সুপারির মত ফুলে উঠল কপালের একপাশ।

মোটা লোকটার দিকে ফিরল রানা। বলল, 'দূর হয়ে যাও এখান থেকে এই গর্দভকে নিয়ে। এক্ষুণি। নইলে তোমারও এই দশা করে দেব।'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে মোটা লোকটা ধরাশায়ী বীরবর্ধনের দিকে। দুই চোখে অবিশ্বাস। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে দেহটার উপর। রানা চলে এল খিরুর পাশে। হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওকে। রাগে কাঁপছে তখনও খিরু, আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল বীরবর্ধনের উপর, ঠেকাল রানা। বলল, 'গাধা পিটালে মানুষ হয় না। কেন খামোকা নিজের হাত ব্যথা করবেন? যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে ওর। ছেড়ে দিন, মাফ করে দিন এবারের মত।'

মেয়েটি এসে খিরুর একটা হাত ধরল। বেয়ারা ভাঙা কাপ তশতরী পরিষ্কার করবার জন্যে ঝাঁটা নিয়ে এসেছে। খিরুকে ওর স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে মোটা লোকটার না খাওয়া চায়ের কাপটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে চুমুক দিল

রানা।

জ্ঞান হারিয়েছে বীরবর্ধন। ঝাঁকি দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছে মোটা লোকটা। কিন্তু পাহাড় নড়ে না। অসহায়ভাবে এদিকে ওদিকে মাথা নাড়াচ্ছে মোটা। হাঁক ছাড়ল রানা।

'কি হলো? গেলে না এখনও?'

রানার দিকে চাইল মোটা লোকটা করুণ দৃষ্টিতে। যেন এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। বলল, 'রোববার কুস্তি আছে ছেলেটার, আর আজ ওর নাকটা ভেঙে দিলেন আপনি?'

'ঘাড়টা যে মটকে দিইনি এই বেশি। জলদি কেটে পড়ো, নইলে বাকি কাজটুকু কমপ্লিট করে দেব।'

নড়েচেড়ে উঠল বীরবর্ধন, একটা অস্ফুট গোঙানি বেরোল ওর মুখ দিয়ে, তারপর উঠে বসল। বাম গালে পাঁচ আঙুলের দাগ, চোয়ালটা ঝুলে আছে একটু, নাকটা আর দর্শনযোগ্য নেই। অনেক কষ্টে তুলে দাঁড় করাল ওকে মোটা লোকটা। রানার দিকে একবারও চাইল না বীরবর্ধন, সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'কেটে পড়ুন!' কানের কাছে নিচু স্বরে কথা বলে উঠল কে যেন। রানা চেয়ে দেখল একজন খরিদ্দার টেবিল ছেড়ে উঠে এসেছে ওর কাছে। চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা। আবার বলল সে, 'ভাল চান তো এক্ষুণি কেটে পড়ুন, মশায়। কাকে মেরেছেন জানেন? ও হচ্ছে কাণ্ডির সেরা ফাইটার বীরবর্ধন। হাম্বানটোটার চাম্পিয়ানের সঙ্গে আগামী পরশু খেলা আছে ওর স্টেডিয়ামে। লাখ লাখ টাকা বাজি ধরা হয়েছে। আমি ঠাট্টা করছি না। কাণ্ডি ছেড়ে এক্ষুণি পালিয়ে যান। রঘুনাথের কানে এই খবরটা গেলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে আপনার। ভয়ঙ্কর লোক এই রঘুনাথ। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান ও টের পাবার আগেই।'

দুই

স্বামী-স্ত্রীর সাধাসাধিতে বেশি খেয়ে ফেলল রানা। অষ্টব্যঞ্জন তৈরি করেছে লীলা অতিথির জন্যে। ঝাল একটু বেশি, আর নারকেলের একটু বেশি ছড়াছড়ি, তাছাড়া তামিল রান্না অনেকটা বাঙালীদের মতই। সরু সিদ্ধ চালের ভাত। তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে খেল রানা। অনেক গল্প শোনাল থিরু। এটা-ওটা-সেটা জোর করে খাওয়াল লীলা। নিজের হাতে তৈরি চাটনি আচার বাধ্য করল চেখে দেখতে। খাওয়া শেষ হয়ে আসতেই দুই মিনিটের জন্যে গায়েব হয়ে গিয়েছিল রান্নাঘরের ভিতর, হঠাৎ চোখ তুলতেই দেখল রানা একটা থালায় পাহাড়সমান উঁচু মিষ্টি নিয়ে ফিরছে সে। সর্বনাশ! প্রমাদ গুনল রানা। এমনিতেই হাঁসফাঁস অবস্থা, তার উপর যদি…ওরেব্বাপরেবাপ, অসম্ভব! জান বাঁচানো ফরজ। অবলীলাক্রমে মিথ্যে কথা বলল সে। ডাক্তারের নিষেধ।

এর ওপর কথা চলে না। কাজেই আবার রওনা হলো লীলা রান্নাঘরের দিকে।

'তাহলে কিছু ফল-মূল কেটে নিয়ে আসি।'

'দোহাই আপনার। প্লীজ। একটা কথা শুনুন,' আধ গ্লাস পানি খেয়ে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল রানা গ্লাসটা। 'সত্যি বলছি, এই পর্যন্ত ভরে গেছে, আর পারব না। এমনিতেই অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছি। এরপর যদি জোর করেন তাহলে আর চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারব না।'

রানার করুণ মিনতি শুনে হেসে ফেলল লীলা। বলল, 'আচ্ছা, থাক তাহলে। এবার চা নিয়ে আসি।'

'হ্যাঁ। চা খাওয়া যায়।'

'চট করে উঠে পড়বেন না যেন আবার। কথা আছে।' চলে গেল লীলা লীলায়িত ভঙ্গিতে।

সিগারেট ধরাল রানা। কিছুক্ষণ যাবৎ গম্ভীর মুখে কি যেন চিন্তা করছে থিরু। কিছুক্ষণ কেন, সন্ধের সেই ঘটনার পর থেকেই কথা কম বলছে সে। রানাকে দোতলায় ওর কামরা দেখিয়ে দিয়ে বউয়ের সঙ্গে কি নিয়ে যেন আলোচনা করেছে সে অনেকক্ষণ। স্নান সেরে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নেমে এসেছে রানা নিচে—তখনও কথা হচ্ছিল ওদের মধ্যে, রানাকে দেখেই থেমে গেল। সেই ব্যাপারেই কিছু বলবে বোধহয় লীলা।

'কি ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা থিরুকে।

'ভাবছি রঘুনাথ কিভাবে নেবে আজকের ঘটনাটা,' বলল থিরু চিন্তিত মুখে।

'আপনাদের একজন কাস্টোমার তো আমাকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছে।'

'আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম, পরে বুঝলাম বিশেষ ভয়ের কিছুই নেই। বিঘ্নরাজের মুখেই সমস্ত ঘটনা শুনতে পাবে রঘুনাথ। আর আসলে হাম্বানটোটার চাম্পিয়ানের পিছনেই টাকা ধরেছে সে এবার। বীরবর্ধনকে মারলে ওর বিশেষ কিছু যায় আসে না। যদি রঘুনাথ একে ব্যাক করত তাহলে আপনার পালানো ছাড়া উপায় ছিল না।'

'বিঘ্নরাজটা আবার কে হলেন? ওই দৈত্যটার সাথের মোটা, টেকো লোকটা?'

'হ্যাঁ। বীরবর্ধন তো ওরই প্লেয়ার। বিঘ্নরাজ লোকটা আসলে খারাপ না। মাঝে থেকে ওর কপালটা পুড়ল বলে খারাপই লাগছে আমার।'

চা নিয়ে এল লীলা। থিরুর পাশের চেয়ারটায় বসল। চা খেতে খেতে খানিকক্ষণ উসখুস করল থিরু তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কতদিন থাকবেন কাণ্ডিতে?'

'ভাবছি আগামীকাল উভা লাইনে বাদুলার ট্রেনে চাপব। শুনেছি এত সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীর আর কোন ট্রেন জার্নিতে দেখতে পাওয়া যায় না।'

'এখানে থেকে গেলে হয় না? মানে, আপনার তো আত্মীয়স্বজন কেউ নেই বলছিলেন, আধাআধি শেয়ারে আমাদের পার্টনার হয়ে যান না? আপনাকে লীলার আর আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনার মত একজন লোক দরকার আমাদের

এখানে। বেশ ভাল রোজগার হয়, অর্ধেক করলে চার পাঁচশো টাকা হবে। কি বলেন, থাকবেন আমাদের সাথে?' সব কথা একসাথে বলে ফেলল থিরু।

হো হো করে হেসে উঠল রানা। 'আপনি কি পাগল হয়েছেন? আমাকে চেনেন না জানেন না, একজন লোককে মেরে চিৎ করে দিয়েছি, ব্যস ব্যবসার অর্ধেক শেয়ার দেয়ার জন্যে খেপে উঠেছেন? ছেলেমানুষির একটা...'

'আমাদের সাহায্য দরকার, মিস্টার রানা!' সনির্বন্ধ অনুরোধ থিরুর কণ্ঠে। 'শক্তি আর সাহসেরও দরকার আছে। মাঝেমাঝেই এই রকম গোলমাল হয় আমাদের এখানে। আমি দুর্বল মানুষ, কিছুই করতে পারি না। আমার আত্মীয়স্বজন ভাই বেরাদার কেউ নেই। আর রাদালার কোনও ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায় না। আপনি যদি থাকেন...'

'আপনাদের অসুবিধাটা আমি বুঝতে পেরেছি, মিস্টার পিল্লাই। কিন্তু আমার পক্ষে এখানে থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। সব কথা বুঝিয়ে বলাও যাবে না। তবে আমি আপনাদের সমস্যার একটা সহজ সমাধান করে দিয়ে যাব।'

'কি রকম?'

'আমি কয়েকটা কৌশল শিখিয়ে দিয়ে যাব আপনাকে, যার ফলে ওই রকম এক-আধটা বীরবর্ধনকে আপনিও পিটিয়ে লাশ করতে পারবেন।'

'আমি?' করুণ হাসি হাসল থিরু। 'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

'না। ঠাট্টা করছি না আমি। মারামারি করতে আসলে জোরের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন কৌশলের। একটু ভেবে বলুন, আমার গায়ে কি ওই বীরবর্ধনের চেয়ে বেশি জোর আছে?'

'তা নেই। ওর গায়ে অসুরের শক্তি।' স্বীকার করতে হলো থিরুকে।

'অথচ ও আমার সঙ্গে পারল না কেন?'

'কিন্তু আপনার দশ ভাগের এক ভাগ শক্তিও তো আমার গায়ে নেই।'

'শক্তির প্রয়োজন নেই। আরও একটা জিনিস মনে করবার চেষ্টা করুন। আমি কি ওকে খুব জোরে মেরেছিলাম? না। জোরে মারলে মরেই যেত লোকটা। ওকে মেরে ফেলার মত গায়ের জোর শুধু আপনার কেন, লীলাদেবীরও আছে।' কথাটা বিশ্বাস হয়ে এসেছে থিরুর। তাই আর বোঝাবার চেষ্টা না করে সোজাসুজি বলল, 'কাল সকালে আধঘণ্টার মধ্যে আমি আপনাকে ছয়টা কৌশল শিখিয়ে দিয়ে যাব। প্রতিদিন দশ মিনিট করে এক সপ্তাহ প্র্যাকটিস করবেন। ব্যস, আর কিছু লাগবে না। লীলাদেবীকেও শিখিয়ে দেবেন। দুজন বেয়াড়া লোকের উপর বার দুই এই কৌশল প্রয়োগ করলেই ভবিষ্যতে আর কেউ বেয়াদবি করতে সাহস পাবে না।'

উৎসাহ উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করছে লীলার দুই চোখ। বলল, 'আমিও পারব? সত্যি? কী মজা হবে, তাই না?'

রানা মুচকে হাসল একটু। বলল, 'দেখুন তো, মাসে মাসে পাঁচশো করে টাকা বাঁচিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, তবু আরেক কাপ চা খাওয়াবার কথা ভাবছেন না একটিবারও!'

'আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।' মিষ্টি হেসে চলে গেল লীলা রান্নাঘরের দিকে।

তিন

সকালে নাস্তার পর চা খাচ্ছে রানা, এমনি সময় ঘরে এসে ঢুকল থিরু। ভোর বেলা আধ ঘন্টা ট্রেনিং দিয়েছে রানা থিরুকে। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে শিখেছে সে কৌশলগুলো। সবশেষে রানাকে পাঁচ হাত দূরে আছড়ে ফেলে দিয়েই পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এসে গেছে ওর। হাসি গিয়ে ঠেকেছে দুই দিকের দুই কান পর্যন্ত। এখনও সে হাসি ম্লান হয়নি একবিন্দু। যেন গোপন কি পরামর্শ করছে এমনিভাবে রানার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'একটা লোক এসেছে নিচে। মাস দুয়েক আগে আমাকে অপমান করেছিল। দেব নাকি দু'ঘা লাগিয়ে?'

হেসে ফেলল রানা। অস্থির হয়ে উঠেছে থিরু নিজের গোপন বিদ্যা জাহির করবার জন্যে। ঠিক ছেলেমানুষের মত। কিছুক্ষণ আগেই লীলা এসে নালিশ করে গেছে, ওর ডান-হাতটা নাকি ভেঙে ফেলার জোগাড় করেছিল থিরু বেমক্কা এক মোচড় দিয়ে।

'আপনি দেখছি ঝগড়া কুড়োবার তালে আছেন।'

'না মশায়, না। আসলে আমার খালি হাসি পাচ্ছে। যত ষণ্ডামার্কা লোক চা খেতে আসছে সবাইকে "আহা বেচারা" মনে হচ্ছে। অথচ কাউকে কিছু বলতে না পেরে ভুট্ভুট্ করছে পেটের ভেতরটা। যাক, যে-জন্যে এসেছিলাম— বিঘ্নরাজ এসে বসে আছে অনেকক্ষণ হলো, দেখা করতে চায় আপনার সঙ্গে। বিদায় করে দেব, না বসিয়ে রাখব, না নিয়ে আসব?'

'কেন দেখা করতে চায় বলেছে কিছু?'

'নাহ্। জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল আপনার কাছে বলবে।'

'আচ্ছা, ওপরেই পাঠিয়ে দিন তাহলে।'

একটু পরেই হাঁসফাঁস করতে করতে ঘরে ঢুকল বিঘ্নরাজ। চেহারার দিকে চাওয়া যায় না। চোখের কোণে কালি—যেন সাতদিন সাতরাত ঘুম হয়নি ওর। তেলতেলে একটা মলিন ভাব ফুটে রয়েছে ওর মুখে। রানার ইঙ্গিতে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। দুই কনুই টেবিলের উপর রেখে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরল কপালের দুই পাশ।

ও কিছু বলবার আগেই রানা বলে উঠল, 'আপনার পালোয়ান রোববার কুস্তি করতে পারছে না শুনে আমি সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু আমার কি আর করবার ছিল, বলুন? উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে ওর।'

'সেটা আর আমাকে বলতে হবে না। আমি নিজেই তো দেখেছি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বিঘ্নরাজ। 'অসম্ভব হারামী আর বজ্জাত ছোকরাটা। জীবন আমার অতিষ্ঠ করে তুলেছে একেবারে। যেখানেই যাবে সেখানেই গোলমাল বাধাবে একটা না একটা।' হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ওই মার আপনি শিখলেন কোথায়?'

'আমি কিছুদিন জাপানে ছিলাম। ওখানেই শখ করে শিখেছিলাম সামান্য কিছু। আমি জানতাম না অতখানি আনাড়ি আপনার ছোকরা—তাহলে আরও আস্তে মারতাম।'

'আনাড়ি? বলেন কি আপনি? কাণ্ডির সেরা ফাইটার ও। তিন হাজার টাকা পায় প্রতি মাসে। হাম্বানটোটার চেয়ে অনেক ভাল। কিন্তু হলে কি হবে, আপনার কাছে তো দেখলাম নস্যি। ধরতে গেলে সারাজীবনই এই লাইনে আছি, কিন্তু এমন মার তো জীবনে দেখিনি! দুইটাতেই খতম!' চোখ বড় বড় করে চাইল বিঘ্নরাজ রানার দিকে।

'ওটা হঠাৎ হয়ে গেছে। ঝড়ে বক…মানে, অপ্রস্তুত অবস্থায় লেগে গেছে।'

'উঁহুঁ। আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি, আপনি এই লাইনেরই লোক। শেষের যে নক্-আউটটা মারলেন, ওটা তো রীতিমত ওস্তাদের হাতের কাজ। যুদ্ধের ট্যাঙ্কও ট্যাপ খেয়ে যাবে।' টেবিলের ওপর একটা তশতরীতে রানার অভুক্ত একখানা বাটার-টোস্ট ছিল, অন্যমনস্কভাবে সেটা তুলে নিয়ে কামড় দিল বিঘ্নরাজ। 'আরও তিনজন পালোয়ান আছে। কিন্তু অন্য লোকের সাথে কন্ট্রাক্ট সই করা আছে ওদের—কোনও ম্যানেজারই ধার দিতে রাজি হলো না। এদিকে রঘুনাথ কিছুই শুনতে চায় না, বহু টাকা ধরেছে ও বাজি—সোজা বলে দিয়েছে যেখান থেকে পারো লোক নিয়ে এসো, রোববার কুস্তি হতেই হবে। যদি জোগাড় করতে না পারো তাহলে যে লোকটা বীরকে মেরেছে…' থেমে গেল বিঘ্নরাজ। নিজের হাতে বাটার-টোস্ট দেখে বিস্মিত হয়ে নামিয়ে রাখল সেটা তশতরীর ওপর। টেবিলের ওপর রাখা হাতের সঙ্গে কথা বলছে এমনিভাবে বলল। 'আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে, মিস্টার মাসুদ রানা। ছোট ছোট আটটা ছেলেমেয়ে আমার, পথে বসতে হবে ওদেরকে নিয়ে। আমাকে যদি মেরে ফেলে তাহলে ওদেরকে দেখার কেউ নেই।'

'তা, আমি কি করতে পারি বলুন?'

রানার কণ্ঠে হয়তো একটু সহানুভূতির আভাস ছিল, হঠাৎ রানার দুই হাত ধরে ফেলল বিঘ্নরাজ। 'আমাকে বাঁচান, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার দুটো হাত ধরে অনুরোধ করছি, আমি বুড়ো মানুষ, দয়া করে আমাকে বাঁচান। নইলে মেরে ফেলবে আমাকে রঘুনাথ।'

ব্যাপারটা সবই বুঝতে পারল রানা। কেন ওর কাছে এসেছে বিঘ্নরাজ, কি করাতে চায় সে ওকে দিয়ে, কিছুই বুঝতে বাকি রইল না ওর। হঠাৎ রেগে গেল সে। এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল হাত দুটো।

'গেট আউট!' দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখাল রানা। 'বেরিয়ে যান এখান থেকে। কোনও রকম সাহায্য করতে পারব না আমি আপনাকে। কুস্তি করে বেড়ানো আমার পেশা নয়। আপনার সমস্যা নিয়ে আপনি দূর হয়ে যান আমার সামনে থেকে।'

কেউ যেন চাবুক মারল বিঘ্নরাজকে। রক্তশূন্য হয়ে গেল চেহারাটা, কুঁচকে গেল গাল দুটো। অর্থহীন দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল সে রানার মুখের

দিকে। সব আশা ভরসা দপ করে নিভে গেছে যেন ওর। আর একটি কথা না বলে ধীর পায়ে এগোল সে দরজার দিকে। মাথাটা ঝুলে পড়তে চাইছে সামনের দিকে।

রানা বুঝল, হার হয়ে গেছে ওর। এই অসহায় লোকটাকে কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু একে সাহায্য করতে গেলে বিচ্ছিরি ঝামেলায় পড়ে যাবে সে। দেরিও হয়ে যাবে দুই দিন। বেড়াতে এসে এ কী ঝামেলায় জড়াচ্ছে সে নিজেকে? নিজের উপরই অসম্ভব রেগে গিয়েছিল রানা। সেই রাগ গিয়ে পড়েছিল বিঘ্নরাজের উপর। কিন্তু রেগে গিয়েও তো লাভ হলো না কিছুই।

'শুনুন,' ডাকল রানা।

থমকে দাঁড়াল বিঘ্নরাজ। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল পিছন দিকে। রানা দেখল জল গড়াচ্ছে ওর চোখ থেকে। টনটন করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা বুড়ো মানুষটাকে কাঁদতে দেখে।

'কি ধরনের কুস্তি হয় আপনাদের এখানে? ফ্রী স্টাইল?' জিজ্ঞেস করল রানা নরম কণ্ঠে।

আধ ময়লা রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে ফিরে এল বিঘ্নরাজ। একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছে সে, কিন্তু ভরসা করতে পারছে না।

'অনেকটা ফ্রী স্টাইলের মত। কিন্তু তার চাইতেও ফ্রী। হাত পা দাঁত নখ যে যা খুশি ব্যবহার করতে পারে, কোন নিষেধ নেই।'

'বক্সিং-ও চলবে?'

'সব।'

'কি করম ফাইটার হাম্বানটোটার চাম্পিয়ন?'

'বীরবর্ধনের চেয়ে খারাপ, কিন্তু অন্য অনেকের চেয়ে অনেক ভাল। খুবই পেটা শরীর, জোরও অনেক। অবশ্যি ওর ভাল-মন্দতে কিছুই এসে যায় না। আপনি যদি কয়েক রাউণ্ড টিকে যেতে পারেন তাহলেই চলবে। রঘুনাথ বাজি ধরেছে ওর নামেই। আর যদি দেখেন বেশি মারছে, চিৎ হয়ে পড়ে গেলেই হলো। দশ গুনলেও উঠবেন না, ব্যস।'

বাম হাতের তালু দিয়ে কিছুক্ষণ গাল ঘষল রানা চিন্তিত মুখে। তারপর বলল, 'প্র্যাকটিস নেই বেশ কিছুদিন। তা আপনাদের জিমনেশিয়ামটা কোথায়? এক্সট্রা হ্যাণ্ড পাওয়া যাবে প্র্যাকটিসের জন্যে? কথা দেবার আগে নিজের অবস্থাটা একটু বুঝে নিতে চাই।'

বসে ছিল বিঘ্নরাজ, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

'চলুন না, স্টেডিয়ামের কাছেই আমাদের জিমনেশিয়াম। বীরবর্ধনের প্র্যাকটিস পার্টনার স্যানসোনিও আছে ওখানেই। এখুনি যাবেন?'

এতক্ষণ কথা হচ্ছে দেখে দুই কাপ চা পাঠিয়ে দিয়েছে থিরু দোতলায়। কিন্তু চা খাওয়ার দেরিটুকুও বিঘ্নরাজের পক্ষে অসহ্য—তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলল। রানার রাজি হওয়া না হওয়ার উপরই নির্ভর করছে এখন ওর সবকিছু। বেরিয়ে এল ওরা হোটেল থেকে।

জিমনেশিয়ামটা আর দশটা আখড়ার মতই। আর্মি জিমনেশিয়ামের কথা মনে

পড়ে গেল রানার। সেই পরিচিত গন্ধটা পেল সে এখানেও। দুটো ট্রেনিং রিং আছে, পাঞ্চিং ব্যাগ আছে, বড় বড় আয়না আছে, ডাম্বেল, বারবেল, প্যারালেল বার সব আছে: এক কোণে আছে ওজন মাপার যন্ত্র, আর আছে ধূলিমলিন সতরঞ্চি।

বিঘ্নরাজকে দেখে এগিয়ে এল গরিলা সদৃশ স্যানসোনি। এতক্ষণ ওর জন্যেই বসেছিল সে, আর সবাই চলে গেছে যে-যার কাজে। আখড়া একদম ফাঁকা।

'এই যে স্যানসোনি, ইনি হচ্ছেন মিস্টার মাসুদ রানা। বীরবর্ধনের বদলে ইনিই ফাইট করবেন কাল। প্র্যাকটিস দিতে হবে এঁকে।'

একটু অবাক হয়ে চাইল স্যানসোনি রানার একহারা শরীরের দিকে। কোথায় বীরবর্ধন, আর কোথায় এই লোক! বীরবর্ধন, আউট হয়ে গিয়েছে এর হাতে? আশ্চর্য!

কাপড় ছেড়ে রেডি হয়ে নিল দু'জন। জাঙ্গিয়ার উপর শক্ত একটা এক্সট্রা প্যাড পরবার নিয়ম—এইটুকুই যা প্রোটেকশন। এছাড়া শরীরের যে কোন জায়গায় মারতে পারবে প্রতিপক্ষ। রিং-এর ভিতর চলে এল রানা এবং স্যানসোনি।

খালি গায়ে রানাকে দেখে কিছুটা নরম হলো স্যানসোনির অবজ্ঞাভরা দৃষ্টি। গঠনটা একহারা হলে কি হবে, পেটা শরীর। একটু নড়লেই সর্বাঙ্গে ঢেউ খেলে যাচ্ছে অসংখ্য পেশী। বিদ্যুতের মত গতি হবে এই লোকের।

প্রথমেই নিয়ম-কানুনগুলো শিখে নিল রানা। সিংহলী কুস্তি সে দেখেনি কোথাও, তাই স্যানসোনি আর বিঘ্নরাজকে মক্ ফাইট করে দেখাতে বলল। তারপর প্রস্তুত হলো সে যুদ্ধের জন্যে।

পনেরো মিনিট তুমুল যুদ্ধ হলো। প্রথম কিছুক্ষণ রানার শরীর স্পর্শই করতে পারেনি স্যানসোনি, অথচ তিন চারটে মার হজম করতে হয়েছে ওকে। খ্যাপা মোষের মত তেড়ে গেল দ্বিতীয় রাউণ্ডে সে রানার দিকে। এবার একটা মারতে পারল সে, কিন্তু বেকায়দা জায়গায় বেয়াড়া কিসিমের গোটা কয়েক ঘা খেয়ে ফিরে আসতে হলো ওকে। তৃতীয় রাউণ্ডে রীতিমত ঘাবড়ে গেল সে। বুঝল, এতক্ষণ খেলাচ্ছিল ওকে রানা। ঘাড়ের উপর বিজাতীয় এক রদ্দা খেয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হেয় গেল ওর চোখ। এই লোক এত জোরে মারে কি করে! সাবধান হয়ে গেল স্যানসোনি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল। চতুর্থ রাউণ্ডেই চিৎ করে দিল ওকে রানা।

বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে গেছে বিঘ্নরাজের। রিং-এর ভিতর চলে এল সে। দু'জন মিলে তুলে কোণে নিয়ে গিয়ে ম্যাসেজ আরম্ভ করল স্যানসোনিকে। ঠিক এমনি সময়ে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'বেশ ভাল খেলে তো ছোকরা! এটাকে কোথায় পেলে, বিঘ্নরাজ?'

স্বপ্নে সাপ দেখে মানুষ যেভাবে চমকে ওঠে ঠিক তেমনি চমকে উঠেই আড়ষ্ট হয়ে গেল বিঘ্নরাজ।

ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হয়েছে তিনটে লোক। দাঁড়িয়ে আছে রিং-এর বাইরে। মাঝের লোকটি কথা বলেছিল। উদ্ধত গর্বিত চেহারা। পরিষ্কার বোঝা যায় এ-লোক আদেশ করতে অভ্যস্ত, আদেশ মানতে নয়। একহারা গড়ন, লম্বা খাড়া নাক, তার নিচে পাতলা একফালি গোঁফ, কোঁকড়া চুল, পরনে ছাই রঙের দামী

স্যুট, পায়ে চকচকে কালো জুতো। ডান ভুরুটা সামান্য উঁচু করে লক্ষ করছে সে রানাকে।

বাকি দু'জনকে দেখলেই বলে দেয়া যায় গুণ্ডা। খুব সম্ভব মাঝের লোকটার বডিগার্ড। চেহারায় পরিষ্কার ছাপ পড়েছে ওদের চরিত্রের। একই বৃন্তের দুটি ফুল। রানা টের পেল দুটি ফুলেরই পকেটে পিস্তল আছে।

এক নজরেই অপছন্দ করল রানা এদের তিনজনকে।

'আরে! রঘুনাথজী!' হাসবার চেষ্টা করল বিঘ্নরাজ, কিন্তু দুই চোখে ভীতি। 'কখন এলেন, দেখতে পাইনি তো?'

রানার উপর থেকে দৃষ্টিটা সরে গিয়ে স্থির হলো বিঘ্নরাজের চোখের উপর।

'এটাকে কোথায় পেয়েছ?'

'এই ভদ্রলোকই বীরবর্ধনের নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলেন কাল সন্ধ্যায়,' ভয়ে ভয়ে কথা ক'টা বলে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল বিঘ্নরাজ।

'আচ্ছা! তা হাম্বানটোটার বিরুদ্ধে এই ছোকরাকে নামাবার মতলব করেছ নাকি?'

'না, মানে, আমি এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, রঘুনাথজী। কিন্তু তার আগে উনি একটু প্র্যাকটিস বাউট খেলে বুঝে নিতে চাইলেন আমাদের নিয়ম-কানুন। আমার ইচ্ছায় কি এসে যায়, আপনি যেমন হুকুম করবেন...'

'সাড়ে দশটায় আমার অফিসে এসো। কথা হবে তখন।' রানার দিকে ফিরল রঘুনাথ। 'কি নাম?'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল রানার। বলল, 'কার নাম জিজ্ঞেস করছ? তোমার না আমার?'

বিছে কামড় দিল যেন রঘুনাথের গায়ে। কুঁচকে গেল ভুরু জোড়া। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে রানার চোখের দিকে। রানা নির্বিকার। সামলে নিল রঘুনাথ। বলল, 'এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি আছে তোমার, ছোকরা। বিদেশী বলে মাফ করে দিলাম।' এবার ফিরল সে আবার বিঘ্নরাজের দিকে। বলল, 'কি নাম ওর?'

'মাসুদ রানা। ওনার ওপর দয়া করে রাগ...'

'কোনও কন্ট্রাক্ট সই করেছে তোমার সঙ্গে?'

'আজ্ঞে না। এখনও কিছু...'

'অফিসে আসবার আগে ওকে জিজ্ঞেস করে আসবে, আমার সাথে কন্ট্রাক্ট সই করবার ইচ্ছে আছে কিনা ওর। ভাল টাকা পাবে। প্রতি দু'মাসে একটা করে ফাইট।' বলেই পিছন ফিরে পা বাড়াল রঘুনাথ দরজার দিকে।

'উত্তরটা ওকে এখুনি দিয়ে দিন, মিস্টার বিঘ্নরাজ,' বলল রানা। 'ওকে বলুন কারও সঙ্গেই কন্ট্রাক্ট সই করার ইচ্ছে আমার নেই। নিতান্ত দয়া-পরবশ হয়ে আগামী কালকের ফাইটিঙে রাজি হয়েছি আমি। কারও মাতব্বরী সহ্য করতে প্রস্তুত নই।'

চলে যাচ্ছিল, থেমে দাঁড়িয়ে প্রতিটি শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনল রঘুনাথ। তারপর একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে সোজা বেরিয়ে গেল জিমনেশিয়াম থেকে। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে ছিল বিঘ্নরাজ রানার দিকে, এতক্ষণ মাথা নেড়ে ইশারা করছিল—এসব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। রঘুনাথ বেরিয়ে যেতেই চেয়ে দেখল রানা, মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বিঘ্নরাজের মুখ।

চার

থিরুর হোটেলে ফিরে এল রানা। মনটা অসম্ভব খিঁচড়ে রয়েছে, কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। দরজা বন্ধ করে দিয়েই কাপড় ছেড়ে ঢুকল বাথরুমে। বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজল শাওয়ারের নিচে। দেহের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে মনের উত্তাপটুকুও দূর করে দেবার চেষ্টা করল সে। পিনড এলিকজির শ্যাম্পু দিয়ে যত্নের সঙ্গে চুলগুলো পরিষ্কার করল, সর্বাঙ্গ প্রচুর ফেনা তুলে সাবান মেখে ধুয়ে ফেলল, কিন্তু তবু মনের কোথায় যেন একটু ক্ষোভ জমেই থাকল।

গা মুছে বেরিয়ে এল সে বাথরুম থেকে। সাদা সী আইল্যাণ্ড কটন শার্ট আর গাঢ় নীল রঙের ট্রপিক্যাল ওয়ার্স্টেড ট্রাউজার পরে হালকা একটা স্লিপার পায়ে দিল। দরজার বল্টুটা খুলে দিয়ে চায়ের জন্যে হাঁক দিল রানা রান্নাঘরের দিকে মুখ করে। প্রয়োজন ছিল না, তবু ফ্যানটা ফুলস্পীডে ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণের খোলা জানালার ধারে একটা ইজি-চেয়ারে গিয়ে বসল সে।

পিস্তলটা সাথে না এনে ভুল করেছে সে, ভাবল রানা। ছুটি উপভোগ করতে যাচ্ছে বলে সাথে নেয়নি সে ওটা। বেড়াতে গিয়েও যে মানুষ বিপদজনক বেকায়দা অবস্থায় পড়ে যেতে পারে, ইচ্ছের বিরুদ্ধেও যে জটিল চক্রান্তের মধ্যে জড়িয়ে যেতে পারে, সেকথা রানার জানা ছিল না। ওর ভিতর থেকে কে যেন কিছুক্ষণ ধরে বারবার বলছে, ভুল করছ রানা, এভাবে জড়িয়ে পড়ে মস্ত ভুল করছ তুমি।

জানালা দিয়ে বহুদূরে পেড্রোটালাগালা পর্বতের আবছা চূড়ার দিকে চেয়ে রইল রানা। মিনিট দশেক পর দুই কাপ চা হাতে ঘরে ঢুকল থিরু।

'আপনি কষ্ট করে আনতে গেলেন কেন? দেখুন তো…'

'কি হয়েছে আপনার?' ফালতু কথায় না গিয়ে প্রথমেই কাজের কথায় এল থিরু। 'কোথায় গিয়েছিলেন বিঘ্নরাজের সঙ্গে? এত গম্ভীর হয়েই বা ফিরলেন কেন?'

সব ভেঙে বলল রানা। অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে গেল থিরুর মুখ। বলল, 'রঘুনাথকে এই সব কথা বলেছেন আপনি? ঠিক হয়নি। এক্ষুণি কেটে পড়লে কেমন হয়?'

'তাহলে বিঘ্নরাজের কি হবে?'

'তা-ও তো কথা। কিন্তু ওর জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করবেন কেন আপনি? ভয়ানক লোক রঘুনাথ জয়ামান্নে।'

'পুলিসের সাহায্য পাওয়া যাবে না?'

'না।'

'আমিও বুঝতে পারছি বিচ্ছিরি অবস্থায় জড়িয়ে পড়েছি. ওকে না ঘাঁটালেই ভাল হত, কিন্তু এমন অসহ্য রকমের অভদ্র লোকটা···' থেমে গেল রানা। উদ্বিগ্ন মুখে ঘরে ঢুকল বিঘ্নরাজ। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন মার খেয়ে ফিরছে রঘুনাথের কাছ থেকে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে থিরুর পাশে।

'কি খবর, বিঘ্নরাজ? কি বলল রঘুনাথ?' জিজ্ঞেস করল থিরু।

'ভয়ঙ্কর খেপে গেছে রঘুনাথ। ওর ধারণা আমি চালাকি করে আগেভাগে কন্ট্রাক্ট সই করিয়ে ফেলেছি এঁকে দিয়ে, বীরবর্ধনকে মারা থেকে নিয়ে সব কিছু আমাদের প্ল্যান কর.। বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত বোঝানো গেছে ওকে আসল ব্যাপার। কিন্তু তাতে বেধে গেছে আরেক ফ্যাকড়া। হাম্বানটোটার উপর বাজি ধরেছে সে অনেক টাকার। বলল, যে করে হোক জিততে হবে হাম্বানটোটার কুস্তিগীরকে।'

'তা, বেশ তো,' বলল রানা। 'যদি ভাল খেলোয়াড় হয়, জিতবে সে।'

'আপনি বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা। ওকে জিততেই হবে। হুকুম।'

তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা বিঘ্নরাজের চোখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড। চোখ নামাল বিঘ্নরাজ।

'আপনি কি আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হেরে যাওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন?'

'আমি, মানে, আমি ঠিক প্রস্তাবটা দিচ্ছি না। প্রস্তাব রঘুনাথের। আপনাকে মস্তবড় একজন ফাইটার হিসেবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবার ব্যবস্থা করেছে ও। এতক্ষণে মাইক নিয়ে লোক বেরিয়ে গেছে গাড়িতে করে। বিকেলের মধ্যেই সমস্ত কাণ্ডিতে আপনার ছবিসুদ্ধ পোস্টার লাগানো হবে, হ্যাণ্ডবিল ছড়ানো হবে হাজার হাজার, আগামীকালকের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন যাবে লম্বা চওড়া। সবাই আপনার দলে ভিড়ে পড়বে আপনার কীর্তিকলাপ আর গুণপনা শুনে। ওদিকে দশ লাখ টাকা ধরবে রঘুনাথ হাম্বানটোটার ওপরে। ওর হুকুম—থার্ড রাউণ্ডে চিৎ হয়ে যেতে হবে আপনাকে।' একটিবারও রানার দিকে চোখ তুলে না চেয়ে গড়গড় করে বলে গেল বিঘ্নরাজ কথাগুলো।

'আমি হারার অভিনয় করব না,' বলল রানা। 'জিততে না পারলে হাম্বানটোটা হারবে।'

চমকে চাইল বিঘ্নরাজ রানার মুখের দিকে। দুই চোখে ভীতি।

'দেখুন, মহা বিপদ হবে তাহলে। রঘুনাথ যা বলে কাণ্ডির সবাইকে তা মেনে চলতে হয়।'

'আমি কাণ্ডির কেউ নই। আমি ওর হুকুম না মানলে কি করতে পারে সে?'

'সব করতে পারে রঘুনাথ। ওর যা খুশি তাই করতে পারে। বছর দুয়েক আগে একজন ওর হুকুম অমান্য করেছিল। ওকে ধরে লোহার দুরমুজ দিয়ে পিটিয়ে হাত-পায়ের সমস্ত আঙুল থেঁতলে ছেঁচে দিয়েছিল ওরা। জীবনে আর ফাইট করতে পারেনি লোকটা। আপনারও সেই একই অবস্থা করবে ওর হুকুম না মানলে।'

'ধরতে পারলে তো? হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যাব আমি।'

'সেই লোকটাও তাই ভেবেছিল। কাণ্ডি থেকে পালিয়েও গিয়েছিল। ইণ্ডিয়ায় চলে যাচ্ছিল, মান্নার থেকে ধরে এনেছে এরা ওকে। আপনাকেও ধরবে। এদের হাত থেকে নিস্তার নেই কারও। আরেকজন এভাবেই পালিয়েছিল, সে অবশ্যি ফাইটার ছিল না— অন্য কোনও গোলমাল হয়েছিল রঘুনাথের সঙ্গে, ছ'মাস পর এক ভোরবেলা পাওয়া গেল ওকে, রক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে আছে নাথ লাগজারি হোটেলের সামনে রাস্তার ওপর। চোখ দুটো নেই—উপড়ে নিয়েছে কেউ।'

'শুধু শুধুই আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন, মিস্টার বিঘ্নরাজ,' বলল রানা বিরক্ত কণ্ঠে। 'হয় সোজাসুজি খেলা হবে, নয়তো আমি খেলব না। এই আমার পরিষ্কার জবাব।'

'একটু ভাল করে ভেবে দেখুন, মিস্টার রানা। যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করে দেখুন। এই থিরুকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না। পৃথিবী উল্টে যায়, কিন্তু রঘুনাথ জয়ামান্নের মুখের কথা উল্টায় না।'

হঠাৎ কথা বলে উঠল থিরু। 'কথাটা ঠিক, বুঝলাম। কিন্তু দেশসুদ্ধ লোককে এমন নির্লজ্জভাবে ঠকাবার অধিকার কে দিয়েছে তোমাদের? আর তোমরা সবাই যদি জানো যে মাসুদ রানাই জিতবেন, তাহলে এঁর নামে বাজি ধরলে না কেন? কেন শুধু শুধু এঁকে এভাবে অপমান করতে চাইছ তোমরা?'

'আমাকে এর মধ্যে টেনো না, থিরু। এই কথাটা আমি রঘুনাথকে বোঝাবার চেষ্টা করিনি মনে করেছ? আসলে ঝগড়ার ছুতো খুঁজছে রঘুনাথ। ভয়ঙ্কর রেগে গেছে সে এঁর ওপর আজ সকালের ব্যবহারে। কিছুতেই শুনল না আমার কোনও কথা।'

'যাক,' বলল রানা, 'আমার তরফ থেকে ওকে জানিয়ে দিন, ওর কথায় আমি রাজি নই।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল বিঘ্নরাজ, হাত তুলে চুপ করবার ইঙ্গিত করল ওকে রানা। কান পেতে শুনল সবাই মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে রবিবারের খেলার কথা। আওয়াজটা ক্রমেই বাড়ছে। হোটেলের সামনে দিয়ে চলে গেল গাড়ি। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ঘোষকের কণ্ঠস্বর।

চলে গেল বিঘ্নরাজ ম্লান মুখে।

বিকেলে জিমনেশিয়ামে যাবার সময়েই টের পেল রানা নজরবন্দী রাখা হয়েছে ওকে। সমান দূরত্ব বজায় রেখে সামনে-পিছনে দশজন লোক চলেছে ওর সাথে সাথে। প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গেই মারণাস্ত্র আছে, বোঝা গেল। সকালের সেই গুণ্ডা দু'জনকে দেখতে পেল না রানা এদের মধ্যে। এই দশ রত্নও তাদের কারও চেয়ে কম যায় না।

অর্থাৎ পালিয়ে বাঁচতে দেবে না রানাকে ওরা। আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত চোখে চোখে রাখা হবে ওকে। যদি রঘুনাথের কথামত তৃতীয় রাউণ্ডে আউট হয়ে যাওয়ার ভান করে তাহলে হয়তো ছাড়া পাওয়া যাবে, কিংবা তখন হয়তো নতুন কোনও ঝঞ্ঝাটে ফেলা হবে।

আচ্ছা, কি করা যায়? পুলিসের সাহায্য নেয়ার চেষ্টা করবে? কলম্বোর এমব্যাসীতে খবর দেবে? একাই চেষ্টা করবে উদ্ধার পাওয়ার? নাকি চুপচাপ হজম করে নেবে এই অপমান?

প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির দেয়ালে সাঁটানো হয়েছে রানার ছবি। ছবি তুলল কখন? ছবির নিচে সিংহলী, তামিল এবং ইংরেজিতে লেখা আছে বিভিন্ন কাল্পনিক প্রতিযোগিতায় রানার জয়ের মিথ্যা খবর। বীরবর্ধনের পরিবর্তে কেন রানাকে নিতে হলো তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে স্পষ্টভাবে।

এ কী ফ্যাসাদে পড়ল সে? ট্রাঙ্ককল বা টেলিগ্রাম করবে কলম্বোতে? তাই বা করতে দেবে কিনা কে জানে। এদের প্রত্যেকটি কার্যকলাপে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা আর আত্মপ্রত্যয় দেখতে পাচ্ছে রানা। দেখা যাক কি হয়। একটা কিছু রাস্তা বেরিয়ে যাবেই।

স্যানসোনির তত্ত্বাবধানে ব্যায়াম করল রানা। মক্ ফাইট করল ওর সঙ্গে আধঘণ্টা। তারপর রানাকে মাটিতে পেড়ে ধরে আচ্ছামত ম্যাসেজ করে দিল স্যানসোনি ওর সর্বশরীর। জামা-কাপড় পরে নিয়ে ফিরে এল রানা হোটেলে।

ওর সাথে ফিরে এল সেই দশজনও।

ছড়িয়ে পড়ল ওরা হোটেলের চারপাশে।

পাঁচ

পর দিন ভোরে জিমনেশিয়াম থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে।

স্যানসোনির সাথে মক্ ফাইট করছিল রানা, এমনি সময়ে রিং-এর ধারে এসে দাঁড়াল রঘুনাথের দুই বডিগার্ড। ইতিমধ্যেই নাম জেনে নিয়েছে রানা ওদের। চিকন লম্বা লোকটার নাম পেরেরা—রঘুনাথের অনুকরণে পাতলা গোঁফ রেখেছে সে; আর মোটা লোকটার নাম লোরী—বাম গালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন।

এমন ভাবে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল দু'জন যেন জায়গাটার মালিক ওরাই। বরফের মত জমে গেল স্যানসোনি। রানার মনেও কিসের যেন একটা অশুভ ছায়া পড়ল।

বুড়ো আঙুল দিয়ে রানার দিকে ইশারা করল পেরেরা।

'চলো, জামা পরে নাও, ডাকছেন রঘুনাথজী,' খনখনে গলায় বলল পেরেরা।

'আমি ব্যস্ত আছি,' বলল রানা। 'প্রয়োজন থাকলে এখানে আসতে বলো গিয়ে তাকে।'

চমকে চাইল স্যানসোনি রানার মুখের দিকে। হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখ। মাথা খারাপ নাকি? বলে কি লোকটা! লোরী ও পেরেরার মুখও কঠোর হয়ে গেছে একমুহূর্তে।

'ওসব ধানাইপানাই করে কোন লাভ হবে না, বাছা, ভদ্রলোকের মত সোজা কাপড় পরে বেরিয়ে এসো,' বলল পেরেরা প্রফেশনাল ভঙ্গিতে।

এক ঘুসিতে দাঁত ক'টা খসিয়ে দেবে নাকি? নিজেকে কিছুটা সংযত করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল রানা, 'বেরিয়ে যাও। দু'জনই। নইলে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোতে হবে।'

'কি বললে!' পলকের মধ্যে বেরিয়ে এল দুটো পিস্তল। এবার কথা বলল লোরী। 'বাড়ি গিয়ে বউয়ের সঙ্গে চোটপাট দেখিয়ো, ছোকরা। এক্ষুণি কাপড় পরে নাও, নইলে এখান থেকে খাটিয়ায় চড়ে বেরোতে হবে।'

লোরীর চোখের দিকে চেয়েই রানা বুঝতে পারল শুধু শুধুই হুমকি দিচ্ছে না সে, একবিন্দু দ্বিধা করবে না সে গুলি ছুঁড়তে। অনেক লোকের চোখে এই চাউনি দেখেছে রানা আগে। ভুল হবার কথা নয়।

দুই কদম এগিয়ে এল স্যানসোনি। ঠোঁট দুটো যত কম নেড়ে পারা যায় সেভাবে চাপাস্বরে বলল, 'বোকামি করছেন আপনি, মিস্টার। যান ওদের সঙ্গে। এদের দু'জনকে সবাই চেনে।'

মুচকে হাসল পেরেরা।

'ঠিক বলেছ। কে না চেনে আমাদের। কে না জানে এবছরই গোটা তিনেক পিস্তল অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেছে লোরীর হাতে। আরেকটা হলেই আমার সমান হয়ে যাবে।'

'কিন্তু সাবধান, পেরেরা!' বলল লোরী। 'দেখেছিস, চোখের পাপড়ি পর্যন্ত একবার কাঁপল না শালার!'

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে কাপড় পরে এল রানা চেঞ্জিং বুদে গিয়ে। এখনও সময় আসেনি। সহ্য করে নিতে হবে। এখন গোলমাল করলে লাভ নেই কিছুই। বেরিয়ে এল রানা জিমনেশিয়াম থেকে ওদের সঙ্গে। পিস্তল হাতেই থাকল লোরীর।

একটা প্রকাণ্ড দুধসাদা শেভ্রোলে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই। রানার উপর দৃষ্টি পড়ল ওর, তারপরই লোরীর উপর। পিস্তলটার উপর নজর পড়তেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে নিজের কাজে রওনা হলো সে। পুলিসের কাছ থেকে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাবে পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা। উঠে বসল সে গাড়িতে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গাড়ি পৌঁছল নাথ লাগজারি হোটেলের সামনে। লিফটে করে উঠে এল ওরা পাঁচতলার উপর। কেউ কোন কথা বলল না। পিস্তলটা লোরীর প্যান্টের পকেটে চলে গেছে, ডান হাতটাও সেখানেই। প্রস্তুত আছে সে রানার জন্যে। জহুরীতে জহর চেনে—ওরাও পরিষ্কার চিনে নিয়েছে, কি পরিমাণ ভয়ঙ্কর লোক রানা। প্রয়োজন হলে খুন করতেও দ্বিধা করবে না এই লোক।

লম্বা একটা করিডর দিয়ে গিয়ে প্রাইভেট লেখা একটা বন্ধ দরজায় দুটো টোকা দিয়ে হাতল ঘোরাল পেরেরা। পিছনের মৃদু ধাক্কায় ঢুকে পড়ল রানা ঘরের মধ্যে। ছোট্ট ঘর। অফিস ঘরের মত করে সাজানো। একটা ডেস্কের ওপাশে বসে মনোযোগের সঙ্গে টাইপ করে চলেছে একটি মেয়ে। মুখ তুলে একবার চেয়েই মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'সোজা ঢুকে পড়ো। অপেক্ষা করছেন বস্।'

সামনেই দরজা। দরজা খুলে দিল পেরেরা। পিছন থেকে গুঁতো দিল লোরী।

'যাও। আর, বেয়াদবি কোরো না।'

মস্ত ঘর। পুরু সাদা কার্পেটে মোড়া। পিং-পং টেবিলের সমান একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আগাগোড়া কাঁচ দিয়ে ঢাকা। তার ওপাশে গদি আঁটা রিভলভিং চেয়ারে বসা রঘুনাথ জয়ামান্নেকে ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। একটা মোটা চুরুট ফুঁকছিল রঘুনাথ দুই কনুই টেবিলের উপর রেখে। রানা টেবিলের কাছাকাছি আসতেই পিস্তলের মত তাক করে ধরল সে চুরুটটা রানার বুকের দিকে।

'তোমার কো- কথা শুনতে চাই না আমি। আমার যা বলবার আছে বলে দিচ্ছি, শুনে যাও কেবল।' তীব্র দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে চেয়ে প্রথমেই এই কথা কয়টি বলল রঘুনাথ। চুরুটে একটা মৃদু টান দিল। বসতে অনুরোধ না করেই শুরু করল, 'আজকের খেলায় দশ লাখ টাকা ধরেছি আমি। হাম্বানটোটাকে জিততেই হবে। তৃতীয় রাউণ্ডে দর্শকদের কোনও কিছু বুঝবার সুযোগ না দিয়ে হারতে হবে তোমাকে। বিঘ্নরাজের কাছে শুনলাম আমার এই হুকুম তোমার পছন্দ হয়নি। সেটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু এর ফল কি হবে সেটা তোমাকে জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য। তাই ডেকে এনেছি।' ছাই ঝাড়ল রঘুনাথ দামী অ্যাশট্রেতে। 'তুমি যেখানকার যতবড় মস্তানই হও না কেন, এই শহরটা আমার। আমি চালাই কাণ্ডি। এখানে আমার মুখ থেকে যে-কথা বেরোয় সেটাই আইন। যারা আমার আদেশ অমান্য করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে খুবই শক্তিশালী একটা সংস্থা আছে আমার। নইলে শৃঙ্খলা থাকে না। তোমার ব্যাপারেও তারাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যদি আমার আদেশ অমান্য করো। মনে রেখো, তৃতীয় রাউণ্ড পর্যন্ত খেলায় যদি কোনও কৌশলে দর্শকদের সন্দেহ উৎপাদন করবার চেষ্টা করো, তাহলেও ছেড়ে দেয়া হবে না তোমাকে। শো ঠিক থাকা চাই। তৃতীয় রাউণ্ডের শেষের দিকে হঠাৎ জোর আক্রমণ চালাবে হাম্বানটোটা, চিৎপাত হয়ে পড়ে যাবে তুমি, এবং পড়েই থাকবে। এই আমার হুকুম, এ-ই করতে হবে তোমাকে। যদি অন্যথা হয়, খুন করা হবে তোমাকে। পালাবার কথা চিন্তা করে যে লাভ নেই ইতিমধ্যেই সেকথা নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছ। আর পুলিসের সাহায্য নেয়ার চিন্তাও মন থেকে দূর করে দাও। আমার হুকুমে চলে এখানকার পুলিস। ব্যস, এখন দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। আমার যা বলার বলেছি, এখন তোমার যেমন অভিরুচি তেমনি করবে। এ ব্যাপারে তোমার কোন যুক্তিতর্ক শুনতে চাই না আমি। গেট আউট!'

রানা বুঝল, একবিন্দুও বাড়িয়ে বলছে না রঘুনাথ। বুঝল, বিচ্ছিরি প্যাঁকে পড়েছে সে এবার। এদের কথাবার্তা, চালচলন যাত্রাপার্টির চরিত্রগুলোর মত আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হলেও আসলে তা নয়। এ লোক মুখে যা বলছে, কাজেও তাই করে ছাড়বে। নিজের এলাকায় এর ক্ষমতা অসীম। হাত-পা বেঁধে নিয়ে জল-বিছুটি লাগিয়ে দিয়েছে কেউ যেন রানার সারা গায়ে। কিচ্ছু করবার উপায় নেই। রাগে, দুঃখে, অপমানে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল ওর। তীব্র দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড রঘুনাথের চোখে চোখে চেয়ে থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল

সে বাইরে।

মেয়েটি টাইপ করছে, করতেই থাকল। একবারও মুখ তুলে চাইল না। পেরেরা, লোরী কেউ নেই ছোট ঘরটায়। রাস্তায় দেখা হলো ওদের সঙ্গে। বিচ্ছিরি বাঁকা হাসি হাসল ওরা রানাকে দেখে।

পিছন পিছন এল ওরা জিমনেশিয়াম পর্যন্ত।

ছয়

'কি ঠিক করলেন?' জিজ্ঞেস করল থিরু সন্ধের কিছুক্ষণ আগে রানার ঘরে ঢুকে। 'হাজার দুয়েক টাকা বাজি ধরব ঠিক করেছি। কার নামে ধরব?'

রানা বুঝল, আসলে রানা কি করতে যাচ্ছে সেই কথাটাই ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করছে থিরু। শঙ্কিত হয়ে আছে গত দু'দিন ওরা স্বামী-স্ত্রী রানার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখে। রানার এই বিপদে নিজেকেই মস্ত অপরাধী মনে করে ছটফট করছে থিরু। ও যেচে-পড়ে ডেকে না আনলে এই অবস্থায় পড়তে হত না রানাকে।

'এবারের বাজিটা না-ই ধরলেন,' উত্তর দিল রানা মৃদু হেসে।

'তার মানে?'

'মানে, কি করব এখনও জানি না আমি।'

মুষড়ে পড়ল থিরু। আর কিছু জিজ্ঞেস করল না সে। বিমর্ষমুখে বেরিয়ে যাচ্ছিল, রানা ডাকল আবার।

'ভাবছি, তৃতীয় রাউণ্ডে চিৎই হয়ে যাব। এছাড়া উপায় নেই কোনও। কিন্তু তাই বলে হাম্বানটোটার উপর বাজি ধরতে যাবেন না আবার। কি হয় কিছুই বলা যায় না। হাজার হাজার লোকের লাখ লাখ টাকা চুরি করছে রঘুনাথ—কেবল এই ব্যাপারটাই অসম্ভব খচখচ করছে বুকের মধ্যে। যাই হোক, আমি যদি আর না ফিরি, কোন রকম কৌতূহল প্রকাশ করবেন না। কিছুদিন পর আমার দেশ থেকে হয়তো কয়েকজন লোক আসবে—তাদের মধ্যে একজনের বাম হাতটা কাটা। আমার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করবে, তারপর রঘুনাথকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চলে যাবে ওরা। আপনি দূরে সরে থাকবেন, কিছুতেই এসবের মধ্যে জড়াবেন না নিজেকে। বুঝেছেন?'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল থিরু রানার মুখের দিকে। এসব কি শুনছে সে! এ যে রাজ-রাজড়ার লড়াইয়ের মত লাগছে শুনতে। কে এই লোকটা? নিশ্চয়ই বিরাট কোন লোক হবে—নইলে এত বিরাট হৃদয় পেল কোত্থেকে?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চলে গেল থিরু নিচে।

থিরু বেরিয়ে যেতেই আবার শুয়ে পড়ল রানা বিছানায়। পথ খুঁজছে সে, কিছুতেই কোন উপায় বের করতে পারছে না। তবে কি সত্যিই রঘুনাথের কথামত কাজ করবে সে? নইলে মৃত্যু অনিবার্য। গত দুইদিনের তুমুল প্রচারে দূর-দূরান্ত থেকে অনবরত লোক আসছে খেলা দেখতে। পকেট খালি করে সব টাকা দিয়ে

যাবে রঘুনাথকে।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, মেনে নিতে হবে ওকে রঘুনাথের আদেশ। রানার ভিতর টগবগ করছে ফুটন্ত আগ্নেয়গিরি—যে-কোনও মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত করে বসবে। একদিকে রঘুনাথ, আর একদিকে হাজার হাজার সাধারণ লোক। কেন এই হাবিজাবির মধ্যে জড়াতে গেল সে নিজেকে? বিঘ্নরাজের উপকার করতে গিয়েছিল—কোথায় সেই বিঘ্নরাজ? পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে। আটকে গেছে রানা একটা সাধারণ গ্রাম্য দস্যুর চক্রান্তজালে। একটু পরেই আসবে লোরী আর পেরেরা রানাকে স্টেডিয়ামে নিয়ে যাবার জন্যে।

ডীপ চকোলেট রঙের একটা ট্রেট্রন স্যুট পরে নিল রানা। টাকাগুলো সব সাথে নিল। জুতোর গোড়ালিতে লুকানো, ওর একমাত্র অস্ত্র, ছুরিটা পরীক্ষা করল একবার। চুলগুলো ব্রাশ করে নিল। এমনি সময় ঘরে ঢুকল লীলা।

'বাহ্। চমৎকার লাগছে দেখতে। এখুনি চললেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। চললাম। তুমি স্টেডিয়ামে যাবে না শুনে খুশি হয়েছি আমি।'

'মারামারি দেখতে ভাল লাগে না আমার। আমি এখান থেকেই প্রার্থনা করব, বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবেন আপনি। দেখবেন, ঠিক জয় হবে আপনার।'

থিরুকে বারণ করেছিল রানা ভিতরের ব্যাপার যেন লীলাকে না বলে। বলেনি থিরু। লীলার ধারণা জয়মাল্য নিয়ে ফিরে আসবে মাসুদ রানা।

'তুমি প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই জয় হবে। আচ্ছা, চলি। তোমাদের দু'জনের কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম।'

'এসব কথা বলছেন কেন? খেলার শেষে আসছেন না ফিরে?' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল লীলা রানার দিকে।

চোখ সরিয়ে নিল রানা। এই মেয়ের চোখের দিকে চেয়ে মিছে কথা বলা যায় না। উত্তরটা সে কি নিজেই জানে? কথাটা অন্যভাবে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে।

'না, মানে, ভাবছিলাম কি, তোমাদের সঙ্গে এই তিনটে দিন কাটিয়ে অকৃত্রিম আদর, আর স্নেহ-যত্ন পেয়ে জীবনে এই প্রথম টের পেয়েছি আমি, একটা ছোট বোন ছাড়া মানুষের জীবনটা এক্কেবারে অর্থহীন, অচল। তাই ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি। কুস্তির কথা বলা তো যায় না, আর হয়তো সুযোগ না-ও পেতে পারি।'

'ছি! রওনা হবার সময় এসব কথা বলে না। আমি জানি জয় আপনার হবেই। এই জিনিসটা পকেটে রেখে দিন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকবে।'

রানা চেয়ে দেখল লাল ফিতে বাঁধা একটা ব্রোঞ্জের গোল চাকতি—বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা। প্রায় হাজার বছরের পুরানো। অবাক হলো সে।

'কি এটা?'

'কয়েক পুরুষ ধরে আছে এটা আমাদের কাছে। আমি বাবার একমাত্র মেয়ে, আমি পেয়েছি এটা উত্তরাধিকার সূত্রে। কঠিন কোনও কাজে যেতে হলে সাথে রাখি আমরা এটাকে।'

'এটা বরং থাক, লীলা। হারিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে।'

'পকেটে রেখে দিয়ে ভুলে যান এর কথা। দেখবেন, জয় হবে আপনার।'

ঠিক তাই করল রানা। পকেটে রেখে দিয়ে বেমালুম ভুলে গেল ওটার কথা। নিচে গাড়ির হর্ন শুনে নেমে এল সে সিঁড়ি বেয়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

পেরেরা চালাচ্ছে, পিছনের সীটে বসে আছে লোরী। সামনের সীটে উঠে বসল রানা। দ্রুত ছুটে চলল শেভ্রোলে প্রায় জন-শূন্য রাস্তা দিয়ে। কাণ্ডির সমস্ত লোক আজ ভিড় করেছে স্টেডিয়ামে। দূর থেকে ফ্লাড লাইটের আলো দেখতে পেল রানা। স্টেডিয়ামের গেট লোকে লোকারণ্য। স্টেডিয়ামের কাছাকাছি এসে রানার কানের কাছে মৃদুস্বরে বলল লোরী, 'হয় থার্ড রাউণ্ড, নয় এক্কেবারে আউট। মনে রেখো।'

'হয়েছে, হয়েছে। বহুবার শুনেছি কথাটা,' ঝাঁঝিয়ে উঠল রানা।

অসংখ্য গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। উত্তর দিকের একটা দোতলা ঘরের দিকে যেতে হবে। এদিকটায় লোকজনের ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। স্টেডিয়ামে ঢুকবার গেট আসলে পুব, পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকে। উত্তর দিকটায় জার্নালিস্ট, ফটোগ্রাফার এবং বিভিন্ন ক্লাবের মেম্বার বা নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে আলাদা প্যাণ্ডেল।

গাড়ি থেকে নেমে দ্রুতপায়ে উঠে গেল ওরা একটা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। হৈ-হৈ করে উঠল দর্শকবৃন্দ। রানা চেয়ে দেখল ইতিমধ্যেই খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। চারদিকের ফ্লাড লাইট থেকে প্রখর আলো পড়েছে ডায়াসের উপর। কয়েকটা ক্লাবের মধ্যে সৌখিন প্রতিযোগিতা হচ্ছে। স্টেডিয়াম ভর্তি গিজগিজ করছে মানুষ আর মানুষ। খেলা শেষ হবে মাসুদ রানা ও মিস্টার হাম্বানটোটাকে দিয়ে। সবাই অপেক্ষা করছে তার জন্যে। মাঝে মাঝে এক-আধটা ভাল মার হলেই প্রবল গর্জনে কেঁপে উঠছে আকাশ-বাতাস।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা ধরে কিছুদূর যেতেই রানার ড্রেসিংরুম। বেশ কিছু লোক জটলা পাকাচ্ছে দরজার সামনে। বিঘ্নরাজ এবং স্যানসোনিকে দেখতে পেল রানা ওদের মধ্যে। মৃদু গুঞ্জন উঠল লোকগুলোর মধ্যে রানাকে দেখতে পেয়েই।

'সরে দাঁড়ান, সরে দাঁড়ান। দরজা ছাড়ুন,' চিৎকার করে উঠল বিঘ্নরাজ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইল রানার উপর। কেউ কেউ অটোগ্রাফ খাতা বাড়িয়ে ধরেছে।

'পরে, পরে,' বলল রানা। 'খেলার পরে অটোগ্রাফ দেব।'

কোনমতে রানাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল স্যানসোনি আর বিঘ্নরাজ। জনতা সামলাবার ভার নিল লোরী আর পেরেরা। ঘরের ভিতর ঢুকে চারদিকে চাইল রানা।

'আপনি বেরিয়ে যান,' বলল সে বিঘ্নরাজকে। 'আপনাকে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার দেখাশোনার জন্যে স্যানসোনিই যথেষ্ট।'

'দেখুন, মিস্টার মাসুদ…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বারবার এক কথা বলবার দরকার নেই। কি বলতে চান আমি জানি।'

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল বিঘ্নরাজের মুখ। বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

দরজা বন্ধ করেই কাপড় ছাড়তে আরম্ভ করল রানা। কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল রাবিং টেবিলের উপর।

অল্পক্ষণ ম্যাসেজ করেই হঠাৎ খেপে উঠল স্যানসোনি।

'আপনার সমস্ত মাসল শক্ত হয়ে আঁকড়ে আছে। এই অবস্থায় ফাইট করবেন কি করে? রিল্যাক্স করুন, ঢিল করে দিন সর্বশরীর। নইলে ম্যাসেজ করে কি লাভ?'

একটু পরে গলা খাটো করে জিজ্ঞেস করল স্যানসোনি, 'আপনি জিতছেন না হারছেন?'

'সেটা কি করে বলি বলো? হারজিতের কথা আগে থেকে কি কিছু বলা যায়?' এসব ব্যাপার স্যানসোনিকে জানিয়ে ওর মন খারাপ করতে চায় না রানা।

'আমার মনে হচ্ছে, যায়,' বলল স্যানসোনি বিরস মুখে। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আজকের খেলাতেও রঘুনাথের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। এদেশের খেলাধুলোর মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিল লোকটা। এটা আরেকটা টাকার খেলা, তাই না?'

'বুঝতেই যখন পারছ তখন আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? তোমাদের শহরের সমস্ত লোক কবে বুঝবে তাই ভাবছি। ওরা কি চোখ বন্ধ করে থাকে? বাজির টাকাটা প্রতিবার কার পকেটে যাচ্ছে সেটা দেখেও চৈতন্য হয় না এদের? আশ্চর্য!'

'জিতছেন, না হারছেন?' প্রথম প্রশ্নটাই আবার করল স্যানসোনি।

'হাম্বানটোটার ওপরে দশ লাখ টাকা ধরেছে রঘুনাথ—কাজেই বুঝে নাও। থার্ড রাউণ্ডে আউট হয়ে যেতে বলা হয়েছে আমাকে।'

বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়ল স্যানসোনি। তারপর বলল, 'তাহলে শুধু শুধু ম্যাসেজ করছি কেন? থার্ড রাউণ্ডে হারবার জন্যে বডি ফিট্‌নেসের দরকার নেই।'

'তবু ম্যাসেজটা কমপ্লিট করো। না-ও তো হারতে পারি? ধরো যদি হাম্বানটোটাকে হারিয়ে দিই, প্রাণ নিয়ে এখান থেকে পালাবার কোন পথ নেই?'

ভীত দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে চাইল স্যানসোনি। ওর ভয়, শুনে ফেলবে কেউ কথাটা। অস্ফুট কণ্ঠে বলল সে, 'কী যা তা বকছেন পাগলের মত! এসব চিন্তা দূর করে দিন মাথা থেকে।'

'কল্পনা করতে দোষ কি?' বলল রানা। 'এই জানালাটা দিয়ে নামলে কোথায় পৌঁছানো যায়?'

'চুপচাপ শুয়ে রিল্যাক্স করুন। এসব কথার কোনও মানে হয় না।'

'হাজার হাজার সরল সাধারণ মানুষের কথা ভাববার কোন মানে হয় না? কতলোক এই খেলায় তাদের সর্বস্ব খোয়াবে আজ, সেকথা ভাবব না একবারও?'

'আপনার করবার কিছুই নেই।'

টেবিল থেকে নেমে পড়ল রানা। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তিরিশ ফুট নিচে একটু দূরে কার-পার্ক। জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দেখল রানা, সরু একটা কার্নিস ধরে কিছুদূর ডানধারে গেলেই পাইপ পাওয়া যাবে একটা। পানি নিষ্কাসনের পাইপ—ছাদ থেকে নেমে গেছে মাটি পর্যন্ত। ওটা বেয়ে নিচে নামা কঠিন হবে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পালিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

জানালার ধার থেকে টেনে নিয়ে গেল স্যানসোনি রানাকে টেবিলের কাছে। রানার হাবভাব দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে সে। দুদিনেই মায়া বসে গিয়েছে ওর এই বিদ্যুৎগতি বিদেশী যুবকটির উপর। রানা আবার টেবিলের উপর শুয়ে পড়তেই বলল, 'আত্মহত্যার আরও তো অনেক পথ আছে।'

'আচ্ছা, বলো তো স্যানসোনি, হাম্বানটোটা দেখতে কেমন? আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখিইনি এখন পর্যন্ত।'

'ওর আর দেখার কিছু নেই,' বলল স্যানসোনি মাথা নেড়ে। 'ভয়ানক কালো। টেলিফোনের মত।'

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ।

'তোমার কি মনে হয় স্যানসোনি, সত্যিই গুলি করবে ওরা, না শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছে?'

'গুলি করবে কিনা জানি না, তবে শেষ যে করে দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিন বছর আগে একজন ডাবল ক্রস করেছিল—গুলি করে মারা হয়েছিল তাকে। বছর দেড়েক আগে একজন ইচ্ছে করে আউট হয়ে গিয়েছিল সিক্সথ রাউণ্ডে—হাত-পা গুঁড়ো করে দেয়া হয়েছে তার। আর অল্প কিছুদিন আগে একজনের ফোর্থ রাউণ্ডে জিতবার কথা ছিল, তা না করে সেভেন্থ রাউণ্ডে গিয়ে জিতেছিল বলে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে তার মুখ। আপনার ওপর এর কোনটা প্রয়োগ করবে ঠিক বলতে পারছি না। এবার উপুড় হয়ে শোন।'

উপুড় হয়ে শুয়ে অনেক সম্ভাবনার কথা মনে মনে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করে দেখল রানা। ম্যাসেজ শেষ হতেই রানার পিঠে টোকা দিল স্যানসোনি। দরজাতেও টোকা পড়ল সেই সাথে।

'কি করছ তোমরা ভেতরে?' বিঘ্নরাজের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। 'জলদি বেরোও। ডায়াসে উঠে গেছে মি. হাম্বানটোটা।'

হলুদের উপর লাল ডোরাকাটা ঢোলা আলখেল্লা পরে নিল রানা। রঘুনাথের দেয়া। পিঠের উপর কালো হরফে ইংরেজি, তামিল আর সিংহলী ভাষায় লেখা: মাসুদ রানা। কোমরের দড়ি বেঁধে দিল স্যানসোনি। থিয়েটারের সেনাপতি মনে হলো রানার নিজেকে এই বিদঘুটে রঙচঙে কাপড় পরে—তলোয়ারটাই নেই কেবল। শুধু কাপড় কেন, সব ব্যাপারই কেমন যেন থিয়েটারী ঢঙে ঘটে যাচ্ছে। বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

ঘর থেকে বেরিয়েই প্রথমে চোখ পড়ল রানার লোরীর উপর। একটুকরো বাঁকা হাসি লেগে আছে ওর ঠোঁটের কোণে। তারপরেই চোখ পড়ল বিঘ্নরাজের উপর। ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে।

'চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন। সবাই অপেক্ষা করছে। আপনি আগে আগে, আমরা আপনার পেছনে।'

রানার পিছনে বিঘ্নরাজ, তার পিছনে স্যানসোনি এবং সবার পিছনে লোরী ও পেরেরা। নেমে এল রানা সিঁড়ি বেয়ে, হাঁটতে থাকল রিং-এর দিকে। দুই পাশের লোক উঠে দাঁড়িয়ে এ-ওর কাঁধের উপর দিয়ে রানাকে দেখবার চেষ্টা করছে।

শোরগোল পড়ে গেল ওদের মধ্যে। সবাই উৎসাহ দিচ্ছে রানাকে নানান ভাষায় চিৎকার করে। ফেরার সময় এইসব লোক কি ভাষায় চিৎকার করবে কল্পনা করে মুচকে হাসল রানা একটু।

রিং-এর ভিতর দাঁড়িয়ে দর্শকদের আনন্দ উৎপাদনের জন্যে কমিক করছে মিস্টার হাম্বানটোটা। কখনও দুই পা বাঁকিয়ে হেঁটে দেখাচ্ছে, কখনও ডিগবাজি খাচ্ছে, কখনও হেলপারদের সাথে কুস্তি করবার ভান করছে। আর হেসে খুন হয়ে যাচ্ছে দর্শকবৃন্দ।

রানা দেখল সত্যিই টেলিফোনের মত নিকষ কালো লোকটা। প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারা। দড়ির মধ্যে দিয়ে গলে রিং-এ ঢুকে নিজের কর্নারে চলে গেল রানা। রানাকেও বোধহয় দেখেনি হাম্বানটোটা আগে। নিজের অর্ধেক চেহারার হালকা-পাতলা একটা লোককে রিং-এ ঢুকতে দেখে হেসে ফেলল সে অনাবিল আনন্দে। দর্শকদের ভঙ্গি করে দেখাল দুই আঙুলেই টিপে মেরে ফেলবে সে রানাকে। হাসির হুল্লোড় উঠল দর্শকদের মধ্যে—যেন বছরের সেরা রসিকতা এটা।

রানা আলখেল্লাটা খুলে দাঁড়াতেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সারা স্টেডিয়াম। রানা বুঝতে পারল ওকে দেখেই হায়-হায় করে উঠেছে শতকরা নব্বুইজন দর্শকের বুকের ভিতরটা। রানার কীর্তি-কলাপ শুনে প্রকাণ্ড এক পালোয়ান হিসাবে কল্পনা করে নিয়েছিল ওরা রানাকে, আসল চেহারা দেখে কণ্ঠতালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে ওদের। হাম্বানটোটার পাশে মাসুদ রানা, এ যেন হাতির পাশে নেংটি ইঁদুর। ছবি দেখে তো এমন মনে হয়নি। মৃদু গুঞ্জন উঠল সারা স্টেডিয়ামে।

বসে পড়ল রানা টুলের উপর। হাম্বানটোটার ম্যানেজার এসে দাঁড়াল। রানার সাথে কোন অস্ত্র আছে কিনা দেখার সময় ঈগলের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ রাখল ঠিকমত পরীক্ষা করা হচ্ছে কিনা। ওর নিঃশ্বাসে দেশী মদের পচা দুর্গন্ধ। ভোঁশ ভোঁশ ছাড়ছে সে দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাস রানার মুখের উপর। বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল রানা বাম দিকে।

ঠিক সেই সময় চোখাচোখি হলো রানার মেয়েটির সঙ্গে।

হাতে মাইক নিয়ে সাদা পোশাক পরা একজন লোক কি যেন ঘোষণা করছে, কিন্তু একটি শব্দও ঢুকল না রানার কানে। এমন কি যখন রানাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে পিছন থেকে স্যানসোনির খোঁচা না খেলে বুঝতে পারত না যে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়াতে হবে দর্শকদের উল্লসিত হর্ষধ্বনির প্রত্যুত্তরে।

চোখ সরাতে পারল না রানা মেয়েটির মুখের উপর থেকে। কাছাকাছি প্রথম সারিতে বসে চেয়ে আছে মেয়েটি ওর দিকে। রানা যখন দর্শকদের দিকে হাত নাড়াচ্ছে তখনও চেয়ে আছে ওরা পরস্পরের দিকে। অদ্ভুত এক অমোঘ আকর্ষণে টেনে রেখেছে যেন মেয়েটির আয়ত নীল চোখ রানার চোখ দুটোকে। সম্মোহন করছে যেন সে রানাকে।

জীবনে অনেক সুন্দরী দেখেছে রানা, কিন্তু এই প্রথম অনুভব করল সে সৌন্দর্য কাকে বলে। এমন নিখুঁত, এমন আকর্ষণীয়, এমন তলোয়ারের মত ঝকঝকে চেহারা আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি ওর। একহারা লম্বা দেহের গড়ন, লাল কাঞ্জিভরম, কালো

সিল্কের ব্লাউজ, টকটকে লাল—একটু যেন উগ্র—ঠোঁট, বাম হাতে কালো ব্যাণ্ডে বাঁধা একখানা দামী সোনালী ঘড়ি, অনামিকায় প্রায় বিশ ক্যারেটের একটা রক্তমুখী নীলা।

কণ্ঠতালু শুকিয়ে এল রানার, হঠাৎ বেড়ে গেল হার্টবিট। ফাইট, রঘুনাথ, লোরী, পেরেরা, দর্শকমণ্ডলী এক নিমেষে দূর হয়ে গেল ওর মনের পর্দা থেকে। এ কি হলো ওর? কাঁপছে কেন ওর বুকটা? জাদু করল নাকি মেয়েটা ওকে?

'কি হলো আপনার?' জিজ্ঞেস করল স্যানসোনি। 'নক-আউট পাঞ্চ খাওয়া চেহারা হয়েছে কেন?'

অপ্রতিভ দৃষ্টিতে চাইল রানা স্যানসোনির মুখের দিকে। তারপর আবার চোখ ফেরাল মেয়েটির দিকে। মুচকে হাসল একটু মেয়েটি—কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস।

পাশে কে? দামী একটা অ্যাশ-কালার স্যুট পরা বয়স্ক লোক। কোঁকড়া ব্যাকব্রাশ করা চুল। রানার মতই লম্বা চওড়া। বোঝা যায় যৌবনে রীতিমত আকর্ষণীয় ছিল চেহারাটা। কড়া করে চাইল লোকটা রানার চোখের দিকে। কে হয় লোকটা মেয়েটির? বাপ, ভাই, না স্বামী?

'কি হলো আপনার? ওঠেন।' ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে দিল স্যানসোনি রানাকে টুল থেকে। 'রেফারী এসে গেছে।'

সত্যিই রিং-এর মাঝখানে অপেক্ষা করছে রেফারী ও হাম্বানটোটা। বিদ্রূপের হাসি দৈত্যের মুখে। বলল, 'ভয় পেলে নাকি, বাছা। আচ্ছা, ঠিক আছে, জোরে মারব না।'

'থাক থাক, হয়েছে,' বাধা দিল রেফারী। 'খেলা শুরু হওয়ার আগে আর কোনও হাসি-মস্কারা নয়। এখন তোমরা পরস্পরের শত্রু।'

খেলার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে একঘেয়ে কণ্ঠে গৎবাঁধা বুলি আউড়ে গেল রেফারী। রানার কানে একটি কথাও প্রবেশ করল না, রানা ভাবছে মেয়েটির কথা। বুলি শেষ হতেই রেফারী বলল, 'এবার যে যার কর্নারে যাও। হুইসল বাজলেই খেলা আরম্ভ হবে।'

রানার চিবুক স্পর্শ করে আদর করল হাম্বানটোটা লোক হাসাবার জন্যে। দর্শকদের সাথে নিজেও চোখ মটকে যোগ দিল সে-হাসিতে। রানা বুঝল নিশ্চিত জয়ের আশ্বাস পেয়েছে সে। নইলে এতখানি দুঃসাহস হত না লোকটার। ফিরে এল সে নিজের কর্নারে।

শেষ বারের মত চাইল রানা মেয়েটির দিকে। বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল মেয়েটির চোখ। উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে আছে সে।

'ওর মুখ থেকে ওই বিচ্ছিরি হাসিটা মুছে দাও, রানা!'

পাশের লোকটি ধমকের ভঙ্গিতে কি যেন বলল চাপাস্বরে, একটা হাত রাখল মেয়েটির বাহুর উপর। ঝট্‌কা দিয়ে সরিয়ে দিল মেয়েটি সে-হাত। বলল, 'গুডলাক!'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা।

খেপে গিয়ে মেয়েটি এবং রানার মাঝখানে এসে দাঁড়াল স্যানসোনি।

'খেলার দিকে মন দিন এখন, মিস্টার। কথাবার্তা পরে হবে।' হুইসল বাজল।

ক্ষুধার্ত বাঘের মত ছুটে এল হাম্বানটোটা দুই হাত সামনে বাড়িয়ে পিঠটা একটু কুঁজো করে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে জোড়া পায়ে লাথি মারল রানা ওর বুকের উপর। লাথি খেয়ে ফিরে গেল হাম্বানটোটা নিজের কর্নারে, কিন্তু ব্যালান্স হারাল না। এইবার আরেকটু সাবধানে এগোল সে। ঘুরতে থাকল দু'জন গোল হয়ে। রানাকে হাতের নাগালে পাচ্ছে না সে কিছুতেই, একবার ধরতে গিয়ে নাকে ঘুসি খেয়ে পিছিয়ে এসেছে। হঠাৎ ঝট্ করে শুয়ে পড়েই পা চালাল সে। লাফিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না, বেধে গেল পায়ে। হুড়মুড় করে পড়ল রানা মাটিতে। ঝাঁপিয়ে পড়ল হাম্বানটোটা ওর বুকের উপর। গড়াগড়ি চলল কিছুক্ষণ। কেউ কাউকে চেপে রাখতে পারছে না। হঠাৎ একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল দু'জন একটু ছাড়া পেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু দিয়ে মারল হাম্বানটোটা রানার পেটে। ছিট্‌কে গিয়ে ধাক্কা খেল রানা দড়িতে। সেই অবস্থাতেই রানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল হাম্বানটোটা ছুটে গিয়ে। মেরে বসল রানা।

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বের হলো হাম্বানটোটার মুখ থেকে। কল্পনাও করতে পারেনি সে এত প্রচণ্ড ব্যথা দিতে পারে এই চিকন লোকটা। চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে। উল্লাসধ্বনি উঠল দর্শকের গ্যালারি থেকে। প্রথম রাউণ্ডেই এমন অবস্থা আশা করেনি ওরা।

রানা ঘাবড়ে গেল একটু। আউট হয়ে গেল না তো ব্যাটা? না। জ্ঞান আছে। রেফারী ছয় পর্যন্ত গুনতেই নড়েচড়ে উঠল, আট গুনতেই উঠে দাঁড়াল। টলছে সে। লাল হয়ে গেছে চোখ দুটো। এবার আক্রমণ ভাগে এল রানা। পালিয়ে বেড়াচ্ছে হাম্বানটোটা, সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে সে। দুইহাতে দমাদম মেরে চলেছে রানা, দর্শকবৃন্দ আকাশ ফাটাচ্ছে, আসলে একটা মারও ভালমত লাগছে না হাম্বানটোটার গায়ে, চটাশ চটাশ আওয়াজই হচ্ছে কেবল।

একটু সামলে নিয়েই দড়াম করে এক রদ্দা মেরে বসল হাম্বানটোটা। ছিটকে চারহাত দূরে পড়ল রানা। ছুটে আসছিল হাম্বানটোটা, গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিত এইবারই, কিন্তু হুইসল বেজে উঠল। প্রথম রাউণ্ড শেষ।

নিজের কর্নারে ফিরে এসেই চাইল রানা মেয়েটির দিকে। হাসি নেই ওর মুখে, ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছে সে রানার দিকে। দুই ঠোঁট চেপে রেখেছে সে শক্ত করে। রানা বুঝল, টের পেয়ে গেছে মেয়েটি। ওর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি রানার অভিনয়। ভেজা তোয়ালে দিয়ে রানার গায়ের রক্ত মুছছে স্যানসোনি, মেয়েটিকে আড়াল করল সে নিজের গরিলা-সদৃশ দেহ দিয়ে।

ঘর্মাক্ত কলেবরে ডায়াসে উঠে এল বিঘ্নরাজ। উত্তেজনায় ডান গালটা অবিরাম লাফাচ্ছে ওর।

'এ কী করছেন, মিস্টার মাসুদ রানা?' বলল সে অস্ফুট স্বরে। 'অমন ভাবে মারলেন কেন ওকে? যদি আর উঠতে না পারত?'

'মারামারি করতে এসেছে, মার খাবে না?'

'রঘুনাথ বলছিল…'

'চুলোয় যাক রঘুনাথ!'

হুইসল বাজতেই এগিয়ে গেল রানা। সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে এবার হাম্বানটোটা রানার উপর। হাসি মিলিয়ে গেছে ওর মুখ থেকে। জানপ্রাণ দিয়ে ফাইট করবে সে এবার।

তুমুল মারপিট হলো। নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করল রানা প্রাণপণে। পালিয়ে বেড়াতে থাকল স্টেজময়। নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে রানার—ডান চোখটা প্রায় অকেজো হয়ে গেছে প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে, কাঁধের মাংসেও কামড়ের চিহ্ন, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। হাম্বানটোটার দুটো দাঁত অদৃশ্য হয়েছে কেবল, বাকি সব ঠিকই আছে।

হঠাৎ হাম্বানটোটার একটা লাথি থেকে বাঁচতে গিয়ে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল রানা। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করল দৈত্যটা। মাথায় প্রচণ্ড একটা গাঁট্টা খেয়ে অন্ধকার হয়ে এল রানার দুই চোখ। মাটিতে পড়তে দিল না রানাকে হাম্বানটোটা। তাহলে মারা যাবে না। লাফিয়ে এসে পিছন থেকে ডান হাতে গলা জাপটে ধরল রানার, বাঁ হাতে কিল মারতে থাকল যত্রতত্র। দম বন্ধ হয়ে আসছে রানার, কিন্তু সেই অবস্থাতেও মাথা ঠিক রাখল সে।

বাম হাতে রানার চোখ খুঁজছে হাম্বানটোটা। অন্ধ করে দেবে। হঠাৎ দর্শকবৃন্দ অবাক হয়ে দেখল রানার মাথার দুই হাত উপর দিয়ে হাম্বানটোটার প্রকাণ্ড শরীরটা ডিগবাজি খেয়ে পড়ল গিয়ে সামনে। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা উন্মত্তের মত ওর বুকের উপর। তিন সেকেণ্ড পর উঠে দাঁড়াল রানা আবার। জ্ঞান হারিয়েছে হাম্বানটোটা। তুমুল হর্ষধ্বনি।

রেফারী তিন পর্যন্ত গুনতেই হুইসল পড়ে গেল। দ্বিতীয় রাউণ্ডের সময় শেষ হয়ে গেছে। হাম্বানটোটার ম্যানেজার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলে টেনে নিয়ে গেল ওকে ওর কর্নারে। ধীর পায়ে ফিরে গেল রানা নিজের কর্নারে।

কানের কাছে কে যেন ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'হয় থার্ড রাউণ্ড, নয় মৃত্যু।'

কথাটা কে বলল দেখবার আগ্রহ হলো না রানার। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল সে মেয়েটির দিকে। হাসছে সে এখন। হাত নাড়ল রানার দিকে। মৃদু হেসে মাথা নাড়ল রানা। কিন্তু পর মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল আবার। হারতে হবে রানাকে এই রাউণ্ডে। মেয়েটি নিশ্চয়ই রানার উপর বাজি ধরেছে আর সবার মত। যাকগে, এসব কথা ভাববে না রানা এখন। জান বাঁচানো ফরজ। কিন্তু…এই যে হাজার হাজার দর্শক, সবাইকে রঘুনাথ…দূর ছাই।

ভেজা তোয়ালেটা লাল হয়ে গেছে দেখে সেটা ফেলে দিয়ে আরেকটা নিল স্যানসোনি। রানার মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'বড় চমৎকার খেলা দেখিয়েছেন কিন্তু। আপনাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না—পয়সা উসুল হয়ে গেছে সব শালার।'

ওদিকে ভেজা তোয়ালে আর স্মেলিং সল্ট নিয়ে মত্ত হয়ে গেছে দু'জন হাম্বানটোটাকে খাড়া করবার জন্যে। নাকটা ভেঙে গেছে ওর, রক্ত বন্ধ হতে

চাইছে না কিছুতেই। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল দানব। ইচ্ছাকৃতভাবেই সময় দেয়া হলো ওকে সামলে নেয়ার জন্যে। তারপর বেজে উঠল হুইসল।

পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে হাম্বানটোটা। কয়েকবার কৌশলে সুযোগ দিল রানা ওকে, কিন্তু কাছেই ভিড়ছে না সে, দূর থেকে হাত-পা ছুঁড়ছে কেবল, লাগছে না রানার গায়ে। রানা দেখল মুশকিল, প্রতিপক্ষ এইভাবে পালিয়ে বেড়ালে মাঝখান থেকে বিপদে পড়বে সে নিজেই। কাছে গিয়ে মৃদু একটা ঘুসি মারল সে হাম্বানটোটার চোয়ালে। এতেই ঢলে পড়ে যাচ্ছিল দৈত্যটা, ধরে ফেলল রানা, যেন কুস্তি করছে এমনি ভাবে ধস্তাধস্তি আরম্ভ করল ওর সঙ্গে। তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল চারপাশ থেকে।

'এইবার যত জোর আছে তত জোরে মারো দেখি একটা, হারামজাদা,' বলল রানা দৈত্যটার কানে কানে।

হাত উঠতে চায় না হাম্বানটোটার, বহুকষ্টে বাম হাতে একটা ঘুসি মারল সে রানার বুকে। ব্যথা পায়নি রানা কিন্তু ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। হারতেই যখন হবে, তখন পথ পরিষ্কার করা ভাল। দর্শকদের মধ্যে থেকে এমন চিৎকার উঠল যে রানার মনে হলো ঢাকা থেকেও শোনা যাবে। এক, দুই, তিন গুনছে রেফারী, দড়িতে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে হাম্বানটোটা। রানা চেয়ে দেখল, স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে হাম্বানটোটার বিধ্বস্ত মুখে।

হামাগুড়ি দিয়ে বসে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল রানা, যেন ঘোলা ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করছে। ছয় গুনতে না গুনতেই উঠে দাঁড়াল রানা। কিন্তু প্রস্তুত হবার আগেই ধরাশায়ী হলো আবার। সাহস ফিরে এসেছে হাম্বানটোটার, উঠে দাঁড়াতেই প্রচণ্ড লাথি মেরেছে সে রানার পাঁজরের উপর। ছিটকে গিয়ে পড়ল রানা দড়ির উপর, সেখান থেকে মাটিতে। কয়েক সেকেণ্ড জ্ঞান ছিল না। চোখ খুলেই দেখতে পেল সে মেয়েটির মুখ। উঠে দাঁড়িয়েছে সে চেয়ার ছেড়ে। প্রথম কয়েক সারির প্রত্যেকটা লোক উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার ছেড়ে উত্তেজনায়। সবাই প্রাণপণ চিৎকার করে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করছে রানাকে। মেয়েটির গলা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা এত হৈ চৈ-এর মধ্যেও।

'উঠে পড়ো! রানা! উঠে পড়ো!' চিৎকার করে বলছে মেয়েটা। 'ইচ্ছে করে হারছ কেন? এত লোককে ঠকিয়ে তোমার কি লাভ? উঠে পড়ো, রানা, প্লীজ!'

সত্যিই তো, এ কী করতে যাচ্ছে রানা? কেবল রানার ভীরুতার জন্যে হাজার হাজার লোক সর্বস্ব খোয়াবে আজ। কেন প্রশ্রয় দিচ্ছে সে এই অন্যায় ভয়কে?

রেফারী ডেকে চলেছে, 'ছয়…সাত…আট…'

মাথাটা ঘুরছে অসম্ভব, তবু উঠে পড়ল রানা। আবার লাথি চালিয়েছিল হাম্বানটোটা, রানা একটু সরে যেতেই অল্পের জন্যে মিস করল। তেড়ে এল হাম্বানটোটা। জড়িয়ে ধরে সেঁটে গেল রানা ওর বুকের সঙ্গে। ধস্তাধস্তি চলল, কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না রানাকে। এমনভাবে আঁকড়ে ধরা দেখেই বুঝতে পেরেছে হাম্বানটোটা, রঘুনাথের আদেশ অমান্য করতে যাচ্ছে রানা। ওকে টালমাটাল অবস্থাটা কাটিয়ে উঠবার সুযোগ দিলে নিশ্চিত পরাজয় হবে ওর।

প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করল সে রানাকে। চেপে ধরল চুলের মুঠি।

চার-পাঁচ সেকেণ্ড সময় পেলেই মাথার মধ্যেকার ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে যাবে রানার। কিছুতেই ঢিল করল না সে বাহু বন্ধন। চাঁদির অর্ধেক চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলবার জোগাড় করেছে হাম্বানটোটা। ছয় সেকেণ্ড পর দেহটা ছেড়ে দিয়েই মারল রানা দুর্বল হাতে হাম্বানটোটার ভাঙা নাকের উপর, এবং পিছিয়ে গেল। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াল আরও কয়েক সেকেণ্ড। মত্ত হাতীর মত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে রানাকে হাম্বানটোটা স্টেজময়।

হঠাৎ থেমে গেল রানা ঠিক মাঝখানে। ঝাঁপিয়ে পড়ল হাম্বানটোটা। বিদ্যুৎবেগে পরপর তিনবার দেহের তিন জায়গায় আঘাত করল রানা। গগনভেদী এক আর্তনাদ ছেড়ে পড়ে গেল হাম্বানটোটা চিৎ হয়ে। পড়েই জ্ঞান হারাল।

এক, দুই করে দশ পর্যন্ত গুনল রেফারী, ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে, তারপর এগিয়ে এসে রানার ডানহাতটা তুলে ধরল মাথার উপরে। ঘোষণা করল, জয় হয়েছে রানার। উল্লাসে নাচানাচি করছে দর্শকবৃন্দ।

মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখল রানা উত্তেজনায়, খুশিতে জ্বলজ্বল করছে ওর আয়ত চোখ। একটা উড়ন্ত চুম্বন উপহার দিল সে রানাকে। জ্বলজ্বল করছে রক্ত-মুখী নীলাটাও। হুড়মুড় করে প্রেস রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফার কয়েকজন উঠে এল রিং-এর মধ্যে, আড়াল হয়ে গেল মেয়েটি রানার চোখের সামনে থেকে।

রঘুনাথের কঠোর-মুখটা দেখা গেল ভিড়ের মধ্যে। ঠোঁট দুটো ফাঁক করে দেঁতো হাসি হাসল সে, চোখ দুটো অগ্নিবর্ষণ করছে।

'বেশ, বেশ। ভাল খেলেছ, এর জন্যে ভাল পুরস্কার পাবে তুমি,' বলল রঘুনাথ চিবিয়ে চিবিয়ে। তারপর হাম্বানটোটার ম্যানেজারের দিকে এগিয়ে গেল।

রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে স্যানসোনির মুখ। একটি কথাও বেরল না ওর মুখ থেকে। আলখেল্লাটা ঝুলিয়ে দিল সে রানার কাঁধে।

রিং থেকে বেরোতে গিয়ে দশহাত তফাতে লোরীর মুখটা দেখতে পেল রানা। কুৎসিত একটুকরো হাসি সে-মুখে।

সাত

ড্রেসিংরুমে যতক্ষণ প্রেসম্যান এবং ভক্তবৃন্দের ভিড় ছিল ততক্ষণ বেশ খানিকটা নিরাপদ বোধ করেছে রানা। প্রচুর প্রশংসার পর আর কোন কথা না পেয়ে লোক যখন একজন দু'জন করে খসে পড়তে আরম্ভ করল, নিরাপত্তাবোধ এক ডিগ্রী দুই ডিগ্রী করে কমতে থাকল। বিপদের জন্যে প্রস্তুত হলো রানা মনে মনে। এই বিপদের মধ্যেও, উচিত ছিল না, তবু রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কলি মনে পড়ল ওর: জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না!

ম্যাসেজ শেষ হতেই উশখুশ করতে থাকল স্যানসোনি। কিছুক্ষণ আগে থিরু ঢুকেছিল ড্রেসিংরুমে, কাটিয়ে দিয়েছে রানা। ওকে এসব ব্যাপারে জড়াতে চায় না

সে। একেও ছেড়ে দিতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

জনা দুয়েক প্রেস রিপোর্টার আর একজন ক্রীড়ারসিক ঘরের এককোণে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তুমুল তর্ক চালিয়েছে নিজেদের মধ্যে গত বিশ বছরের ইতিহাস নিয়ে। কোন্ বছর কোন্ কোন্ খেলোয়াড় কয়টা খেলায় জিতেছে, কে কোন্ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, ইত্যাদি ব্যাপারে এতই মশগুল হয়ে পড়েছে ওরা যে দিগ্বিদিক আর জ্ঞান নেই। রানার কথা ভুলেই গেছে ওরা।

'আচ্ছা এসো তবে, স্যানসোনি,' টাইটা ঠিক করে নিয়ে বলল রানা। 'আমার জন্যে অনেক করেছ তুমি, সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর অপেক্ষা করা ঠিক হচ্ছে না, কেটে পড়ো এবার মানে মানে।'

দৃষ্টিটা আবছা কোমল হয়ে এল গরিলার। বলল, 'কোথায়, কিছুই তো করতে পারলাম না আপনার জন্যে। করবার উপায়ও নেই। আপনিও জলদি কেটে পড়বার চেষ্টা করুন। দেখবেন, একা যেন আপনাকে না পায় ওরা।' শার্টের হাতায় কপালের ঘাম মুছল স্যানসোনি। 'কিন্তু কেন এই কাজটা করতে গেলেন আপনি? কাজটা করা কি উচিত হলো?'

'কোন্ কাজটা অনুচিত হয়েছে শুনি?'

শিরশির করে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল রানার মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে। ঘাড় ফিরাল রানা। হাসছে মেয়েটি। চোখ দুটো যেন শরতের আকাশ—অসীম দেখা যায় তার মধ্যে দিয়ে। দুই হাতে পাতলা সাদা গ্লাভস, ডান হাতে একটা সাদা ভ্যানিটি ব্যাগ, বাম হাতের আঙুলের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। 'কোন্ কাজটা অনুচিত হয়েছে তোমার, রানা?'

কেটে পড়ল স্যানসোনি। বেরিয়ে গেল সুড়ুৎ করে। বোবা-কালা বনে গেছে মোহাবিষ্ট রানা, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সে মেয়েটির মুখের দিকে। থেমে গিয়েছে তর্ক-বিতর্ক, তিনজনই হাঁ করে চেয়ে রয়েছে এইদিকে। নড়েচড়ে উঠল একজন।

'এবার আমাদের সরে পড়া উচিত। ফাইটারের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত উপস্থিত।' নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠল লোকটি। সাথের দু'জনও হাসল একটু। বেরিয়ে গেল ওরা তিনজন। হঠাৎ যেন ফাঁকা হয়ে গেল ঘরটা।

'হ্যালো!' বলল রানা। 'কত জিতলে?'

টকটকে লাল ঠোঁট থেকে সিগারেটটা সরিয়ে নিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল মেয়েটি।

'বিশ হাজার। দশ হাজার খেলেছিলাম। আর একটু হলে গিয়েছিল আমার দশ হাজার। লাস্ট রাউণ্ডে যেভাবে নক্ আউট হয়ে যাচ্ছিলে···আমি তো ভেবেছিলাম গেল···'

'সেজন্যে আমি দুঃখিত। আমি আসলে মন দিতে পারছিলাম না খেলায়। রিং-এর বাইরে একটি মেয়ে আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল।'

'তাই নাকি? কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি ভুরু নাচিয়ে।

'জীবনে এত সুন্দর মেয়ে আর দেখিনি আমি।'
'তাকে কথাটা বলা উচিত ছিল তোমার। মেয়েরা একথা শুনতে খুব ভালবাসে।'
'তাকেই তো বলছি।'
'ও, ইউ আর ফ্ল্যাটারিং! আই ডোন্ট বিলিভ ইউ। আমার কাছে এটা বরং ফিক্সড গেম বলে মনে হয়েছে। আগে থেকে ঠিক করা ছিল কে হারবে, কে জিতবে।'
'কি করে বুঝলে?'
'বিচ্ছিরি চেহারার সব লোকগুলোক তোমার কানের কাছে ফিসফাস করতে দেখেই বোঝা গেছে পরিষ্কার। তার ওপর দেখলাম খামোকা মারার ভান করছ তুমি ফার্স্ট রাউণ্ডে, থার্ড রাউণ্ডে ইচ্ছে করেই মার খেলে। আমি ফাইট দেখে দেখে চোখ পাকিয়ে ফেলেছি—আমার চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়। যাক্, হঠাৎ মত পরিবর্তন করলে কেন?'
'মেয়েটির একটি কথায়,' বলল রানা। 'সেইসাথে ভাবলাম বোকা দর্শকগুলোর কথাও, সর্বস্ব ধরেছে যারা আমার ওপর।'
'মেয়েটি তাহলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে তোমার ওপর!' রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল মেয়েটি একবার। 'তুমিও বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছ তার ওপর। এত হ্যাণ্ডসাম পুরুষ দেখিনি আমি আজ পর্যন্ত।'
দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা। বুঝতে পারল, মূল্যবান সময় অপব্যয় হচ্ছে, মেয়েটির সঙ্গে এভাবে গল্প করা ঠিক হচ্ছে না, এক্ষুণি পালানো দরকার এখান থেকে লোরী আর পেরেরার হাত থেকে বাঁচতে হলে— কিন্তু নড়তে পারল না সে। মন্ত্রমুগ্ধ সাপ যেন সে—মায়া কাটাতে পারছে না বেদেনীর।
'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা হঠাৎ। 'এখানে এসেছ কেন?'
গম্ভীর হয়ে গেল মেয়েটির মুখ। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে।
'আমার পরিচয় আপাতত না জানলেও চলবে। আমাকে রিটা বলে ডাকতে পারো। তোমার বিপদ টের পেয়েই এখানে চলে এসেছি আমি। আমার মনে হয়েছে এর জন্যে আমিও কিছুটা দায়ী। তুমি বিপদগ্রস্ত, তাই না?'
'হ্যাঁ। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার কিছুই করবার নেই।'
'বিপদের গুরুত্ব কতখানি? আই মীন হাউ ব্যাড ইট ইজ?'
'কুড্ন্'ট বি ওয়ার্স। দুটো হারামজাদা সুযোগ খুঁজছে— বাগে পেলেই আমার হার্ট লক্ষ্য করে টার্গেট প্র্যাকটিস করবে।'
'রঘুনাথকে ডাবল্ ক্রস করেছ?'
অবাক হলো রানা। 'চেনো তুমি ওকে?'
'নাম শুনেছি। কীর্তিকলাপের কথাও শুনেছি কিছু কিছু।' হঠাৎ সচকিত হয়ে বলল, 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি আমরা। এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে।' দ্রুত পায়ে জানালার কাছে চলে গেল রিটা। 'ওই পাইপটা বেয়ে নেমে যেতে পারবে তুমি অনায়াসে। ওই দেখো, আমাদের গাড়িটা দেখা যাচ্ছে।'

রানাও গিয়ে দাঁড়াল জানালার ধারে। কার পার্কে বেশি গাড়ি আর নেই।

'ওই যে দ্বিতীয় সারির তিন নম্বর কালো গাড়িটা। ক্যাডিলাক। ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই বেঁচে যাবে তুমি এ-যাত্রা।'

রানা চেয়ে দেখল ক্যাডিলাকটার দিকে। তারপর বলল, 'এসবের মধ্যে তোমার আর জড়িয়ে কাজ নেই। ভয়ঙ্কর লোক এরা।'

'বোকার মত কথা বোলো না। ওরা টেরই পাবে না। কেউ জানবেও না কিভাবে পালিয়েছ তুমি।'

'যাই হোক, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না। এই বিপদের মধ্যে···'

'আহ্! তর্ক কোরো না! আমি নিচে চললাম। দরজা বন্ধ করে দাও ভেতর থেকে। আমি গাড়িতে উঠে বসলেই নেমে যাবে তুমি পাইপ বেয়ে। আমি তোমার পাশ দিয়ে গাড়ি চালাবার সময় সামনের দরজাটা খুলে দেব, লাফিয়ে উঠে পড়বে। বাকিটুকু ছেড়ে দাও আমার হাতে।'

আবার গাড়িটার দিকে দৃষ্টি যেতেই দেখতে পেল রানা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইছে মেয়েটির পাশের সেই প্রবীণ লোকটি।

'তোমার বন্ধুটি পছন্দ করবেন না আমার অনধিকার প্রবেশ? তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন উনি,' বলল রানা।

ছোট্ট এক টুকরো নিষ্প্রাণ তিক্ত কাষ্ঠহাসি বেরিয়ে এল রিটার মুখ থেকে। অবাক হয়ে চাইল রানা ওর মুখের দিকে।

'ও আমার বন্ধু নয়, ও আমার স্বামী।' কথাটা বলেই দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগোল রিটা। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমি কার পার্কে। দরজা লাগিয়ে দাও—কাউকে ঢুকতে দিয়ো না।' রানা কিছু বলবার আগেই চলে গেল সে।

এগিয়ে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল রানা। ঘরটা আরও ফাঁকা মনে হচ্ছে এখন ওর কাছে। জানালার কাছে ফিরে এল ও। গাড়িটার পাশে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে রিটার স্বামী। পকেট থকে সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেট ধরাল লোকটা।

খুট করে শব্দ হলো পিছনে। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। দরজার হ্যাণ্ডেলটা ঘুরল আধপাক। সন্তর্পণে ঠেলা দিল কেউ দরজায়। ছিটকিনি লাগানো আছে, খুলল না দরজা। হ্যাণ্ডেলটা ফিরে গেল আগের জায়গায়।

এসে গেছে ওরা! বেশির ভাগ লোকই স্টেডিয়াম ছেড়ে চলে গেছে, বাইরে লাউড-স্পীকারে মুহম্মদ রফির গযল হচ্ছে: গযব কিয়া, তেরী ওয়াদেপে এতেবার কিয়া।— খুনের এই তো প্রকৃষ্ট সময়, গুলির শব্দ পৌঁছবে না কারও কানে।

পা টিপে দরজার পাশে চলে এল রানা। কান পাতল দরজার গায়ে। কে যেন ফিস ফিস করে কাউকে কিছু বলল। কথাটা শুনতে পেল না রানা, কিন্তু শব্দটা শুনেই ঘাড়ের পেছনে চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল ওর।

ছিটকিনিটা তেমন শক্ত নয়। এক লাথিতেই খুলে যাবে। রাবিং টেবিলটা তুলে এনে ঠেকা দিয়ে রাখল রানা দরজায়। এমন ভাবে রাখল, যাতে হ্যাণ্ডেলটা ঘুরতে না পারে। ছিটকিনি এবং হ্যাণ্ডেল দুটোই কাজ করবে এখন, তার ওপর ভারি রাবিং

টেবিল তো রইলই। দ্রুত চিন্তা চলল রানার মাথার মধ্যে। এই স্টেডিয়ামের সবকিছু ওদের নখদর্পণে। ওরা নিশ্চয়ই জানে এই জানালা দিয়ে নিচে নেমে যাওয়া কঠিন নয়। যেই দেখবে দরজাটা খোলা যাচ্ছে না অমনি বুঝতে পারবে এই জানালা দিয়েই পালাবার মতলব করেছে রানা। কাজেই নিচে একজন প্রস্তুত থাকবে ওর জন্যে।

তিনমিনিট লাগবে পেরেরার সিঁড়ি দিয়ে নেমে সাইড ডোর দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে এই জানালার নিচে আসতে। হয়তো দরজা বন্ধ দেখেই এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে সে। এক্ষুণি পালাতে হবে।

জানালা দিয়ে একটা পা বের করেছে রানা কেবল, এমন সময় জোরে ধাক্কা দিল কেউ দরজায়। খুলল না দরজা। পিছন ফিরে চাইল না রানা আর, জানালা টপকে কার্নিসে চলে এল।

সরু কার্নিস। কিছুদূর এগোনোর পর তাড়াহুড়োতে একটা পা হঠাৎ ফস্‌কে গেল রানার। একটা হার্টবিট মিস হয়ে গেল যেন ওর। পড়ে যাচ্ছিল, দেয়ালের একটা ইঁটের খাঁজে তিনটে আঙুল বাধিয়ে বহুকষ্টে ভারসাম্য ফিরে পেল। কয়েকটা বিচ্ছিরি মুহূর্ত পার হয়ে গেছে, ঘাম ছুটেছে কপালে; চেপে রাখা দম ছাড়ল রানা কাঁপা নিঃশ্বাসে। এবার সাবধানে এগোল সে পাইপটার দিকে। দ্রুত নেমে এল পাইপ বেয়ে। দশফুট বাকি থাকতে হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নামল নিচে। জানালার নিচ থেকে সরে গিয়ে গলিমুখে একটা দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল রানা।

মৃদু গর্জন তুলে স্টার্ট নিল একটা গাড়ি। জুতো পায়ে কে যেন দৌড়ে আসছে এদিকে। চঞ্চল হয়ে উঠল রানার মন। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে গাড়ির দিকে দৌড় দেবার প্রবল ইচ্ছেটা দমন করল সে। এই আঁধারে দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত, আলোকিত কার-পার্কের দিকে দৌড় দিলে পরিষ্কার দেখতে পাবে ওরা ওকে।

এগিয়ে এল কালো ক্যাডিলাকটা রানার দিকে। আলো জ্বালেনি রিটা। হঠাৎ পেরেরার উপর চোখ পড়ল রানার। গজ পঁচিশেক বাঁয়ে দাঁড়িয়ে খোলা জানালার দিকে চেয়ে রয়েছে সে। রানা বুঝল, পেরেরা আশা করছে এক্ষুণি বেরোবে রানা জানালা দিয়ে, রানা যে ইতিমধ্যেই নেমে গিয়ে থাকতে পারে, ভাবছে না সে এখনও। এমনি সময়ে হুড়মুড় করে দরজা ভাঙার শব্দ এল উপর থেকে।

স্পীড কমে গেল ক্যাডিলাকটার রানার পাশে এসে, ঝটাং করে খুলে গেল সামনের দরজা।

'উঠে পড়ো! জলদি!' চেঁচিয়ে বলল রিটা।

চলন্ত অবস্থাতেই একলাফে উঠে পড়ল রানা গাড়িতে। অ্যাক্সিলারেটার টিপে ধরল রিটা যতদূর যায়। সাঁ করে এগিয়ে গেল গাড়ি মেইন গেটের দিকে। দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা সোজা হয়ে বসে।

'তোমাকে দেখতে পেয়েছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল রিটা হেডলাইট জেলে দিয়ে।

'ঠিক বলতে পারছি না।'

পিছন ফিরল রানা দেখবার জন্যে। রিটার স্বামীর উপর চোখ পড়ল ওর। অন্ধকারে মুখটা দেখা গেল না, কিন্তু বসবার আড়ষ্ট ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল এইসব ব্যাপার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না লোকটার। পিছন থেকে কাউকে অনুসরণ করতে দেখা গেল না।

'মনে হচ্ছে টের পায়নি,' বলল রানা। 'অন্তত ধাওয়া করছে না কেউ পেছন থেকে।'

'কি শুরু করেছ তুমি, রিটা?' বিস্ফোরণ ঘটল স্বামীর কণ্ঠে। 'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার! গাড়ি থামিয়ে নামিয়ে দাও লোকটাকে। এসব ব্যাপারে নিজেদের জড়ালে...'

হেসে উঠল রিটা খিলখিল করে।

'আহ্, চুপ করো, কুমার। একে গুলি করে মারবে ওরা হাতে পেলেই। দশ হাজার টাকা জিতিয়ে দেয়ার পরে কি করে একে বিপদের মুখে ফেলে রেখে আসি বলো?'

'বোকামির একটা সীমা আছে, রিটা। যেখানে ঝামেলা সেখানেই জড়াবে নিজেকে তুমি সবসময়।'

আবার হেসে উঠল রিটা। ছেলেমানুষি একটা ভাব ফুটে উঠল ওর কণ্ঠে।

'প্রতিটা সেকেণ্ড উপভোগ করছি আমি। উহ্!'

'হুঁহ্!' একটা বিরক্তির গর্জন ছেড়ে সীটের উপর আয়েশ করে বসল লোকটা হাত-পা ছড়িয়ে। একটু পরে অপেক্ষাকৃত নরম কণ্ঠে বলল, 'যাক্, এখন বেরিয়ে পড়ো এখান থেকে। স্টেডিয়াম থেকে মাইল দু'য়েক তফাতে একে নামিয়ে দিলেই হবে।'

'চুপ করো তো তুমি!' ধমক দিল রিটা স্বামীকে। রানার দিকে ফিরে বলল, 'ওর কথা কানে তুলো না। আমরা গল-এ যাচ্ছি, যাবে আমাদের সাথে, না নেমে পড়বে পথে কোথাও?'

'যাব,' বলল রানা।

মেইন গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। হঠাৎ রানার মনে হলো: গেটে বলে রাখেনি তো রঘুনাথ ওকে ঠেকাবার জন্যে? কথাটা রিটাকে বলল সে।

'হতে পারে। অসম্ভব নয়। মাথা নিচু করে বসে পড়ো মেঝের ওপর।'

গাড়ির গতি কমাতে বাধ্য হলো রিটা। সামনে আরও কয়েকটা গাড়ি বেরোচ্ছে গেট দিয়ে ধীরে-সুস্থে। হঠাৎ ব্রেক করল রিটা।

'দুইজন গার্ড দু'পাশ থেকে প্রত্যেকটা গাড়ির ভেতর উঁকি দিয়ে দেখছে।' ফিস্ ফিস্ করে বলল রিটা। 'আমি একটু থেমে দাঁড়াচ্ছি। আগের গাড়িগুলো বেরিয়ে গেলে সাঁই করে বের হয়ে যাব গেট দিয়ে।'

'পেছন থেকে গাড়ি আসছে একটা। খুব স্পীডে আসছে,' বলল রিটার স্বামী।

'আমি বরং বেরিয়ে যাই,' বলল রানা। উঠতে যাচ্ছিল, কাঁধ ধরে ঠেসে আরও নামিয়ে দিল রিটা।

'চুপ!'

আবার চলতে আরম্ভ করল ক্যাডিলাক। বাইরে কি ঘটছে, গেটটা আর কতদূর, পিছনের গাড়িটা কত পিছনে, কিছুই বুঝতে না পেরে বিচ্ছিরি এক অস্বস্তিতে ভুগতে আরম্ভ করল রানা। বিচিত্র আলোছায়া পড়ছে গাড়ির ভিতর। হঠাৎ পিছনে হর্নের আওয়াজ হতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। শেভ্রোলের হর্ন।

'গাড়ি থামিয়ো না,' বলল রিটার স্বামী পিছন থেকে। 'রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে চালাও যাতে পেছনের গাড়িটা আগে না যেতে পারে।'

কণ্ঠস্বরটা এমন ঠাণ্ডা এবং নিস্পৃহ যে অবাক হলো রানা। বিপদের সময় লোকটার এমন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করবার ক্ষমতা দেখে একটু অস্বাভাবিক ঠেকল ওর কাছে।

আবার হর্ন দিল শেভ্রোলে, কিন্তু সাইড দিল না রিটা।

'গেটের কাছাকাছি চলে এসেছি,' বলল রিটা নিচু গলায়। গাড়ির স্পীড বাড়ল একটু।

মাথাটা কাৎ করে উপর দিকে চাইল রানা। একটা প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা মুখ দেখতে পেল সে এক ঝলক, সোজা চেয়ে আছে ওর দিকে।

'এই যে! ও মিস্টার! এক মিনিট...' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল লোকটা রানাকে দেখতে পেয়েই। খুলে ফেলল সামনের দরজাটা।

ভিতর দিকের হ্যাণ্ডেল ধরে প্রাণপণ শক্তিতে টান দিল রানা। দড়াম করে লেগে গেল দরজা। অ্যাক্সিলারেটার টিপে ধরল রিটা। একলাফে দশ হাত এগিয়ে গেল গাড়ি। পিছন থেকে চিৎকার করতে থাকল গার্ড—কিন্তু কে-কার কথা শোনে। উঠে বসল রানা সীটের উপর। সামনে রাস্তা জুড়ে মন্থর গতিতে চলেছে একটা পুরানো মডেলের অস্টিন। হর্ন দিয়েই রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর নামিয়ে দিল রিটা ক্যাডিলাকের দুই চাকা, ইঞ্চি দু'য়েকের জন্যে বেঁচে গেল ওরা অ্যাকসিডেন্ট থেকে, ওভারটেক করে আবার উঠল ক্যাডিলাক পাকা রাস্তায়।

'আমাদের পেছনে ফলো করছে শেভ্রোলে,' রিটার স্বামীর কণ্ঠে উষ্মা। 'মানা করলাম তোমাকে এসব ঝামেলায় জড়িয়ে কাজ নেই, তবু...'

কোনও উত্তর না দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে স্পীড বাড়িয়ে দিল রিটা। রাস্তাটা বিটুমেন সারফেস করা। নব্বই পেরিয়ে গেল কাঁটা। বেরানব্বই আর তেরানব্বই-এর মাঝখানে কিছুক্ষণ ওঠানামা করে পছন্দ হলো না একটাকেও— চুরানব্বই-এ গিয়ে স্থির হলো কাঁটা। উড়ে চলেছে যেন ক্যাডিলাকটা রাস্তার উপর দিয়ে। কাণ্ডি ছাড়িয়ে আট-দশ মাইল পশ্চিমে চলে এসেছে ওরা।

বেশ খানিকটা পেছনে সরে গেছে শেভ্রোলের হেড লাইট, কিন্তু পিছু ছাড়েনি।

'খসিয়ে দিয়েছি!' বলল রিটা এতক্ষণে। 'আর ধরতে হচ্ছে না আমাদের।'

'রাস্তার দিকে খেয়াল রাখো!' ধমকে উঠল রিটার স্বামী পিছন থেকে। 'অ্যাক্সিডেন্ট করবে নাকি? গল্পগুজব পরে হবে। সামনে বাঁক আসছে একটা। স্পীড কমাও না, আরে...'

'রাবিশ! গোলমাল কোরো না তো! চুপচাপ বসে থাকো। গাড়ি চালানো শেখাতে হবে না আমাকে,' বলল রিটা রাগত স্বরে।

পিছনে চেয়ে দেখল রানা। পুলকিত হবার কিছুই নেই, বড়জোর তিনশো গজ পিছনে পড়েছে শেভ্রোলে, আধ-মাইল জোড়া বাঁকটা এসে পড়ায় স্পীড কমাতে বাধ্য হয়েছে ওরাও, একটু একটু করে আরও পিছিয়ে যাচ্ছে সেটা।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে চালাচ্ছে রিটা। স্পীড মিটারের কাঁটা এখন সত্তরে। এই রাস্তার পক্ষে এত স্পীড একটু অতিরিক্তই মনে হলো রানার কাছে। অবশ্যি ভয়ের কিছুই নেই, পাকা হাত রিটার, তাছাড়া রাস্তা ফাঁকা। বামধারে পাহাড়, ডান ধারে মানুষের মাথা-সমান ঝোপঝাড়—ওপাশে কি আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডানধারে বেঁকে গেছে রাস্তাটা।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল রানা, 'সাবধান! সামনে গাড়ি!'

দেখতে পায়নি রিটা। ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু আলোর রশ্মি দেখতে পেয়েই চিৎকার করেছে রানা। হেড লাইট ডিপ করে অ্যাক্সিলারেটার ছেড়ে দিল রিটা।

ফুলস্পীডে আসছে সামনের গাড়িটা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। পিছন ফিরল রানা। অনেক পিছনে পড়ে গিয়ে মত পরিবর্তন করেছে শেভ্রোলে। ধরা যাবে না বুঝে ফিরে যাচ্ছে কাণ্ডির দিকে। বাঁয়ে কাটল ক্যাডিলাক। ঝট্ করে সামনের দিকে ফিরল রানা। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে আসছে সামনের গাড়িটা ফুলস্পীডে। চোখ ধাঁধানো হেডলাইটের আলোয় দিশে হারিয়ে ফেলল রিটা, বাঁয়ে কাটল আরও। রাস্তা ছেড়ে অসমান জায়গায় চাকা পড়ে আওতার বাইরে চলে যেতে চাইল ক্যাডিলাকটা। প্রাণপণে গাড়িটা সোজা রাখবার চেষ্টা করছে রিটা, হুইলের সঙ্গে যুদ্ধ করছে সে রীতিমত।

সামনের গাড়ির ড্রাইভার যেন দেখতেই পায়নি এই গাড়িটা, এমনিভাবে এগিয়ে আসছে।

ভীত, কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল রিটার স্বামী। গাল দিল সামনের গাড়ির ড্রাইভারকে।

এসে পড়ল গাড়িটা। শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং কাটবার চেষ্টা করল সামনের ড্রাইভার। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। তেরছাভাবে একপাশ থেকে মারল ওটা ক্যাডিলাককে। রিটার তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে গেল রানার। ধাতব শব্দ। সামনের গাড়িটা গড়িয়ে চলে গেল ঝোপ-ঝাড়গুলোর দিকে। ড্যাশবোর্ড চেপে ধরল রানা এক হাতে। উল্টে যাচ্ছে ক্যাডিলাক। সামনের উইণ্ডশীল্ডটা চুর হয়ে গিয়ে মাকড়সার জালের মত দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড আরেকটা ঝাঁকি। সাতটা সূর্য জ্বলছে রানার চোখের সামনে। আর একবার রিটার আর্তনাদ শুনতে পেল সে। তারপর দপ করে একসাথে নিভে গেল সাতটা সূর্য। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক।

আট

ডেটল, ইথার আর ব্লিচিং পাউডারের গন্ধে রানা বুঝল হাসপাতালে আছে। দুই মন

ওজনের দুটো চোখের পাতা খুলল সে। সিনেমার ডক্টর কিলডেয়ার দাঁড়িয়ে আছে সামনে। না, সেই রকমই পাতলা-সাতলা, লম্বা মুখ, সাদা অ্যাপ্রন পরা ডাক্তার একজন।

'কেমন বোধ করছেন এখন?' জিজ্ঞেস করল তরুণ ডাক্তার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

চোখের পাতাগুলো বুজে এল রানার। মৃদু হাসবার চেষ্টা করল। দুলছে ঘরটা। লাল, নীল, বেগুনী আলো দেখতে পাচ্ছে সে চোখের সামনে। চারপাশে ধোঁয়াটে অন্ধকার। তলিয়ে গেল সে আবার। মহাকাল থমকে দাঁড়াল যেন।

অনেক, অনেকক্ষণ পর একটু একটু করে আবার জ্ঞান ফিরে এল রানার। চোখ খুলেই সাদা স্ক্রীন দেখতে পেল সে। জেনারেল ওয়ার্ডে সাদা স্ক্রীন কেন? মুমূর্ষু রোগীর বেডের চারপাশে এমনি স্ক্রীন টাঙানো হয়। তবে কি মরে যাচ্ছে সে?

মোটা একজন লোক বসে আছে বিছানার পাশে একটা চেয়ারে। এক নজরেই বুঝল রানা, পুলিসের লোক। বিরক্ত মুখে বসে বসে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে সে। রানার উপর চোখ পড়তেই সামনে এগিয়ে এল লোকটা।

'এই যে, হুজুরের জ্ঞান ফিরেছে তাহলে! আমার ডিউটি অফ হবার ঠিক আগের মুহূর্তেই তোমার জ্ঞান ফেরবার দরকার হয়ে পড়ল! কেন, আরেকটু পরে জাগলে হত না?' বিরক্ত কণ্ঠ মোটা লোকটার।

গলার আওয়াজ শুনে স্ক্রীন সরিয়ে এগিয়ে এল একটি নার্স। বলল, 'কেমন বোধ করছেন এখন?'

'ভাল।' রানার মনে হলো নিজের কণ্ঠস্বরটা ভেসে এল এক আলোক-বৎসর দূর থেকে।

'কথা বলার দরকার নেই। চুপচাপ শুয়ে থাকুন। ঘুমোবার চেষ্টা করুন বরং।'

'ঘুম?' অবাক হলো মোটা লোকটা। 'কথা বলতে হবে ওকে। এসবের মধ্যে তুমি নাক গলাতে এসো না, সুন্দরী। দুই একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না তুমি, মিস্টার?'

'পারব মনে হচ্ছে,' বলেই চোখ বুজল রানা।

আবার যখন চোখ খুলল তখন সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডক্টর কিলডেয়ার।

'কেমন আছি, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল রানা মৃদু হেসে।

'দৈবশক্তি আছে আপনার মধ্যে, মশাই। সেরে উঠছেন এবার।'

'কোথায় আছি আমি?' জিজ্ঞেস করল রানা আবার।

'মোটর অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলেন। ক'টা দিন চিন্তা ছিল, এখন দ্রুত সেরে উঠছেন। ইজি, টেক ইট ইজি।'

মোটা পুলিসটা এগিয়ে এল ডাক্তারের পিছন থেকে।

'এর সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে পারি?' জিজ্ঞেস করল পুলিসটা ডাক্তারকে। 'শুধু এক-আধটা প্রশ্ন করব। কোনও অসুবিধে হবে না ওর।'

'সংক্ষেপে সারতে হবে। অযথা কথা বাড়াবেন না,' মাথা ঝাঁকিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল ডাক্তার। একটা ভোঁতা পেন্সিল আর নোট বুক নিয়ে প্রস্তুত হলো মোটা।

'নাম কি তোমার?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আমরা জট ছাড়াবার চেষ্টা করছি শুধু।

'মাসুদ রানা।'

'ঠিকানা?'

'পূর্ব পাকিস্তান।'

ভুরু কুঁচকে গেল মোটা লোকটার। অবিশ্বাস ফুটে উঠল ওর চোখ-মুখের ভঙ্গিতে।

'সিংহলে ঠিকানা?'

'সিংহলে কোন ঠিকানা নেই আমার। বেড়াতে এসেছিলাম। ট্যুরিস্ট।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। তা, বাপ-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী কেউ নেই?'

'না।'

'উহ্!' বেদনায় কুঁচকে গেল মোটা লোকটার মুখ। 'দেখুন তো, ডাক্তার সাহেব, আমার মত পোড়াকপালে লোক আর আছে পৃথিবীতে? এত লোক গাড়ি-ঘোড়ার অ্যাক্সিডেন্ট করছে, পড়বি তো পড় আমার কপালেই পড়ল একটা নাদান এতিম!'

'সংক্ষেপ করুন,' নির্দেশ দিল ডাক্তার। পালস্ পরীক্ষা করছে সে এখন রানার। 'এত কথা বলা বা শোনার উপযুক্ত হয়নি এখনও এঁর শরীর।'

'আর এক মিনিট। শুধু এক মিনিট, ডাক্তার। জটটা খুলতেই হবে আমাকে।' রানার দিকে ফিরল মোটা, 'আপন বলতে কেউ নেই, তাই না? সঙ্গের সুন্দরী মেয়েটা কে ছিল?'

রিটার চেহারার কথা মনে পড়ল রানার। এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেনি সে আর। শুধু···শুধু···কোথায় যেন একটু উগ্রতা রয়েছে। চোখ-দুটো ক্ষুধার্ত, অতৃপ্ত। দুর্বোধ্য এক আকর্ষণে সম্মোহন করে চোখ দুটো পুরুষকে—যে-কোন পুরুষকে।

'মেয়েটার পরিচয় আমার জানা নেই। নামটা শুধু জানি—রিটা। কেমন আছে রিটা? খুব বেশি চোট পেয়েছে কি?'

'না-না, ভালই আছে। ওর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন করবেন না আপনি নিজেকে,' উত্তর দিল ডাক্তার।

'আর রিটার স্বামী?'

'কিসের স্বামী?' তাজ্জব হয়ে চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল মোটা পুলিস।

'যে লোকটা গাড়ির পিছনে বসে ছিল সে-ই রিটার স্বামী। পুরো নাম জানি না, কুমার বলে ডাকছিল রিটা ওকে। সে কেমন আছে?'

'ওর সম্পর্কেও উদ্বেগের কিছু নেই,' বলল ডাক্তার। 'ভাল আছে সে-ও।'

চুলের মধ্যে পেন্সিল ধরা হাতটা চালিয়ে দিয়ে চাঁদি চুলকাল পুলিসটা সীস দিয়ে। তারপর হতাশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কিভাবে ঘটল ব্যাপারটা? এটুকু বলতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই তোমার?'

সব কথা বলতে গেলে অনেক কথা, রঘুনাথের কথা পরেও বলা যাবে। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে রানার।

'আরেকটা গাড়ি আসছিল সামনে থেকে খুব জোরে। খুব সম্ভব দেখতে পায়নি আমাদের। স্টিয়ারিং বাঁয়ে কেটে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল রিটা, কিন্তু পাশ থেকে মেরে দিল ব্যাটা। ডানধারে ঝোপ-ঝাড়ের উপর গিয়ে পড়ল সামনের গাড়িটা, মনে আছে। ওর কি অবস্থা?'

হতাশ ভঙ্গিতে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিয়ে বাতাস ছাড়ল পুলিস। তারপর টিটকারি মেরে বলল, 'ওর সম্পর্কেও উদ্বেগের কিছু নেই। হেঁটে বেড়াচ্ছে সে হাসপাতালের বারান্দাময়! দেখো, মিস্টার, শুধু শুধু গল্প বানিয়ে ভজঘট না করে আমার দুই-একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি যদি বিদেশী ট্যুরিস্ট হবে তাহলে বুইকটা চালাচ্ছিলে কি করে?'

এবার রানার অবাক হওয়ার পালা।

'কি যা-তা বলছেন! গাড়িটা ছিল কালো একটা ক্যাডিলাক। মেয়েটা চালাচ্ছিল। আমি পাশে বসেছিলাম। ওর স্বামী, কুমার বসেছিল পেছনের সীটে।'

'হায় হায়রে কপাল আমার!' কপাল চাপড়াল মোটা লোকটা। হাতের পোঁছায় নাকের ঘাম মুছল। তারপর আঙুল বাড়িয়ে রানার দিকে দেখাল। 'তুমি চালাচ্ছিলে! মেয়েটা ছিল পেছনের সীটে! আর কোন হারামখোর স্বামী ছিল না। বুঝতে পেরেছ? আর গাড়িটা ছিল বুইক!'

উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা।

'ভুল বলছ তুমি!' খামচে ধরল সে বিছানার চাদর। 'আমি বলছি, রিটা চালাচ্ছিল গাড়ি। কালো একটা ক্যাডিলাক। যে গাড়িটা আমাদের ধাক্কা দিল তার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে দেখো না। সে তো আর মিছে কথা বলবে না?'

ফটাশ করে নোট বুক বন্ধ করল মোটা লোকটা। মাথা নাড়ল এদিক-ওদিক হতাশ ভঙ্গিতে। তারপর যেন গোপন একটা খবর জানাচ্ছে এমনিভাবে বলল, 'আর কোনও গাড়ি ছিলই না সেখানে! কোনও গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগেনি তোমাদের। কেন খামোকা মিছে কথা বলে সবটা ব্যাপার আরও ঘোলা করে তুলছ?'

'হয়েছে,' বলল ডাক্তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। 'এবার আপনি যেতে পারেন, সার্জেন্ট। ওঁর বিশ্রাম দরকার এখন।'

'আমি মিথ্যে কথা বলছি না। কেন শুধু শুধু মিছে কথা বলব আমি?' উঠে বসবার চেষ্টা করল রানা। প্রচুর সর্ষেফুল দেখতে পেল সে চোখের সামনে। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল বিছানার উপর।

পরদিন বিকেলের দিকে জ্ঞান ফিরল ওর। পায়ের দিকের স্ক্রীন সরিয়ে ফেলা হয়েছে, পাশের দুটো আছে কেবল। এপাশ-ওপাশ ফিরে দেখল রানা পুলিসের সার্জেন্টটা নেই। শুয়ে শুয়েই অনুভব করল, অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। মাথাটা একটু ঘোলাটে লাগছে, কিন্তু ব্যথা নেই। প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটু-আধটু নেড়েচেড়ে দেখে আশ্বস্ত হলো রানা—সবগুলো আছে, কাটা পড়েনি একটাও। হাত দুটো নাড়াতেও তেমন অসুবিধে হচ্ছে না আর।

পুলিস সার্জেন্টের কথাগুলো মনে হতেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানার মন। অন্য কোন গাড়ি ছিল না, রিটার স্বামী ছিল না, ক্যাডিলাক ছিল না, বুইক চালাচ্ছিল

রানা—ব্যাপার কি? স্বপ্ন দেখেছিল নাকি রানা পুলিস সার্জেন্টটাকে? খুব সম্ভব তাই। কুয়াশাচ্ছন্ন চেতনায় অবাস্তব এক সার্জেন্টকে দেখেছে সে স্বপ্নে। এমনও হতে পারে সত্যিই এসেছিল লোকটা—ওকে অন্য কোন লোক বলে ভুল করেছে।

ডান পাশের পর্দা সরিয়ে এগিয়ে এল ডাক্তার। মিষ্টি করে হাসল সে রানাকে সচেতন দেখে। বলল, 'আপনাকে না জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পারছি অনেক সুস্থ বোধ করছেন আপনি। কি, ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ। অনেক ভাল লাগছে এখন। ক'দিন ধরে আছি আমি এখানে?'

পায়ের দিকে ঝোলানো কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে ডাক্তার বলল, 'আপনাকে ভর্তি করা হয়েছে ১৩ মে রাত সাড়ে নটায়। আর আজ হচ্ছে ১৮ মে। ছ'দিন আছেন আপনি এখানে।'

'মে! মে মাসের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'আসলে মার্চ বলতে চাইছেন, তাই না? মে মাস তো হতেই পারে না। ২২ মার্চ, শুক্রবার, রাতের বেলা অ্যাক্সিডেন্ট হলো। সেইদিন আমার কুস্তি ছিল হাম্বানটোটার সাথে।'

'তা জানি না আমি। কিন্তু আপনাকে ভর্তি করা হয়েছে ১৩ মে।'

'অসম্ভব! দেড় মাসের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলাম, তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে এনে কেউ ভর্তি করে দিল হাসপাতালে, এমন হতেই পারে না।'

হাসল ডাক্তার মধুর করে।

'ঠিক বলেছেন, এমন হতেই পারে না। আসলে অ্যাক্সিডেন্টের প্রায় সাথে সাথেই একজন সার্জেন্ট পৌঁছে গিয়েছিল ঘটনাস্থলে মোটর সাইকেলে করে। একঘণ্টার মধ্যে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায়।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজাবার চেষ্টা করল রানা। শুকিয়ে গেছে জিভটা। উঠে বসবার চেষ্টা করতেই হাত তুলে বারণ করল ডাক্তার। ধরে শুইয়ে দিল আবার। হার্টবিট দ্বিগুণ হয়ে গেছে রানার।

'আচ্ছা, শুধু একটা কথার উত্তর দিন, ডক্টর। তারিখটা সম্পর্কে আপনার ভুল হচ্ছে না তো? আজ ১৮ মে?' কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আজ ১৮ মে, ভুল নেই তাতে,' বলল ডাক্তার। বিছানার ধারে বসে পড়ল সে। 'এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো আপনার এখন উচিত হচ্ছে না। আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু। কংকাশন হয়েছে আসলে আপনার মধ্যে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন আপনি, বেঁচে যে গেছেন সেইটেই আশ্চর্য! কিছুদিন যদি সবকিছু উল্টোপাল্টা লাগে, তারিখ গোলমাল হয়ে যায়, গাড়িটা আসলে কি ছিল, কিংবা কে কোথায় বসেছিল ঠিক ঠিক মনে না আসে তো ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। এরকম হয়। দেখবেন, কয়েক দিনের মধ্যে ঠিক খাঁজে খাঁজে বসে যাচ্ছে সব কিছু। এখন হয়তো আপনার স্থির বিশ্বাস মার্চের বাইশ তারিখে ঘটেছে অ্যাক্সিডেন্টটা, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে আসলে ১৩ মে-তে ঘটেছে—কিন্তু এ-নিয়ে

বেশি মাথা ঘামাবেন না। সাতদিনের মধ্যেই দেখবেন জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে সবকিছু আপনার কাছে। আরেকটা কথা, পুলিসের কাছে বেফাঁস কিছু বলবেন না। আমি অবশ্যি আপনার অবস্থাটা বুঝিয়ে বলেছি ওদের, ওরা বুঝতেও পেরেছে। ওরা হয়তো কোনও ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে আপনাকে, বেশি কথা না বলে সময় চাইবেন। আর কিচ্ছু না, প্রচুর বিশ্রাম দরকার আপনার। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রানা বুঝতে পারল তরুণ ডাক্তার তার সাধ্যমত সবরকম সাহায্যের চেষ্টা করছে। ভাল লাগল লোকটিকে। কিন্তু তাই বলে উদ্বেগ গেল না ওর মন থেকে। পরিষ্কার মনে আছে ওর, অফিস থেকে একমাসের ছুটি নিয়ে ঢাকা থেকে প্লেনে উঠেছিল সে ১৫মার্চ। কলম্বোতে কাটিয়েছিল কয়েকদিন, ভাল লাগেনি, তাই কাণ্ডি গিয়েছিল সে, ওখান থেকে বাদুলা যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু জড়িয়ে পড়ল বিশ্রী এক প্যাঁচে। ২২ মার্চ কুস্তি ছিল ওর মিস্টার হাম্বানটোটার সঙ্গে। রঘুনাথের আদেশ অমান্য করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল সে রিটা এবং কুমারের ক্যাডিলাক গাড়িতে করে স্টেডিয়াম থেকে সেই রাতেই। যে যাই বলুক তারিখের ব্যাপারে ভুল হয়নি ওর।

'আচ্ছা, এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না আমি। কিন্তু দয়া করে একটা উপকার করবেন আমার, ডক্টর?'

'নিশ্চয়ই। বলুন।'

'রিটা—মানে যে মেয়েটা সঙ্গে ছিল আমার, সে-ও তো এখানেই আছে, তাই না? ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন তারিখটা সত্যিই ২২ মার্চ ছিল কিনা। তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেও একই কথা বলবে।'

একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল ডাক্তারের সহানুভূতিশীল মুখটা।

'দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলতেই হচ্ছে। এই যে আপনি একটা স্বামীর কথা বলছেন—আসলে কেবল আপনাকে আর মেয়েটিকে পাওয়া গিয়েছিল গাড়িতে। কোন স্বামী ছিল না।'

ব্যাপার কি! ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভেতরটা।

'আচ্ছা, মেনে নিচ্ছি, রিটার স্বামী গাড়িতে ছিল না।' সংযত করবার চেষ্টা করল রানা নিজেকে। ঘরটা দুলছে যেন ওর চোখের সামনে। বলল, 'কিন্তু রিটা তো ছিল? সেটা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। ওকেই জিজ্ঞেস করুন না।'

মধুর হাসিটা মিলিয়ে গেছে ডাক্তারের মুখ থেকে। মাথার পিছন দিকটা চুলকাল সে।

'দু'দিন আগে আপনাকে বলা ঠিক হত না, তাই বলিনি,' বলল ডাক্তার। 'কিন্তু এখন বলা চলে। ঘাড় মটকে গিয়েছিল মেয়েটির। মরা পাওয়া গিয়েছিল তাকে।'

নয়

পরদিন সকালে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর বিজয়শেখর এল। নার্স বলে না দিলে বুঝতেই পারত না রানা যে এই লোক পুলিসের লোক। কেবল পুলিসের লোকই নয়, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে ট্রেনিং পাওয়া। ছোটখাট চেহারা, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, বেদনা ভারাক্রান্ত মুখ। কিন্তু চোখ দুটো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল। কারও দিকে চাইলে মনে হয় তার অন্তস্তল ভেদ করে দেখতে পাচ্ছে। অত্যন্ত ভদ্র, কোমল কণ্ঠস্বর।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল লোকটা। পরমাত্মীয়ের মত সহানুভূতিশীল কণ্ঠে রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন বোধ করছেন? মাথা ব্যথাটা গেছে?'

বিছানার চাদর খামচে ধরল রানা। মাথা নেড়ে সায় দিয়েই সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল রানা লোকটার মুখের দিকে। সবাইকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে সে। সবাই মিলে উল্টোপাল্টা কথা বলে কি পাগল প্রমাণিত করতে চায় ওকে? কি লাভ তাতে এদের?

'ডাক্তার বলছিলেন, খুবই আপসেট হয়ে গেছেন আপনি। কিন্তু ঘাবড়াবার কি আছে? মাথায় আঘাত পেয়ে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যাওয়া, কিংবা সন তারিখ উল্টেপাল্টে যাওয়া তো এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়। মাথা ঘামাবার ভারটা আমাদের ওপরে ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন—সব ঠিক হয়ে যাবে। সবটা ব্যাপার একটা সহজ যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চাইছি আমরা, আর কিছু নয়। মেয়েটা মারা গেছে। তৃতীয় ব্যক্তিকে যখন পাওয়া গেল না, তখন নিশ্চয়ই সে কেউ পৌঁছুবার আগেই পালিয়েছে। আপনাকে পিছন থেকে আঘাত করে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে হয়তো ভেগে গেছে লোকটা। আমাদের এখন সেই লোকটাকে খুঁজে বের করে তাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেয়া দরকার, যাতে এই কাজ দ্বিতীয়বার সে আর করতে না পারে। আপনার সাহায্য পেলেই তাকে ধরতে পারব আমরা অনায়াসে। এই ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন আমাদের?'

কথাগুলো খানিকটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো রানার কাছে। অন্তত সেদিনের সার্জেন্টের চেয়ে অনেক সহনযোগ্য। কিন্তু এটা কি ধরনের ব্যাপার? ওরা বলছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল এক সার্জেন্ট। যে গাড়িটা ওদের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেল তাহলে সেটাও তো ওদের চোখে পড়া উচিত ছিল। সেসব কথা চেপে যাচ্ছে কেন এরা বেমালুম? যাই হোক, এই লোকটার সাহায্যেই সব জট ছাড়িয়ে নিতে হবে। আবার মাথা নেড়ে সায় দিল সে—সাহায্য করবে।

'গুড। এখন বলুন দেখি আপনি বিদেশী একজন ট্যুরিস্ট, বুইকটা পেলেন কোথায়?'

আবার সেই এক কথা। রানা চালাচ্ছিল বুইক—এই কথাটা রানাকে দিয়ে স্বীকার করাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে কেন এই লোকগুলো? ওরা কি রিটাকে

হত্যার দায়ে ফাঁসাতে চায় ওকে? কোনও জটিল চক্রান্ত আছে এর পেছনে? চুপ করে রইল রানা। কোমল কণ্ঠে আবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল বিজয়শেখর। রানাকে অভয় দান করবার জন্যে হাসল সে একটু।

'দেখুন, গাড়িটা ছিল ক্যাডিলাক, রিটা চালাচ্ছিল, আমি পাশে বসেছিলাম··· কিন্তু এ-সব কথা বারবার বলবার কোন মানে হয় না। আসলে আমি বলতে চাই আপনারা গোড়া থেকেই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ভুল পথে চলেছেন। আসল ঘটনাটা শুনতে চান?'

'নিশ্চয়ই। আসল ঘটনাই তো শুনতে চাইছি। আপনি গোড়া থেকে ভেঙে বলুন সব কথা। কিছু গোপন না করে গড়গড় করে বলে যান, আমি শর্টহ্যাণ্ডে লিখে নিই। কোনও ভয় নেই আপনার। আপনার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখব আমি।'

'আমার লাভ-ক্ষতি আপনার না দেখলেও চলবে। নিন শুরু করুন, আমার নাম মাসুদ রানা, পিতা: ইমতিয়াজ চৌধুরী, জন্ম: ঢাকা। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কর্পোরেশনের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। আমাদের এমব্যাসীতে জিজ্ঞেস করলেই আমার সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারবেন। আমি একমাসের ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছিলাম সিংহলে। তারিখটা ছিল ১৫ মার্চ···।' গড়গড় করে বলে চলল রানা। ট্রেনে থিরুর সঙ্গে পরিচয়, বীরবর্ধনকে শায়েস্তা করা থেকে নিয়ে রঘুনাথের চক্রান্তে পড়া, আদেশ অমান্য করে জয়লাভ, রিটার সাহায্যে পলায়ন, লোরী এবং পেরেরার অনুসরণ এবং সবশেষে রাস্তায় একটা গাড়ির সাথে সংঘর্ষ—সব কথা বলল রানা বিজয়শেখরকে। তারপর বলল, 'আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে আমাদের এমব্যাসীতে খোঁজ করুন, এমন তথ্য জানতে পারবেন আমার সম্পর্কে যাতে চমকে উঠতে হবে আপনাকে।'

সবকথা কাউকে বলতে পেরে অনেকখানি হালকা হয়ে গেল রানার মনটা। চুপচাপ শুনে গেল বিজয়শেখর, কথার মাঝখানে বাধা দিল না একটিবারও। কান চুলকাল, পেন্সিল চুষল, খশখশ করে আঁচড় কাটল নোটবুকে। রানার কথা শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল সে।

'চমৎকার। সাজানো-গোছানো কাহিনীর মত লাগল শুনতে। অনেক ধন্যবাদ। আমি যাই, আপনি এখন বিশ্রাম করুন। দু'একদিনের মধ্যেই আবার আসব আমি। যদি এছাড়া আর কোনও কথা মনে পড়ে আপনার, তাহলে জানাবেন আমাকে।'

'আর কিছু জানাবার নেই,' বলল রানা। 'এমব্যাসীতে আজই একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।'

'আচ্ছা। তা দেব। আমি তাহলে চলি এখন।'

বেরিয়ে গেল বিজয়শেখর। লোকটিকে ভালই লাগল রানার। অন্যদের মত অবুঝ নয়। বিদেশ ঘুরে এসেছে, দশটা-পাঁচটা ভাল-মন্দ লোকের সঙ্গে মিশেছে। দৃষ্টিভঙ্গিটা প্রশস্ত। অন্যদের মত একটা ভুল তথ্য আঁকড়ে ধরে গায়ের জোরে সেটা প্রমাণের চেষ্টা অন্তত করবে না।

আরও দুটো দিন পার হয়ে গেল। রোজই একবার করে ডাক্তার আসে,

নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে যায়। আজও এল।

'বাহ্! এই তো চমৎকার সেরে উঠছেন। দু'দিন পরই চলতে-ফিরতে পারবেন। এইরকম রোগী না পেলে কি ভাল লাগে, বলুন? মৃত্যুর দুয়ার থেকে ডাক দিলেই ফিরে আসতে পারে কয়জন?'

মৃদু হাসল রানা। বলল, 'শহরটা দেখার বড় ইচ্ছে হচ্ছে আমার। অনেক শুনেছি পেরাদেনিয়ার কথা। সিলোন ইউনিভার্সিটিটা তো এখানেই, তাই না?'

বিস্ময় চাপতে পারল না ডাক্তার।

'এটা পেরাদেনিয়া তা কে বলল আপনাকে? এটা তো রত্নপুর।'

'রত্নপুর!' বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল রানা ডাক্তারের মুখের দিকে। এরা কি আবোল-তাবোল বলে পাগল করে দিতে চায় ওকে?

'পেরাদেনিয়া কিংবা কাণ্ডিতে কোন হাসপাতাল নেই?'

'আছে তো! থাকবে না কেন? বরং আমাদের চেয়ে ভাল হাসপাতাল আছে কাণ্ডিতে।'

'তাহলে আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কেন? কাণ্ডির বারো মাইলের মধ্যে ঘটেছিল অ্যাক্সিডেন্ট। পেরাদেনিয়ার কাছাকাছি। সেখানে ভর্তি না করে আমাকে আশি-নব্বই মাইল দূরে রত্নপুর নিয়ে আসার কি মানে?'

'আসলে রত্নপুর-কলম্বো হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন আপনি। রত্নপুর থেকে পাঁচ মাইল পুবে। এই হাসপাতালটাই সবচেয়ে কাছে ছিল বলে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে আপনাকে।'

'তা কি করে হয়? রিটা অবশ্যি বলেছিল গল্-এ যাচ্ছে, আমিও যেতে রাজি হয়েছিলাম সাথে। কিন্তু রত্নপুরের কাছে অ্যাক্সিডেন্ট হয় কি করে? কাণ্ডি থেকে মাত্র বারো মাইল এসেছিলাম আমরা, এমনি সময় গাড়িটা ধাক্কা দিল···'

'এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না,' বলল ডাক্তার মৃদু হেসে। 'সব ঠিক হয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই।'

চিৎ হয়ে পড়ে রইল রানা বিছানার উপর। সত্যিই কি তাহলে ওর ব্রেনটা নষ্ট হয়ে গেল? পাগল হয়ে গেছে সে? নাকি এক চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে আরেক চক্রান্তের জালে আটকে পড়েছে? এরা সবাই কি কোন বিশেষ স্বার্থে সাজানো কথা বলছে? আর সেই বিজয়শেখরই বা কোথায় গেল? কলম্বো থেকে সব খবর নিয়ে ফিরছে না কেন লোকটা? রানার মনে হলো একমাত্র ওই লোকটার উপরই নির্ভর করা যায়। ওই লোক রানার সম্পর্কে সবরকমের খোঁজ-খবর নিয়ে ফিরে এলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দুর্বল মস্তিষ্কে বেশি চিন্তা করতে পারল না রানা। মনে মনে প্রতিমুহূর্তে বিজয়শেখরকে আশা করতে থাকল সে।

পরদিন সকালে ট্রলিতে তুলে ঠেলে বের করে আনা হলো রানাকে জেনারেল ওয়ার্ড থেকে।

'কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা নার্সকে।

'আপনার জন্যে একটা কেবিনের ব্যবস্থা হয়েছে। ডাক্তারের আদেশে সেখানেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপনার আরও গভীর বিশ্রাম দরকার।'

রানা পরিষ্কার বুঝল বাজে কথা বলছে নার্সটা। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে এর পিছনে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কিছুতেই বুঝতে পারল না সে। সবার প্রতি সন্দেহে বিষিয়ে গেল ওর মন।

তেতলার চমৎকার একটা কেবিনে নিয়ে আসা হলো রানাকে। জানালা দিয়ে বাইরে চাইলেই চোখে পড়ে মাইল দশেক দূরের উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়া, খুব কাছে মনে হয় চূড়াটাকে, মনে হয় হেঁটে গেলে মিনিট পাঁচেকের পথ। রানা আন্দাজ করল ওটা অ্যাডমস্ পিক্ হবে। প্রথম মানব আদমের পবিত্র পায়ের ছাপ রয়েছে ওই চূড়ার উপর পাথরের গায়ে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, সবারই ওটা একটা তীর্থস্থান। পাহাড়ের গায়ে সবুজ হয়ে আছে অনেকখানি জায়গা—চায়ের বাগান।

বিকেলের দিকে বালিশে হেলান দিয়ে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল রানা, ঘরে ঢুকল বিজয়শেখর।

'হ্যালো, কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করল সে রানাকে।

'আমাকে এই ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা প্রথমেই।

'কেন? পছন্দ হচ্ছে না ঘরটা? এর ভাড়া কত জানেন?' একটা চেয়ারে বসে পড়ল বিজয়শেখর। সহানুভূতিশীল হাসি ফুটিয়ে তুলল সে দুই ঠোঁটে।

'বুঝলাম অনেক টাকা। কিন্তু জেনারেল ওয়ার্ড থেকে সরিয়ে এখানে আনা হয়েছে কেন আমাকে?'

'পুলিসের আনাগোনা বোধহয় পছন্দ করছে না ডাক্তার, হয়তো মনে করেছে অন্যান্য পেশেন্টদের সামনে পুলিসের লোক আপনাকে জেরা করলে আপনার অস্বস্তি লাগবে, তাই হয়তো এই ব্যবস্থা।'

রানা ভাবল, সত্যিই তো। এ-ও হতে পারে। একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'এই কথাটা আমি ভাবিনি। আমি মনে করেছিলাম আমার মাথা খারাপের লক্ষণ দেখে আলাদা করে রাখা হয়েছে বুঝি। এর পরে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

সিগারেট বের করল বিজয়শেখর।

'খাবেন একটা? টের পেলে অবশ্যি খুন করবে আমাকে ডাক্তার। কিন্তু দেখে এলাম নিচে রোগী দেখছে, আসবে না ওপরে, খাবেন?'

হাসল রানা। এ যেন স্কুল পালিয়ে গুরুজনদের লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া। বলল, 'আরও আগে আসা উচিত ছিল আপনার। এই ক'দিন প্রতিটা মুহূর্ত অপেক্ষা করেছি আমি আপনার জন্যে।'

'খুব ব্যস্ত ছিলাম।' সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে চেয়ে রইল বিজয়শেখর কিছুক্ষণ। তারপর সোজা চাইল রানার চোখের দিকে। 'আপনার জন্যে ছোট্ট একটা দুঃসংবাদ আছে। সহ্য করতে পারবেন?'

'বোধহয় পারব। কি দুঃসংবাদ?'

'গাড়িটা সত্যিই কালো ক্যাডিলাক নয়, ওটা সাদা রঙের একটা বুইক, আপনাকে পাওয়া গিয়েছিল ড্রাইভিং সীটে, মেয়েটি ছিল পিছনের সীটে, তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি, অন্য কোন গাড়িও ছিল না আশপাশে, একটা

প্রকাণ্ড শিরীষ গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল বুইকটা। আমি নিজে গিয়ে ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে এসেছি। সমস্ত ফটোগ্রাফ দেখেছি ঘেঁটে। বুইকটাও দেখলাম। যে সার্জেন্ট মোটর সাইকেলে করে প্রথম পৌঁছেছিল তার সঙ্গেও আমি নিজে কথা বলেছি।'

আবার সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। কিন্তু এবার সত্যিই ভয় পেল রানা। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে আই-বি ইন্সপেক্টর বিজয়শেখরের চোখের দিকে। একটি কথাও বেরোল না ওর মুখ থেকে।

'অত ঘাবড়াবার কিছুই নেই,' আশ্বাস দিল বিজয়শেখর। 'যা বললাম, এটা হচ্ছে ঘটনার সত্য বিবরণ। এখন দেখা যাক, আমরা দু'জন মিলে চেষ্টা করে একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার দাঁড় করাতে পারি কিনা।'

বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করল রানার। কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছে সে। বুঝতে পারছে, মিথ্যে কথা বলছে না বিজয়শেখর, অথচ যেটা সত্য নয় সেটা বিশ্বাস করবে সে কি করে?

কোমল কণ্ঠে আরম্ভ করল বিজয়শেখর আবার। 'আপনি বলছেন ২২ মার্চ ঘটেছিল অ্যাক্সিডেন্ট। অথচ আসলে ঘটেছে এটা ১৩ মে। সার্জেন্টের নোটবইও দেখেছি আমি। হসপিটাল রেকর্ডও তাই বলছে। এখন বলুন এ থেকে আপনার কি মনে হয়?'

'কিছুই মনে হয় না। বুঝতেই পারছি না ব্যাপারটা। আমি শুধু জানি ২২ মার্চ ফাইট ছিল হাম্বানটোটার সাথে। সেই রাতেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এক বিন্দু মিছে কথা বলছি না আমি।'

'আপনার তাই মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনাকে কোনরকম সন্দেহ করছি না আমি। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ঘটেছে অন্যভাবে। আপনাকে বলেছি, এই কয়দিন ব্যস্ত ছিলাম। ঠিকই ব্যস্ত ছিলাম। আমার মনে হচ্ছে হারানো সূত্রটা পেয়েছি আমি। মূল ব্যাপারটার রহস্য এখন আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার। ডাক্তারের সঙ্গেও কথা বলেছি আমি এই ব্যাপারে। তার ধারণা, ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমি। আপনার পক্ষে আমার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কষ্টকর হতে পারে, কিন্তু তবু আপনাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলা দরকার। ডাক্তার বলেছে আপনার স্মৃতি ফিরে আসতে কয়েক সপ্তাহ দেরি হতে পারে। ব্রেন ইনজুরি হয়েছে আপনার, যতদিনে না আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যায় ততদিনে অনেক আবোল-তাবোল চিন্তা আসতে পারে আপনার মাথায়। এর জন্যে ভাবনার কিছু নেই। এখন শুনুন,' সামনের দিকে ঝুঁকে এগিয়ে এল বিজয়শেখর কথাটার গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে, 'এবার আমি যা বলছি সেটা গ্রহণ করবার চেষ্টা করে দেখুন। মনটা রিসেপটিভ করে নিন। তার ফলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।'

'বলুন না, গ্রহণযোগ্য হলে নিশ্চয়ই গ্রহণ করব,' বলল রানা।

'২২ মার্চ সত্যিই একটা মোটর দুর্ঘটনা ঘটেছিল কাণ্ডি থেকে বারো মাইল দূরে। হাইস্পীডে দু'দিক থেকে দুটো গাড়িতে ধাক্কা লেগে দুটোই উল্টে গিয়েছিল। এর মধ্যে একটা গাড়ি ছিল কালো রঙের ক্যাডিলাক। পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল

গাড়িটা। এর ড্রাইভার ছিল ঢাকার একজন স্পাই, মাসুদ রানা। মারা গিয়েছিল সে।'

আছড়ে-পাছড়ে সোজা হয়ে উঠে বসল রানা। হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে বাইরে। কপালের একটা শিরা ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

'মাথা খারাপ আপনার?' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমি রানা, মাসুদ রানা! আমিই সেই স্পাই। কি চাইছেন আপনারা? পাগল করে ছাড়বেন আমাকে সবাই মিলে?'

কাঁধে দুটো মৃদু চাপড় দিয়ে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করল বিজয়শেখর রানাকে। মাথার উপর পাখাটা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ধীরে, বন্ধু ধীরে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমার ব্যাখ্যাটা শুনুন আগে। আমরা দু'জন মিলে চেষ্টা করলে সুমীমাংসা হয়ে যাবে ব্যাপারটার। অত উত্তেজিত না হয়ে আমাকে বলবার সুযোগ দিন আগে, তারপর শোনা যাবে আপনার বক্তব্য।'

আবার বালিশে হেলান দিল রানা। বুঝল, কারও কাছ থেকেই সাহায্য পাওয়া যাবে না। দরদর ধারায় ঘাম ছুটতে লাগল ওর সর্বাঙ্গে।

'অ্যাক্সিডেন্টের খবর সব কাগজেই উঠেছিল। এ-নিয়ে বেশ হৈ-চৈও হয়েছিল। প্রত্যেকটা খুঁটি-নাটি খবর ছাপা হয়েছিল সিংহলের সমস্ত পত্রিকায়। সেই খবরও একটু পরই দেখাব আমি আপনাকে। আমার যতদূর বিশ্বাস, এই খবর আপনি পড়েছিলেন কোনও কাগজে। আপনার মনের মধ্যে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল এই ঘটনাটা। ঠিক বাহান্ন দিন পর আপনি নিজেই অ্যাক্সিডেন্ট করলেন। ব্রেন ইনজুরি হলো আপনার ভয়ানক শক পেয়ে। নিজের অজান্তেই অজ্ঞান অবস্থায় নিজেকে আপনি মাসুদ রানা বলে ভাবতে আরম্ভ করলেন। যখন জ্ঞান ফিরল তখন আপনি স্থির নিশ্চিত যে আপনিই মাসুদ রানা। আপনি স্থির নিশ্চিত যে ২২ মার্চ আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এবার? কয়েক সপ্তাহ হয়তো লাগবে এই ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে, কিন্তু দেখবেন ঠিক কেটে যাবে। ডাক্তারের ধারণা এটা—সে নিশ্চয়ই না জেনে বলছে না। আপনার দরকার নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, ব্যস আর কিচ্ছু না। এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, ঠিক যেভাবে এসেছে সেই ভাবেই দূর হয়ে যাবে এই মতিভ্রম, তবে একটা জিনিস এখন থেকেই ভাবতে আরম্ভ করুন—আপনি মাসুদ রানা নন। ২২ মার্চ আপনি কোন অ্যাক্সিডেন্টে পড়েননি। আপনি স্পাই নন। আপনি হাম্বানটোটার সঙ্গে ফাইট করেননি। এইটুকু যদি মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে পারেন তাহলেই অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

সব সমস্যা সমাধান করে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল বিজয়শেখর। অনেক বুদ্ধি খরচ করে ব্যাখ্যা তৈরি করেছে সে। হাসিতে যোগ দিল না রানা। দুই চোখের তীব্র দৃষ্টি হেনে ভস্ম করে দেবার চেষ্টা করল বিজয়শেখরকে। কিন্তু দিব্যি আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ফুঁকতে থাকল হালকা-পাতলা দুর্বল লোকটা।

'আপনি আমাদের এমব্যাসীতে গিয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা দাঁতে দাঁত চেপে।

'হ্যাঁ। আপনার কথা শুনে ওরা তো হেসেই খুন।'

'অল্পদিনেই হাসি মুছে যাবে ওদের মুখ থেকে। আমার শেষ কথা বলে দিই আপনাকে। আমার নাম মাসুদ রানা। থিরু বলে একজন লোক আছে...'

'কাণ্ডির হোটেলওয়ালা তো? থিরু গনসম্পন্দমুথিউনাইনার পিল্লাই। ওর সঙ্গেও কথা বলে দেখেছি আমি। ওর স্ত্রী লীলার সঙ্গেও দেখা করেছি। এদের নামও পেপারে উঠেছিল। এরাই মাসুদ রানার মৃতদেহটা সনাক্ত করেছিল। এদের নাম কাগজে দেখেছেন, তাই কল্পনা করে নিয়েছেন এদের চেনেন আপনি।'

বিজয়শেখরের একটা হাত চেপে ধরল রানা।

'কার মৃতদেহ সনাক্ত করেছিল এরা?' উত্তেজনায় ফ্যাঁসফ্যাঁস করছে রানার কণ্ঠস্বর।

'মাসুদ রানার। এই কাগজটা পড়লেই বুঝতে পারবেন। আমি যা যা বললাম, সব লেখা আছে এতে।'

পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে দিল রানাকে বিজয়শেখর। প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বিছানার উপর বিছিয়ে ফেলল সেটা রানা। ঠিকই, সব কথাই লেখা আছে পত্রিকায়। একটিও মিথ্যে কথা বলেনি বিজয়শেখর। শুধু দুটো কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেনি বলেই উল্লেখ করেনি। পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী রানা ক্যাডিলাকটা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল, এবং গাড়ির মালিক গাড়িটা দাবি করতে আসেনি।

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। অসম্ভব দুর্বল লাগছে শরীরটা। মাথা ঘুরছে। সে কি তাহলে আসলেই অন্য লোক? রানা নয়? মৃত একটা লোকের পরিচয় নিয়ে বেঁচে আছে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক লোক?

'ক্যাডিলাকের মালিককে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছি আমি,' বলল বিজয়শেখর। 'কিন্তু দেখা গেল লাইসেন্স প্লেটগুলো ফোনি, নকল। ওই নাম্বারে কোনও ক্যাডিলাক রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। অবশ্যি বুইকটার মালিককে ট্রেস করে পাওয়া গেছে।'

'কে ওটার মালিক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনি। আপনার নাম আসলে নটরাজ হিক্কা। ঠিকানা: ৩২৫ বি, পর্তুগীজ অ্যাভিনিউ, গল!'

'বাজে কথা বলছেন আপনি,' বলল রানা দুর্বল কণ্ঠে।

'ক'দিনের মধ্যেই বুঝতে পারবেন আমি বাজে কথা বলছি, না সত্যি বলছি। আপনাকে সনাক্ত করা হয়েছে।'

'কে? কে আমাকে সনাক্ত করল?'

'আপনার আপন বড় ভাই। সেইজন্যেই আপনাকে এই প্রাইভেট কেবিনে নিয়ে আসা হয়েছে। সমস্ত খরচা তো সে-ই দিচ্ছে।'

'আমার আপন বড় ভাই? আমার বড় ভাই আসবে কোত্থেকে? বাপ-মার একমাত্র সন্তান আমি। আর আমার নামও হিক্কা নয়। দেখুন মস্ত ভুল হয়েছে কোথাও আপনাদের।'

'ভুল হয়নি। কাল রাতে আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন আপনার ভাই এসে

দেখে গেছে। দেখেই সনাক্ত করেছে সে আপনাকে। গাড়ির রেজিস্ট্রেশনও মিলে গেছে। কাজেই...' একটু চিন্তা করে বলল, 'গুড, ওকে দেখলেই সব কথা মনে পড়ে যাবে হয়তো আপনার।'

'কাকে দেখলে?' আতঙ্কিত দৃষ্টি রানার চোখে।

'আপনার ভাইকে। বাইরে অপেক্ষা করছে সে। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি ওকে।'

দশ

ভূতের মত নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল লোকটা। বেঁটে এবং মোটা। চারকোনা ধরনের চেহারা। খশখশে অমসৃণ গায়ের চামড়া। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো রানা লোকটার চোখ দেখে। ঠিক সাপের মত পলকহীন চকচকে দৃষ্টি দু'চোখে—যেন মরণের ওপার থেকে চেয়ে আছে। এই লোকের দশহাতের মধ্যে গেলে অশরীরী একটা অনুভূতি শির শির করতে থাকে শিরদাঁড়ার ভিতর। পুরু লালচে দুই ঠোঁটে একটুকরো অর্থহীন সার্বক্ষণিক হাসি লেগে আছে। ডান কানে ফুটো, ছোট্ট একটা তামার রিং ঝুলছে সেখানে। হাতে ঝাউপাতা আর রডোডেনড্রন দিয়ে সাজানো সুন্দর একটা ফুলের তোড়া। ছোট ভাইয়ের জন্যে এনেছে।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো রানা—জীবনে কখনও একে দেখেনি সে আগে। এই চেহারা একবার দেখলে আর ভুলবার নয়। আরও বুঝল, লোকটা করতে পারে না এমন কাজ নেই। অত্যন্ত দামী পোশাক-পরিচ্ছদ ওর ভিতরের চেহারাটা ঢাকতে পারেনি।

এগিয়ে এল লোকটা, একটু শব্দ হলো না মেঝেতে। পিছন পিছন এল বিজয়শেখর। প্রশান্ত সৌম্য হাসি ছড়িয়ে আছে ওর সারা মুখে।

'কেমন আছ, নটরাজ?' বলল বড় ভাই। ভারি অথচ কোমল কণ্ঠস্বর। 'দেখো তো, কি রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে সবাইকে। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি আমি এই কয়েকটা দিন। এখন কেমন বোধ করছ, ভাল?'

দুঃস্বপ্ন দেখছে নাকি রানা? গায়ে চিমটি কাটলে তো ঠিকই মালুম পাচ্ছে—তবে এসব কি দেখছে সে!

'তোমাকে চিনি না আমি। বেরিয়ে যাও এখান থেকে,' বলল রানা অস্পষ্ট কণ্ঠে।

'আহা, একটু শান্ত থাকার চেষ্টা করুন, মিস্টার হিক্কা,' বলল বিজয়শেখর। 'সেরে উঠতে চান আপনি, এঁকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে দেখুন না। হয়তো চিকিৎসার কাজ হবে।'

'আমি চিনি না এই লোকটাকে। জীবনে দেখিনি কখনও।'

ফুলের তোড়াটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল স্নেহপরায়ণ বড় ভাই। বিজয়শেখরের দিকে চেয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত করল। মুচকি হাসল বিজয়শেখর।

'মস্ত একটা ফাঁড়া কাটল তোমার, নটরাজ। উফ্! যাক, কোনও চিন্তা কোরো না। এখানে যদি না সারে তাহলে সুইটজারল্যাণ্ডে নিয়ে যাব আমি তোমাকে। মাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি যেন কোন ভাবনা-চিন্তা না করে। ভেবেছিলাম আজই সকালে জাফনা গিয়ে মাকে নিয়ে আসব, কিন্তু ডাক্তার বললেন তোমার সাথে আমার কথা বলা দরকার। নিকট আত্মীয়ের সাথে কথা বললে হঠাৎ হয়তো হারানো সূত্রটা পেয়ে যেতে পারো।'

'গেট আউট। তোমার সাথে কোন কথা বলতে চাই না আমি,' বলল রানা উত্তেজিত কণ্ঠে। এই গোক্ষুর সাপটাকে ঘর থেকে বের করতে না পারলে স্বস্তি পাচ্ছে না সে। এর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে ভয়ানক ক্ষতি হবে, বুঝতে পার-হু পরিষ্কার।

'তোমাকে সেরে উঠতেই হবে নটরাজ। সবিতার কথা ভাব একবার। ওকে নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি? কি দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে বেচারী একটু চিন্তা করে দেখো। এখানে আসবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল সে, অনেক কষ্টে বুঝিয়ে রেখে এসেছি।'

এ আবার কি? মেয়েছেলেও আছে নাকি আবার এর মধ্যে!

'কি বলছ বুঝতে পারছি না আমি। বুঝবার দরকারও নেই। এবার তুমি যেতে পারো।'

'বলো কি, সবিতাকে মনে পড়ছে না তোমার? বিয়ের কথাবার্তা সব ঠিকঠাক, এখন চিনতে না পারলে চলবে কি করে?' বিজয়শেখরের দিকে চাইল বড় ভাই নিরাশ ভঙ্গিতে। বলল, 'অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার কাছে। আচ্ছা, আমি বরং ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব আগামীকাল। দেখা করতে চাও ওর সঙ্গে, নটরাজ?'

হিমেল একটা বাতাস যেন বয়ে গেল রানার মনের মধ্যে। কি যেন মনে আসতে চাইছে, কিন্তু আসছে না। মনে হচ্ছে চারদিকে রংবেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে, স্বপ্নের ওপার থেকে একটা মিষ্টি মেয়ের সুরেলা কণ্ঠ ভেসে আসছে কানে—রানা! রানা!

'আপনারা গল্প করুন, আমি চলি এখন, কাজ আছে,' বলল বিজয়শেখর। আশ্বাস দিল রানাকে, 'কোনও ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। যা সত্য, সেটাকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করুন।'

রানা বারণ করতে চাইল ওকে। বলতে চাইল এই বিষাক্ত বিভীষিকাটা ওর সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না সে। চিন্তিত মুখে বেরিয়ে গেল বিজয়শেখর।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। দুই পা এগিয়ে এল মোটা লোকটা। লালচে হাসিটা ঠোঁটে লেগে রয়েছে তেমনি। সাপের চোখের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে দুটো চোখ রানার চোখের দিকে।

'তুমিও দূর হয়ে যাও, এখান থেকে,' বলল রানা অতিকষ্টে।

আরও এক পা এগিয়ে এল লোকটা। যেন গোপন কিছু পরামর্শ দিচ্ছে এমনিভাবে বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনের দরজার দিকে দেখাল। চাপা কণ্ঠে বলল,

'এই লোকটার কাছ থেকে সাবধান থেকো, নটরাজ। তোমার মনে হচ্ছে লোকটা তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে খেপে উঠেছে, তাই না? আসলে কি জানো? এই রকম হারামী অফিসার আই.বি. ডিপার্টমেন্টে আর দ্বিতীয়টি নেই। তোমার বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করছে সে এখন, একআধটা কথা মুখ থেকে ফসকে গেলেই খুনের দায়ে গ্রেফতার করে বসবে। খুব সাবধান! বাইরে পুলিস পাহারা বসিয়ে রেখেছে, তা জানো?'

গ্রহণ-ক্ষমতা ফুরিয়ে গেছে রানার। আর কিছুই ঢুকতে চাইছে না ওর মাথায়। নির্বাক পড়ে রইল সে বিছানায় চিৎ হয়ে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসল লোকটা দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে। ধাড়ি একটা কচ্ছপের মত লাগছে ওকে দেখতে।

'সবটা ব্যাপার আমি চেপে রেখেছি—নইলে এতক্ষণে জেলে ভরে দেয়া হত তোমাকে,' বলল বড় ভাই। 'ওই ব্যাটা খুনের মোটিভটা বুঝে উঠতে পারছে না বলেই এখন পর্যন্ত চার্জ আনতে পারছে না। আমি বলে দিতে পারতাম, কিন্তু বলিনি। মুখ বন্ধ করে রেখেছি আমি এখনও। তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই আমি।'

'বেরোও! কোনও কথা শুনতে চাই না আমি। এক্ষুণি নার্সকে ডাকব যদি বেরিয়ে না যাও।'

কর্ণপাত করল না লোকটা এই কথায়। বলেই চলল নিজের কথা।

'মেয়েটা কে তা এখনও টের পায়নি ওরা। সনাক্ত করা যায়নি। আমি যদি বলে দিই তাহলেই তোমার সব আশা-ভরসা শেষ। এখনও ভেবে দেখো। পালাবার কোন রাস্তা নেই তোমার। আমার কথায় যদি রাজি হও...'

'তোমার একটি কথাও বুঝতে পারছি না আমি। তোমাকে জীবনে দেখিনি আমি, অথচ তুমি আমার ভাই বলে পরিচয় দেবার চেষ্টা করছ। আমার ভাই নেই।'

হেঃ হেঃ করে হাসল মোটা লোকটা।

'সে আমি জানি। আমি যে তোমার ভাই নই একথা কি আর আমাকে বলে দিতে হবে? কিন্তু আমি যদি এখন সেই কথা বলতে যাই তাহলেই তিনটে খুনের দায় চাপবে তোমার কাঁধে। সেটাই কি ভাল হবে? একটা খুনই কি যথেষ্ট নয়?'

অনেক কষ্টে নিজেকে স্থির রাখল রানা। এই দুর্বল শরীরে রীতিমত কষ্ট হলো ওর নিজেকে সামলে নিতে।

'দেখো, আমাকে আর কেউ ভেবে মস্ত ভুল হচ্ছে তোমাদের। কার বদলে সবাই মিলে আমাকে এমন বিরক্ত করছ জানি না। তোমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, আমার নাম মাসুদ রানা, আমি নটরাজ হিক্কা নই, তোমার ভাইও নই। এবার দয়া করে যাও এখান থেকে।'

'আমি জানি তুমি মাসুদ রানা। এ-ও জানি তুমিই খুন করেছ রত্নসূর্য কুমারস্বামী আর হুলুগালকে। মেয়েটাকেও খুন করেছ তুমি। পিস্তল না পেলে ওরা এটাকে অ্যাক্সিডেন্ট মনে করত। কিন্তু গাড়ির মধ্যেই পাওয়া গেছে পিস্তলটা। পিস্তলের সর্বত্র ওর হাতের ছাপ ছিল। তুমিই যে সেই মাসুদ রানা তাতে আমার কোনই

সন্দেহ নেই।'

'তুমি জানো যে আমি মাসুদ রানা?' এতক্ষণে সত্যিই তাজ্জব হলো রানা। 'তাহলে মিছেমিছি আমাকে নটরাজ হিক্কা বানাবার চেষ্টা করছ কেন?'

'ভণ্ডামি ছাড়ো, মাসুদ রানা। আমিও জানি, তুমিও জানো যে আমার নাম নটরাজ হিক্কা—তোমারই জন্যে আজ নাগরাজ হিক্কা হিসেবে নিজেকে চালাতে হচ্ছে আমার। তবে যতক্ষণ বিজয়শেখর তোমাকে নটরাজ হিসেবে জানছে ততক্ষণই তোমার বাঁচোয়া—যেই জানবে তুমি নটরাজ নও, অমনি, বারোটা বেজে যাবে তোমার।'

দুই হাতে কপালের দুই ধার টিপে ধরল রানা। মাথাটা সত্যিই কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওর? একেকজন একেক রকম উল্টোপাল্টা কথা বলছে কেন?

'এবার কাজের কথায় আসা যাক।' ঠোঁটের হাসিটা মিলিয়ে গেল নটরাজ বা নাগরাজ হিক্কার। 'পাগলামি-ছাগলামি ছাড়ো। আমার কথামত কাজ করলে বিজয়শেখরের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেব আমি তোমাকে।' কচ্ছপের মত মাথাটা সামনের দিকে বাড়াল হিক্কা। 'টাকাগুলো কোথায় লুকিয়েছ?'

হাঁ হয়ে গেল রানার মুখ। রানার ভাব বুঝতে পেরে ভয়ঙ্কর একটুকরো হাসি ফুটে উঠল হিক্কার ঠোঁটে। চোখের দৃষ্টিটা তেমনি লেহন করছে রানাকে।

'বলবে না? ভেবে দেখো ভাল করে; ফাঁদে পড়ে গেছ তুমি, আমাকে ছাড়া উদ্ধারের কোন পথ নেই তোমার। যদি না বলো, ইন্সপেক্টর বিজয়তুঙ্গ সেনানায়েককে লেলিয়ে দেব আমি। সব কথা জানতে পাবে বিজয়শেখর। টাকাগুলো কোথায় রেখেছ বলে দাও, ব্যস, বাতাসের মত মুক্ত স্বাধীন হয়ে যাবে তুমি। কি বলো?'

'তোমার একটি কথাও বুঝতে পারছি না আমি।'

'ভোগলামী ছাড়ো, রানা, মাথাটা একটু খাটাও। এত টাকা নিয়ে পালিয়ে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না। কোনও মতেই না। তারচেয়ে আমার সাথে চুক্তিতে চলে এসো। পঞ্চাশ হাজার তোমার। ক্লিন টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট। তার ওপর বিজয়শেখরকে আমি ম্যানিজ করব। ভদ্রলোকের এক কথা। রাজি?'

'যদি মনে করো বিজয়শেখর আমাকে খুনের দায়ে ফাঁসাতে চাচ্ছে, ফাঁসাক না। তোমার তাতে কি। তুমি তোমার ওই কুৎসিত মাথাটা অন্যখানে গিয়ে ঘামাও। টাকা-পয়সার ব্যাপার কিছুই জানি না আমি।'

'আহা, চটে যাচ্ছ কেন?' মোটা আঙুল দিয়ে টপাটপ তবলা বাজাল হিক্কা হাঁটুর ওপর। 'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না, এই তো? মনে করছ সব টাকা আমিই নিয়ে নেব। আসলে নেব না। আমি খারাপ লোক হতে পারি, কিন্তু আমারও একটা নীতিবোধ আছে। পঞ্চাশ হাজার তুমি ঠিকই পাবে। এখন বলো। কোথায় রেখেছ টাকাগুলো?'

'আমি জানি না। যদি জানতাম, তাও তোমাকে বলতাম না। নাউ গেট লস্ট!'

লাল হয়ে উঠল হিক্কার ভয়ঙ্কর মুখটা। পৈশাচিক ক্রূরতা ফুটে উঠেছে সারা

মুখে।

'অতি বুদ্ধিমান মনে করেছ তুমি নিজেকে, মাসুদ রানা। ভেবেছ স্মৃতিভ্রংশের অভিনয় করে বেঁচে যাবে। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না তুমি, রানা। শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে—বলো কোথায় লুকিয়েছ টাকাগুলো?'

'গেট আউট।'

সামলে নিল হিক্কা। অর্থহীন লালচে হাসিটা ফিরে এল ওর ঠোঁটে। উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে।

'ঠিক আছে। যেমন তোমার অভিরুচি। বিজয়শেখরের কাছে চললাম আমি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাজতে চালান হয়ে যাবে তুমি। ভাবছ, ধানাইপানাই করে একটা খুনের দায় থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে, কিন্তু তিনটে খুনের দায় থেকে কি করে ছাড়া পাও তুমি দেখতে চাই আমি।'

'যাও, দেখো গিয়ে।'

নিঃশব্দ পায়ে দরজা পর্যন্ত চলে গেল হিক্কা। তারপর থেমে দাঁড়াল।

'এখনও ইচ্ছে করলে মত পরিবর্তন করতে পারো।'

'গেট আউট!'

নিঃশব্দে চলে গেল হিক্কা যে পথে এসেছিল সেই পথে।

এগারো

পালানো দরকার।

আগাগোড়া সবটা ব্যাপার চিন্তা করল রানা পনেরো মিনিট, তারপর স্থির করল, পালাবে সে। এছাড়া বাঁচার আর কোন উপায় নেই। জটিল কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে সে। হয় ওকে অন্য লোক ভেবে ভুল করছে ওরা, নয়তো সাজানো-গোছানো জটিল কোনও প্লটের মধ্যে খুনী হিসেবে দাঁড় করাতে চায়। যাই হোক, পালানো ছাড়া গত্যন্তর নেই ওর। বিজয়শেখর আর হিক্কা দু'জনের কাছ থেকেই দূরে থাকতে হবে ওকে। যদি সম্ভব হয় নিজেই এই জটিল সমস্যার সমাধান করবে, নইলে সোজা কেটে পড়বে সিংহল থেকে। খুনের দায় চাপাবার জন্যে পাগল হয়ে আছে পুলিস, কাজেই পুলিসের কাছে গিয়ে লাভ নেই। এমব্যাসীতে গেলে ওরাই হয়তো আবার পুলিসের হাতে তুলে দেবে ওকে। কাজেই সেখানেও যাওয়া চলবে না। সবাই জানে মাসুদ রানা মারা গেছে। 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই'-এর পুনরাবৃত্তি করতে চায় না রানা আর। সোজা ঢাকায় গিয়ে হেড অফিসে উপস্থিত হয়ে প্রমাণ করবে সে যে মরেনি।

কিন্তু পালাবে কি করে? এই দুর্বল শরীর নিয়ে এত লোকের সামনে দিয়ে গায়েব হয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব, তার উপর আবার পুলিস রয়েছে পাহারায়।

বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়াল রানা। হাঁটুর কাছে দুর্বল লাগল, কিন্তু যতটা দুর্বলতা বোধ করবে ভেবেছিল, ততটা লাগল না। কবাট দুটো সামান্য ফাঁক করে

বাইরের দিকে চাইল সে। একটা করিডর। রানার মুখোমুখি আরও দুটো কেবিনের দরজাও চোখে পড়ল। ডানদিকে বিশ ফুট আন্দাজ গিয়ে দেয়ালে ঠেকেছে করিডরটা, বাম ধারে পঁচিশ-ত্রিশ ফুট গেলেই নিচে নামার লিফট এবং সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখেই বিড়ি খাচ্ছে দু'জন সেপাই টুলে বসে। পালাবে কি করে সে?

একজন নার্সকে এদিকে আসতে দেখেই বিছানায় ফিরে গেল রানা। ঘরে ঢুকে রানার কিছু প্রয়োজন আছে কিনা, কোনও রকম শারীরিক অসুবিধা আছে কিনা জিজ্ঞেস করে চলে গেল নার্স। যাবার সময় হিক্কার আনা ফুলের তোড়াটা উপহার দিয়ে খুশি করে দিল রানা ওকে। জামা-কাপড়গুলো কোথায় আছে জেনে নিল বিনিময়ে। ঠিক আটটার সময় খাবার আসবে, এখন বাজে সাড়ে সাতটা। এই আধঘণ্টার মধ্যেই যা করবার করতে হবে ওকে।

নার্স চলে যেতেই ক্লসিটের কপাট খুলে ফেলল রানা। চকোলেট রঙের টেট্রন স্যুটটা আশা করেছিল রানা, একটু অবাক হলো সম্পূর্ণ অন্য কাপড়-চোপড় দেখে। একটা নীল ট্রপিক্যাল স্যুট ঝুলানো রয়েছে হ্যাঙ্গারে। আর রয়েছে সিল্কের শার্ট, লাল সিল্কের টাই। কিন্তু জুতো জোড়াটা ওর নিজের। সম্পূর্ণ অপরিচিত কাপড়-চোপড়ের মধ্যে জুতো জোড়াটাকে বড় আপন মনে হলো ওর। ওটাই সবচেয়ে আগে পরল। জুতোর মধ্যে গোঁজা মোজাগুলো আবার অন্যের। নিজের কাপড় যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন অগত্যা এগুলোই পরতে হবে।

জামা-কাপড় পরতে গিয়ে আরও অবাক হলো রানা। প্রত্যেকটা কাপড় ঠিক ঠিক ফিট্ করল ওর গায়ে—যেন ওরই জন্যে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু অবাক হওয়ার চেয়ে এখন উদ্বেগই অনুভব করছে সে বেশি। দশ মিনিট সময় পার হয়ে গেছে। কাঁটায় কাঁটায় বিশ মিনিট পর খাবার নিয়ে আসবে ওয়ার্ড বয়। পা টিপে দরজার পাশে চলে এল রানা।

সেপাই দু'জন গল্প করছে রানার দিকে মুখ করে বসে। এখন বেরোলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল রানা, ওদিক দিয়ে সুবিধে হবে না। বিছানায় বসে দ্রুত চিন্তা করে চলেছে রানা এমন সময় একটা মেয়ে এবং একটা পুরুষের গলার আওয়াজ পেল সে করিডরে। দরজার ফাঁকটা যতদূর সম্ভব সরু করে চোখ রাখল রানা বাইরে, আর ভিতর ভিতর তৈরি থাকল একলাফে বিছানায় গিয়ে ওঠার জন্যে।

ঠিক রানার সামনের ঘরটায় একটা চাকা লাগানো ট্রলি ঠেলাঠেলি করছে এক নার্স আর এক সাদা কোট পরা ছোকরা।

ঘড়ির দিকে চাইল রানা। পৌনে আট। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। আর পনেরো মিনিট পর আসবে খাবার। এখান থেকে বেরোতে হলে তার আগেই একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন।

'বুড়িকে আমিই নিচে নিয়ে যাব,' বলল ছোকরা। 'ডাক্তারের কাছ থেকে মর্গ সার্টিফিকেটটা নেয়া হয়নি।'

'ঠিক আছে, যা নেবার নিয়ে নাও, তোমার মড়া নিয়ে তুমি মর গে যাও—আমার

ডিউটি শেষ। আমি চললাম।'

হাঁটতে আরম্ভ করল নার্সটা, ছোকরা চলল পিছন পিছন।

'সব সময় এত তিরিক্ষি মেজাজে থাকো কেন তুমি?' জিজ্ঞেস করল ছোকরা।

উত্তরটা শোনা গেল না। দরজাটা আরেকটু ফাঁক করে চোখ রাখল রানা ওদের উপর। সেপাই দু'জন পথ করে দিল, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল ওরা।

কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগল রানা, তারপর খুলে ফেলল দরজা। সেপাই দু'জনের সমস্ত মনোযোগ এখন নার্সটির দিকে। রানার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে ওরা। একলাফে করিডরের ওপারে চলে গেল রানা। হ্যাণ্ডেল ঘুরাতেই খুলে গেল দরজা। ঢুকে পড়ল সে ঘরের ভিতর।

চাকা লাগানো ট্রলির উপর আগাগোড়া সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে একটা মৃতদেহ। ছোকরার কথাতেই বুঝতে পেরেছে রানা, কোনও সদ্যমৃত বৃদ্ধার লাশ ওটা। কিন্তু ওটাকে এখন লুকানো যায় কোথায়? পাশেই একটা দরজা। দরজাটা নিঃশব্দে খুলে এক ইঞ্চি ফাঁক করে বুঝল রানা, বাথরুম ওটা। খারাপ লাগল রানার, কিন্তু উপায় কি? ট্রলি ঠেলে বাথরুমের ভিতর নিয়ে এল সে। শীট তুলে নামিয়ে দিল লাশটা বাথরুমের এককোণে।

ট্রলিটা ঠেলে যথাস্থানে নিয়ে এল রানা। হাঁপাচ্ছে সে এটুকু পরিশ্রমেই। ঘাম ছুটেছে কপাল বেয়ে। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বসে পড়ল সে খাটিয়ার উপর। বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ। আর সময় নষ্ট করা যায় না। যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে সাদা কোট পরা ছোকরা। ট্রলির উপর উঠে শুয়ে পড়ল সে, সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে নিল আপাদমস্তক।

চুপচাপ অপেক্ষা করছে রানা। উত্তেজনা এবং দুর্বলতা মিলে অবশ হয়ে আসছে শরীর, ঘুম আসছে চোখ ভেঙে। কিন্তু এখন ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। পাঁচ মিনিটেই ওর মনে হলো হাজার বছর ধরে শুয়ে আছে সে এই চাদরের তলায়। বাজে কয়টা এখন? খাবার নিয়ে ওয়ার্ডবয় এসে পড়লেই হৈচৈ পড়ে যাবে হাসপাতালময়, অসম্ভব হয়ে পড়বে পালানো। আচ্ছা, সাদা কোট পরা ছোকরা চাদর তুলে দেখবে নাকি? তাহলে তো সর্বনাশ!

ট্রলি ছেড়ে উঠে বাথরুমে লুকাবার কথা ভাবছে রানা, এমনি সময়ে খুলে গেল দরজাটা। পাথরের মত জমে গেল রানা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখেছে সে, কিন্তু হার্টবিটগুলোকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, ঢিব ঢিব করছে বুকের ভিতরটা। চলতে আরম্ভ করল ট্রলি। শিস দিচ্ছে ছোকরা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে—মড়া নিয়ে চলেছে, কিন্তু একফোঁটা বিকার নেই।

সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই একটা কর্কশ কণ্ঠ কানে এল রানার।

'কি আছে এর ভেতরে? জিজ্ঞেস করল একজন সিপাই।

'মড়া,' উত্তর দিল ছোকরা।

'সারাতে পারো না, তবে হাসপাতাল খুলেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল দ্বিতীয় সিপাই।

'এটা হাসপাতাল কে বলল? এটা তো আসলে বিজনেস সেন্টার। কাউকে

বোলো না, আসলে আমার মনে হয়েছে গোরস্থান আর শশ্মানঘাটের দালালদের কাছ থেকে কমিশন খায় আমাদের ডাক্তাররা। নইলে এত মরে কেন? আজ মরেছে মোট বারোজন।'

হাসল সিপাই দু'জন। একজন জিজ্ঞেস করল, 'কি মড়া এটা? মেয়ে না পুরুষ?'

'মেয়েও না পুরুষও না—বুড়ি।'

এবারও হাসল সিপাই দু'জন। হাসবার সুযোগ খুঁজছিল বোধহয়। আবার নড়ে উঠল ট্রলি। একটু ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল সেটা। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। নিচে নামতে আরম্ভ করতেই বুঝল রানা, এটা একটা এলিভেটর।

এলিভেটর থেমে দাঁড়াতেই খুলে গেল দরজা হিস হিস শব্দ তুলে। আবার চলতে আরম্ভ করল ট্রলি। একটা অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল।

'এই যে, দেওকি, আজ দেখি একটার পর একটা আনতেই আছ! এটা আবার কত নম্বরের?'

'সাঁয়ত্রিশ নম্বরের বুড়িটা। এতদিনে গেল। খুব জ্বালিয়েছে এই ক'দিন।'

'সাঁয়ত্রিশ মানে হিক্কার উল্টোদিকের ঘরটা না?'

'হ্যাঁ। দু-দুটো পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। নজরবন্দী হয়ে আছে শালা। কিন্তু জানে না এখনও। কাল সকালেই গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হবে হাজতে।'

'লোকটার মাথা বোধহয় আগে থেকেই খারাপ ছিল। নইলে খুন করতে গিয়ে নিজেই মারা যাবার দশা হবে কেন?'

'আরে দূর। মাথা খারাপের অভিনয় করছে শালা। বিজয়শেখরের কাছে খাটে ওসব চালাকি? ও কি যে-সে লোকের হাতে পড়েছে? আঁটি ভেঙে শাঁস খায় বিজয়শেখর সব জিনিসের।'

'যাক্, এটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে এসো; তোমার সঙ্গে গিয়ে সিপাই দুটোর সঙ্গে গল্প করে আসব। আরও কিছু জানা যেতে পারে।'

'যেতে চাও চলো, কিন্তু আমার চেয়ে বেশি খবর কি ওরা দিতে পারবে? অসম্ভব। আমি আসছি, দাঁড়াও তুমি এখানে।'

চলতে আরম্ভ করল ট্রলি। একটা সুইংডোর দিয়ে ঢুকিয়ে জোরে এক ঠেলা দিয়ে ছেড়ে দিল ছোকরা। ঘটাং করে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল ট্রলি। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

চারদিক নিস্তব্ধ। এক মিনিট পড়ে থাকল রানা চুপচাপ। তারপর ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলল সাদা কাপড়টা মাথার উপর থেকে। অন্ধকার ঘর। কিন্তু প্যাসেজ থেকে সামান্য আলো এসে পড়ায় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে সবকিছুই। উঠে বসল রানা। আরও আট-দশটা ট্রলি দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের গায়ে নাক ঠেকিয়ে। ব্লিচিং পাউডার ও ফরমালডিহাইডের কড়া গন্ধ নাকে আসছে। সেই সাথে হালকা একটা মাংস-পচা গন্ধ।

নেমে পড়ল রানা ট্রলি থেকে। প্যাসেজের উল্টোদিকে দেয়ালের গায়ে আরেকটা দরজা থাকা উচিত। আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে একেবারে বামদিকে একটা দরজা পেল রানা। হাতল ঘুরিয়ে দুই

ইঞ্চি ফাঁক করল সে দরজাটা। রেডক্রস চিহ্ন আঁকা দুটো অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে রানার দিকে মুখ করে। লোক নেই। বামধারে মেথরদের কোয়ার্টার। সরু একটা রাস্তা চলে গেছে ডান দিকে।

দরজাটা আরও ফাঁক করে মাথা বের করল রানা বাইরে। ডানধারে পঞ্চাশ গজ গেলেই মেইন গেট। খোলা। পিচ ঢালা চওড়া সড়ক দেখা যাচ্ছে। গার্ড নেই।

বেরিয়ে এল রানা মর্গ থেকে। ধীর পায়ে চলল গেটের দিকে। কোথায় যাবে, কি করবে কিচ্ছু জানা নেই। পকেট হাতড়ে দেখল, একটি পয়সাও নেই সাথে।

বারো

আধঘণ্টা ক্রমাগত হাঁটল রানা। অসংখ্য জুয়েলারীর দোকান রত্নপুরে। সাড়ে-আটটার পর বন্ধ হতে আরম্ভ করল এক-এক করে। রাস্তার ভিড়ও কমে আসছে ধীরে ধীরে। এইবার কেটে পড়তে হবে রত্নপুর থেকে। আর বেশিক্ষণ থাকলে ধরা পড়ে যাবে।

কাঁচি বা ব্লেড ছাড়াই আড়াইশো টাকা রোজগার হয়ে গেছে ওর ইতিমধ্যে। কাজেই নিশ্চিন্তে কলম্বো যাওয়া যায় এখন। মরিয়া হয়ে উঠলে মানুষ পারে না এমন কাজ নেই।

দুই ঘণ্টার পথ। ট্রেনে চেপে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে নিল রানা। লুকিয়ে থাকতে হবে ওকে কিছুদিন। হিক্কা বা বিজয়শেখর কারও হাতেই ধরা পড়লে চলবে না। রানার পলায়নের কথা জানতে পেরে এতক্ষণে চারদিকে খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে নিশ্চয়ই বেতারে। রানার চেহারার বর্ণনা দিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে সবাইকে। একমাত্র আশ্রয় এখন কলম্বোর কোন তৃতীয় শ্রেণীর হোটেল।

আর একটু অসতর্ক হলে কলম্বো রেল স্টেশনেই ধরা পড়ে যেত রানা। সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করছে কয়েকজন পুলিসের লোক। প্রায় নিরাপদে পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল সে স্টেশন থেকে। রাত সাড়ে-দশটা। আরও আধঘণ্টা হাঁটল সে ক্রমাগত।

জেটির কাছাকাছি সমুদ্রের ধারে একটা মনের মত হোটেল পেয়ে গেল রানা। মাঝারি হোটেল। অনেকটা খিরুর হোটেলের মত। সুইংডোর ঠেলে ঢুকল সে ভিতরে। লাউঞ্জে বিশেষ লোকজন নেই, কেমন একটা মলিন পরিবেশ। রিসেপশন ডেস্কের ওপাশে বসে আছে একজন অসম্ভব চিকন লম্বা প্রৌঢ় লোক। যেমন চিকন তেমনি লম্বা। খাড়া উঁচু নাক, চোখে শ্যেন দৃষ্টি। এগিয়ে গেল রানা ওর দিকে।

'ঘর খালি পাওয়া যাবে?'

'এ-ক্লাস না বি-ক্লাস?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'তার মানে?' অবাক হলো রানা।

'মানে আবার কি? কি রকম মেয়েমানুষ চাই? কেমন ঘর চাইছেন?'

'দেখুন, আমি ঠিক সেইজন্যে ঘর চাইছি না। এই হোটেলে থাকা খাওয়ার

ব্যবস্থা নেই?'

'ও, তাই বলুন, গেস্টরুম চাইছেন। হ্যাঁ, তা-ও আছে। মালপত্র কোথায় আপনার?'

'ওগুলো স্টেশনে রেখে এসেছি, ঘর পেলেই নিয়ে আসব।'

সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক পরীক্ষা করল লোকটা রানাকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'থাকবেন কয়দিন?'

'দুই-তিন দিন থাকব। পছন্দ হলে দিন দশেকও থেকে যেতে পারি।'

'একশো টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে। মালপত্র ছাড়া লোক আমরা রাখি না।'

পকেট থেকে একশো টাকা বের করে দিল রানা। টাকাগুলো দু'বার করে গুনে দেখে নিল লোকটা। তারপর দয়া করে সামান্য একটু হাসল ঠোঁট দুটো বন্ধ রেখেই। কী-বোর্ড থেকে একটা চাবি নামিয়ে দিল লোকটা রানার হাতে, একটা রেজিস্টার এবং বল পেন্সিল দিল এগিয়ে।

নাম লিখবার ঘরে লিখল রানা বিজয়তুঙ্গ সেনানায়েক। এই নামটাই মনে পড়ল হঠাৎ। রানার সামান্য ইতস্তত ভাব ম্যানেজারের শ্যেন দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু কিছুই বলল না সে। শুধু বুঝে রাখল, একটু সাবধান থাকতে হবে এর ব্যাপারে।

বেল টিপতেই মাঝবয়েসী একজন বাবরি চুল-ওয়ালা লোক ঢুকল ঘরে। মুখটা ছুঁচোর মত।

'লাগেজ নেই?' জিজ্ঞেস করল সে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে।

'না। ঘরটা দেখিয়ে দাও আমার।'

দোতলার উপর একটা ঘরে নিয়ে এল লোকটা রানাকে। লাইট জ্বেলে দিল। ছোট্ট একটা ঘর। একটা সিঙ্গেল খাট, একটা নড়বড়ে টেবিল আর একখানা চেয়ারেই ভরে গেছে সবটা, হাঁটা-চলার উপায় নেই।

'সামনের বারান্দা ধরে ডান দিকে গেলে শেষ মাথায় বাথরুম,' বলল ছুঁচো-মুখো লোকটা। চাবিটা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে আশান্বিত দৃষ্টিতে চাইল রানার মুখের দিকে।

দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিল রানা ওর দিকে। লোভাতুর দৃষ্টিতে নোটটার দিকে চেয়ে রইল লোকটা কয়েক সেকেণ্ড, রানার চোখের দিকে চাইল তারপর। যখন বুঝল ওটাই নিতে বলছে রানা ওকে, তখন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে গদগদ হয়ে গেল একেবারে।

'কিছু লাগবে আপনার, স্যার? কিছু লাগলেই জয়বর্ধন বলে হাঁক ছাড়বেন, স্যার।'

'লাগবে। রাতের খাওয়া লাগবে। ভাল কোনও হোটেল থেকে ডিনার নিয়ে এসো প্যাকেটে করে। আর একটা কথার পরিষ্কার উত্তর দাও: এই বিছানায় শোয়া যাবে, না ডি. ডি. টি লাগবে?'

'লাগবে, স্যার। মশারিও লাগবে। কোন চিন্তা করবেন না, দশ মিনিটে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' ডিনারের জন্যে টাকা নিয়ে চলে গেল সে।

খাওয়াদাওয়ার পর রানার আরও কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করল জয়বর্ধন,

রানা নিষেধ করায় অবাক হলো একটু। আর একটু বিশদ করে বলল।

'একা যদি খারাপ লাগে তো বলেন, স্যার, মানুষ জোগাড় করে দিই। একহাত লম্বা লিস্ট আছে আমার কাছে। যেমন পছন্দ তেমনই পাবেন।'

'ওসবের কোনও প্রয়োজন নেই, জয়বর্ধন। রাত অনেক হয়েছে, বিশ্রাম করোগে তুমি। আমি ঘুমাব এখন। তোমার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। আরও দশ টাকার সাহায্য করে ফেলেছ আজই তুমি। কিন্তু আজ আর দেব না, আজকের টাকা কাল পাবে, কালকের টাকা পরশু।'

একসাথে সব ক'দিনের সালাম দিয়ে ফেলল বিগলিত জয়বর্ধন।

জয়বর্ধন বেরিয়ে যেতেই দরজা লাগিয়ে দিল রানা। সত্যিই ঘুম পেয়েছে ওর। কোটটা খুলে ঝুলিয়ে দিল হ্যাঙ্গারে। বিছানার ধারে বসে জুতো জোড়া খুলতে গিয়ে হঠাৎ গোড়ালিতে লুকানো ছুরিটার কথা মনে পড়ল রানার। গোপন কুঠুরিটা খুলেই অবাক হয়ে গেল সে। নেই তো! কোথায় গেল ছুরি? কয়েক ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ রয়েছে কেবল।

কাগজটা বের করে ফেলে দিতে গিয়েও কি মনে করে ভাঁজ খুলে ধরল রানা চোখের সামনে। রেলওয়ে রিসিট একটা। পেন্সিল দিয়ে মাথার কাছে লেখা:

মাসুদ রানা
কেয়ার অভ স্টেশন মাস্টার,
রেলওয়ে স্টেশন,
কলম্বো।

মালের বিবরণ লেখার জায়গায় লেখা আছে: ১টি সুটকেস।

এক নিমেষে দূর হয়ে গেল চোখের ঘুম। পাগলের মত তারিখ খুঁজল রানা। এই তো! পরিষ্কার লেখা: ১৩ মে! সময় লেখা আছে: সন্ধে ৬-০০টা!

কয়েক মিনিট কিচ্ছু চিন্তা করতে পারল না রানা। অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রেলওয়ে রিসিট্টার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বুঝল ব্যাপারটা। কোন সন্দেহই নেই আর। ২২ মার্চ থেকে ১৩ মে এই বাহান্ন দিনের কথা কিচ্ছু মনে নেই—স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছিল ওর। এই জামা-কাপড় আসলে ওরই। এবং হিক্কার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এই সময়ের মধ্যে দুটি পুরুষ এবং একটি নারীকে হত্যা করেছে সে।

অবশ্য মিছে কথাও বলে থাকতে পারে হিক্কা। কিন্তু জানবে কি করে সে সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল? যেমন করে হোক জানতে হবে ওকে। নইলে সর্বক্ষণের জন্যে একটা অস্বস্তিবোধ পাগল করে দেবে ওকে। কাণ্ডির বারো মাইল দূরের দুর্ঘটনা থেকে শুরু হয়েছে সবকিছু। ঘটনাস্থলে গেলে কি মনে পড়বে? কিংবা কোনও সূত্র পাওয়া যাবে, যার ফলে মনে পড়ে যাবে এই বাহান্ন দিনের সব কথা? প্রায় দুটো মাস করল কি সে? সেই ক্যাডিলাক অ্যাক্সিডেন্টেই খুব সম্ভব মাথায় আঘাত পেয়েছিল, বাহান্ন দিন একটা ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছে, হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ অন্য একটা মানুষ হয়ে গিয়েছিল সে।

এমন হতে পারে স্টেশন থেকে এই সুটকেসটা ছাড়িয়ে এনে খুললেই সব কথা

মনে পড়ে যাবে ওর। কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনও সূত্র পাওয়া যাবে। রিসিটের বিবরণ অনুযায়ী সুটকেসটা রানার। রানাই পাঠিয়েছিল ওটা কোনখান থেকে কলম্বোতে। কিন্তু আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। এত রাতে স্টেশনের ডেলিভারি সেকশন নিশ্চয়ই বন্ধ।

সারারাত ঘুম হলো না রানার। সামান্য যে-কয়টা তথ্য জানা আছে ওর, সেগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল বার বার। ১৩ মে তাহলে সত্যিই সে একটা বুইক চালাচ্ছিল। নটরাজ হিক্কার নামে সে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন করা আছে। রত্নপুরের পাঁচ মাইল পুবে ঘটেছে দুর্ঘটনা। একটা মেয়ে ছিল ওর সাথে। কে সে? রিটা, না আর কেউ? মেয়েটির পরিচয় জানা নেই বিজয়শেখরের, কিন্তু হিক্কা জানে। অ্যাক্সিডেন্ট হোল গাছের সঙ্গে। মনে হচ্ছে কোন কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল সে—কারণ অন্য কোনও গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগেনি বুইকটার। মেয়েটা মারা গিয়েছিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌছে গিয়েছিল একজন সার্জেণ্ট মোটর সাইকেলে করে। ওকে পাওয়া গিয়েছিল অজ্ঞান অবস্থায়। একটা পিস্তলও পাওয়া গেছে—তার উপর মেয়েটার হাতের ছাপ। বিজয়শেখর স্থির নিশ্চিত, খুন করবার জন্যেই অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল রানা।

পাশ ফিরে শুলো রানা। কে এই মেয়েটা জানতেই হবে ওকে। ওর হাতে পিস্তলই বা ছিল কেন? কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছিল কেন সে?

বিজয়শেখর বলছিল গল-এর পর্তুগীজ এভিনিউ-এ বাড়ি আছে রানার একটা। খুব সম্ভব ভাড়া বাড়ি। রিটা এবং তার স্বামী যাচ্ছিল, রানাকেও জিজ্ঞেস করেছিল যাবে নাকি। মনে হচ্ছে, এই বাহান্ন দিন গল-এ ছিল রানা, বাসাও ভাড়া নিয়েছিল একটা।

দামী কাপড়-চোপড় এবং বুইক গাড়ির কথায় মনে হচ্ছে রাজকীয় হালে ছিল সে গল্-এ। এত টাকাই বা পেল সে কোথায়, কিভাবে? এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড়লোকি চাল এল কি করে? কি করেছে সে এই বাহান্ন দিন?

হিক্কার দুটো ঠাণ্ডা, উজ্জ্বল, নিষ্পলক চোখের কথা মনে পড়ল রানার। কে এই লোকটা, যে ইচ্ছে করেই মিছেমিছি ভাই বলে পরিচয় দিচ্ছে ওর? সবিতা বলে একটি মেয়ের কথা বলছিল হিক্কা। এই মেয়েটিই বা কে? একে কি সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছিল সে? কোথায় পেল সে এই মেয়েটিকে? আরও কয়েকটা কথা বলেছিল হিক্কা। রত্নসূর্য কুমারস্বামী আর হুলুগাল বলে দু'জন লোককেও নাকি সে খুন করেছিল। কারা এরা? বার বার করে টাকার কথা বলছিল হিক্কা। কিসের টাকা?

একটির পর একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন উদ্যতফণা গোক্ষুরের মত ফুঁসে উঠল রানার মনের মধ্যে। এর কোনও শেষ নেই। শুধু শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন না সাজিয়ে কাজে নামতে হবে ওকে। এই রহস্যের সমাধান করতে না পারলে পাগল হয়ে যাবে সে।

হঠাৎ ঢাকার কথা মনে পড়ল রানার। ১৪ এপ্রিল ফুরিয়ে গেছে ওর একমাসের ছুটি। আরও একমাসের বেশি পার হয়ে গেছে। কি জবাব দেবে সে মেজর

জেনারেল রাহাত খানের কাছে? পরমুহূর্তে বুঝল, কেউ কোন জবাব আশা করে বসে নেই ওর জন্যে। ওরা জানে, মারা গেছে সে। সব কাজ তো স্তব্ধ হয়ে যায়নি তার জন্যে। মরণের ওপার থেকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল রানা, দিব্যি নিজ নিজ কাজ করে চলেছে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হাজার হাজার কর্মচারী সমস্ত পৃথিবী জুড়ে—তেমনি কর্মব্যস্ত ঢাকার হেডঅফিস, খটাখট্ টাইপ করে চলেছে মেয়ে-পুরুষ জনা পঁচিশেক স্টেনো টাইপিস্ট, ফাইলের স্তূপ নিয়ে ব্যস্তসমস্ত রেকর্ড সেকশনের কর্মীদল, কানে হেডফোন লাগিয়ে মাইক্রো ওয়েভের জগতে বিচরণ করছে কয়েকজন এক্সপার্ট অপারেটর, নিত্যনতুন অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ভয়ঙ্কর সব বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কয়েকটি অসমসাহসী দুর্দান্ত যুবক—জাহেদ, সলীল, নাসের। রানার বদলে হয়তো নতুন কোন লোক নেয়া হয়েছে। কাজ চলছে ঠিকই। আর সাততলার উপর ঠাণ্ডা একটা ঘরে পিঠ-উঁচু রিভলভিং চেয়ারে বসে আগের মতই বড় বড় পরিকল্পনা আঁটছেন রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল রাহাত খান, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করে চলেছেন নতুন নতুন সমস্যার।

রানা যে মরে গেল, কই, পৃথিবী তো থমকে দাঁড়াল না? যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ তার দাম, না থাকলে কেউ পুছবে না আর, ধীরে ধীরে ভুলে যাবে কাছের মানুষও। কত লক্ষ কোটি রানা এসেছে এই পৃথিবীতে, চলেও গেছে। নিষ্ঠুর পৃথিবী কারও কথা মনে রাখেনি। রাখা সম্ভবও নয়।

কী দাম এই জীবনের?

ভয়ানক একা, অসহায় মনে হলো রানার নিজেকে। অতিরিক্ত শারীরিক দুর্বলতার জন্যেই বোধহয়, দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওর চোখ থেকে। কেউ নেই ওর। কেউ নেই। এই পৃথিবীর বুকে নিঃসঙ্গ একা সে। একেবারে একা। আরও কয়েক ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ল বালিশের উপর।

চোখের জলে ধুয়ে গেল রানার মনের যত ক্ষোভ। প্রশান্ত একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল ওর মন। জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে উঠে সামগ্রিকভাবে দেখতে পেল সে মানুষের জীবনটা। মানুষ আসবে, যাবে, এই তো নিয়ম। কষ্ট হবে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মকে স্বীকার করে নিতেই হবে। আর জীবনের যথার্থ মল্যও স্বীকার করে নিতে হবে সেই সাথে। নিজের সমাধি-প্রস্তরের জন্যে ক'টা লাইন ঠিক করল সে মনে মনে। তারপর বাতি জ্বেলে লিখে ফেলল একটা কাগজে।

আমিও ছিলাম।
তোমরা যারা আমায় ভালবেসেছ, দুঃখ দিয়েছ
ঘৃণা করেছ, সম্মান করেছ, ঈর্ষা করেছ
তাদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।
তোমরা দিয়েছ আমাকে বেঁচে থাকার অমূল্য
উপলব্ধি—জীবনবোধ, প্রেম।
তোমাদের মধ্যে ছিলাম, এ আমার পরম সৌভাগ্য।
মাসুদ রানা

জন্ম: মৃত্যু:
ঢাকা, ৯ এপ্রিল, ১৯····

বড় হয়ে গেল। কিন্তু কি করবে সে? সে তো কবি নয় যে দুটো লাইনেই সব কথা বলতে পারবে। এত লিখেও কি সব কথা বলা গেল?

সমাধি-প্রস্তরের কাজ শেষ করে নিশ্চিন্ত হলো রানা। মনে হলো সব কাজের সেরা কাজ সারা হয়েছে। ঘুম এল ওর দু'চোখ ভেঙে। ভোর হয়ে এসেছে তখন।

বেলা দশটার সময় ঘুম ভাঙল রানার। তাও জয়বর্ধনের হাঁকডাকে। ভুলেই গিয়েছিল রানা, ব্রেকফাস্টের পর মনে পড়ল রেলওয়ে রিসিটের কথা। ডাকল জয়বর্ধনকে। চকচকে লোভী দুই চোখ মেলে চৌকাঠে এসে দাঁড়াল ছুঁচো-মুখো লোকটা

পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট বের করে দুই আঙুলে ঘষল রানা।

'একটা কাজ করতে হবে। পারবে?'

'যে-কোন কাজ বলুন, স্যার,' বলল জয়বর্ধন নোটটার দিকে চেয়ে। হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখ।

রেলওয়ে রিসিটটা দিল রানা ওর হাতে।

'সুটকেসটা নিয়ে এসো এক্ষুণি।'

'শুধু সুটকেসটা আনার জন্যেই পঞ্চাশ টাকা?' রিসিটের উপর একবার চোখ বুলিয়েই সন্দেহ ফুটে উঠল ওর চোখে। 'আপনার নাম বিজয়তুঙ্গ সেনানায়েক নয়?'

কোনও জবাব দিল না রানা। নোটটা ভাঁজ করে পকেটে ফেলল।

'পারব না, তা তো বলিনি, স্যার,' বলল জয়বর্ধন তাড়াতাড়ি। 'আমার মুখ দিয়ে অন্য লোক কথাটা বলে ফেলেছে, স্যার—আমি বলিনি।' নিজের দুই কান দু'হাতে মুচড়ে দিল সে।

'বেশ, নিয়ে এসো সুটকেস।'

বন্দুকের গুলির মত ছুটে বেরিয়ে গেল জয়বর্ধন। আধঘন্টার মধ্যে ধুপধাপ পা ফেলে ফিরে এল সে। হাতে বড় সাইজের একটা দামী চামড়ার সুটকেস।

'উফ, ঠিক তিনমণ ওজন, স্যার। জান বেরিয়ে গেছে আমার। কুলি চার্জ দিতে হবে আরও আট আনা পয়সা।'

রানা চেয়ে আছে সুটকেসটার দিকে। জীবনে কখনও এটা দেখেছে বলে মনে পড়ল না ওর। হ্যাণ্ডেলের সাথে সুতো দিয়ে একটা লেবেল বাঁধা আছে। রানার নাম লেখা আছে ওটার উপর—ওর নিজ হাতে লেখা।

তালা বন্ধ সুটকেস। চাবি নেই রানার কাছে। একটা স্ক্রু ড্রাইভার জোগাড় করে নিয়ে আসতে বলল সে জয়বর্ধনকে। আবার সেই সন্দেহটা দেখা দিল ওর চোখে, কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেল না। তিন মিনিটেই স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে এল একটা। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বিদায় করে দিল রানা ওকে। সুটকেসের ভিতর কি আছে দেখার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা নিয়ে কেটে পড়াই আপাতত বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে বিবেচনা করল সে।

জয়বর্ধন বেরিয়ে যেতেই দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে সুটকেসটার পাশে বসে পড়ল রানা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে। আশঙ্কা আর উত্তেজনা মিলে অদ্ভুত এক মানসিক

অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ওর মধ্যে। হারিয়ে যাওয়া বাহান্নটা দিনের কোনও সূত্র কি পাওয়া যাবে এই সুটকেসের মধ্যে? এটা কি কিনেছিল সে, না চুরি করেছিল?

অল্প একটু চেষ্টার পরই তালা ভেঙে ফেলল রানা। তারপর খুলে ফেলল ডালা।

যা দেখল, তাতে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখ। টাকা। হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা থরে থরে সাজানো রয়েছে সুটকেসের মধ্যে। এত টাকা একসাথে দেখেনি সে কোনদিন।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রানা এক মিনিট। তারপর কম্পিত হাতে প্যাকেটগুলো বের করে রাখতে আরম্ভ করল মেঝের উপর। বাণ্ডিল বাঁধা পাঁচশো টাকার নোট সব। খালি হয়ে গেল সুটকেস। শুধু টাকা। টাকা ছাড়া আর কিছুই নেই সুটকেসের ভিতর। সব মিলে বিশ লক্ষ টাকা! সুটকেসের পকেট হাতড়ে দেখল রানা। দশটাকা দামের দুটো নন্‌জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পাওয়া গেল। কিছু লেখা নেই স্ট্যাম্প পেপারের উপর। রেখে দিল রানা ওগুলো যথাস্থানে।

এইজন্যেই তাহলে হিক্কা লেগেছিল ওর পেছনে। পঞ্চাশ হাজার দিতে চেয়েছিল ওকে—বাকি সাড়ে উনিশ লাখ ওর। কিন্তু এ টাকা সুটকেসের ভেতর এল কি করে? কোথা থেকে এল?

হতবুদ্ধি রানা বসে রইল টাকাগুলো মেঝের উপর ছিটিয়ে নিয়ে। কিছুই তো বোঝা গেল না। কোনও সূত্রই তো পাওয়া গেল না এই সুটকেসের ভেতর থেকে।

খুনের মোটিভ! বিজয়শেখর মোটিভ খুঁজছিল খুনের। সত্যিই কি সে টাকার জন্যে খুন করেছে দুইজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোককে?

তেরো

খুনের অভিযোগে খোঁজা হচ্ছে রানাকে। কারও কাছে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। অথচ টাকা দরকার। সুটকেসের টাকাগুলো যারই হোক না কেন, প্রয়োজন মত খরচ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল সে। না করে উপায়ও নেই।

প্রত্যেকটা দৈনিক কাগজে রানার নাম ও চেহারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ছাপা হয়েছে। ম্যানেজার এবং জয়বর্ধন দু'জনই চিনে ফেলেছে রানাকে। কাজেই দু'হাজার খরচ হয়ে গেল প্রথম দিনই। খবরে বলা হয়েছে, একটি অপরিচিত মহিলার খুনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে এই লোকটাকে দরকার। কেউ একে দেখলে বা এর সংক্রান্ত কোনও খবর জানলে আর. কে বিজয়শেখর, ইন্সপেক্টর, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি। তাই কোনও রকম উৎসাহ বোধ করল না জয়বর্ধন বা ম্যানেজার।

ঝাড়া দুটি সপ্তাহ বিশ্রাম নিল রানা। বাথরুমের প্রয়োজন ছাড়া এক পা বেরোল না ঘর থেকে। চলনসই একজোড়া গোঁফ গজিয়ে নিল সে, সানগ্লাস কিনে নিল একটা। নিয়মিত ব্যায়াম করে ঠিক করে নিল শরীরটা। জামা-কাপড়ের ভোল

পাল্টে ফেলল।

টাকা দিলে বাঘের চোখও পাওয়া যায়। একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ওপেল রেকর্ড জোগাড় করে ফেলল সে জয়বর্ধনের সাহায্যে আত্মনির্বাসনের দ্বাদশ দিবসে। দু'দিন পর রানার আদেশে থ্রী-এইট এবং পয়েন্ট টু-টু ক্যালিবারের দুটো পিস্তল এবং দু'বাক্স গুলি জোগাড় করে আনল জয়বর্ধন। রানা বুঝতে পারল জিনিসগুলো কিনতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে কমিশন চলে গেছে জয়বর্ধনের পকেটে। তা যাক্। টাকার অভাব নেই।

সত্তর মাইল পথ। তাই খুব ভোরে উঠে রওনা হলো রানা। ড্যাশ বোর্ডে রাখল থ্রী-এইট ক্যালিবারের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তলটা, টু-টু ভরে নিল হিপ পকেটে, আর গাড়ির বুটে সুটকেসটা। কাণ্ডির রাস্তায় চলল রানা। পরিষ্কার মনে আছে রানার ঠিক কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল। বাম পাশে পাহাড়, ডানপাশে ঝোপঝাড়। চিনতে পারবে সে। আগে সেখানে যেতে হবে, যদি কোনও সূত্র পাওয়া না যায় তাহলে গল-এর দিকে রওনা হবে সে আজই।

কেগালা ছাড়াতেই উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ শুরু হলো। আরও বিশ মাইল পুবে এসে মনোযোগ দিল সে রাস্তার দুই ধারে। গাড়ির গতি কমিয়ে নিয়ে এল দশ মাইলে। কাছাকাছি কোথাও ঘটেছিল সেই অ্যাক্সিডেন্ট। অস্থির লাগছে, মানসিক উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করল সে।

মাইল দু'য়েক এগিয়ে পেয়ে গেল রানা সেই জায়গা। দূর থেকেই চিনতে পারল সে জায়গাটা গোটা কতক উপড়ানো ঝোপ দেখে। কাছে এগিয়ে দেখল রাস্তার উপর দু'মাস আগের চাকা স্কিডের আবছা চিহ্ন রয়ে গেছে এখনও। পাহাড়ের গায়েও কয়েকটা দাগ দেখতে পেল সে স্পষ্ট।

আরও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেল রানা। ডানধারে সরু একটা রাস্তা গেছে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে। সেই রাস্তায় কিছুদূর গিয়ে মেইন রোড থেকে আড়াল হয়েই ব্রেক করল। গাড়িটা চাবি লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়ে হেঁটে চলে এল ঘটনাস্থলে। এইখানে গাড়ি থামালে হয়তো কারও ঔৎসুক্য জাগতে পারে—তাই এই সাবধানতা।

কই, কিচ্ছু মনে পড়ছে না তো! আধঘণ্টা ধরে ঘোরাঘুরি করল, কিভাবে দুটো গাড়িতে ধাক্কা খেয়েছিল মনে মনে কল্পনা করে দেখল বারবার, সেই সময় ওর মনের ভাব যা ছিল সেটা ফিরিয়ে এনে সমস্ত ঘটনা আবার অনুভব করবার চেষ্টা করল—কিন্তু কিসের কি, কিচ্ছু মনে পড়ল না রানার।

একটা পাথরের উপর বসে পড়ল রানা। গত দুই সপ্তাহ ধরে কম চিন্তা করেনি সে। কিন্তু কুয়াশাচ্ছন্ন বাহান্নটা দিন আবছাই রয়ে গেছে। মাঝে-মধ্যে এক-আধটা কথা মনে এসেছে খাপছাড়া ভাবে, দুঃস্বপ্নের মত। কে যেন চাবুক মারছে, বাঘ বশ করবার চাবুক, ছট্‌ফট্ করছে রানা, জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে ওর। হঠাৎ মানসপটে ভেসে উঠেছে রিটার অপরূপ সুন্দর মুখটা—কুৎসিত সব গালি বেরোচ্ছে সে মুখ দিয়ে। প্রচণ্ড গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওর উপর দুটো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। চিৎকার করে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে সে। এইসব ঘটনা কি সেই বাহান্ন দিনের

কোন ঘটনা, নাকি শুধুই দুঃস্বপ্ন?

একদিন দুপুরে হঠাৎ মনে হয়েছে রানার, সাগরে ডুব দিয়ে দিয়ে মুক্তো তুলছে সে আর একটি মেয়ে। হঠাৎ তুমুল আন্দোলন উঠল পানিতে, প্রাণপণ শক্তিতে বর্শা চালাল রানা। কাঁদছে মেয়েটি সাগর তীরে বসে। একটা চমৎকার কাঠের বাংলোর বারান্দায় বসে সাগরের দিকে চেয়ে আছে রানা, আকাশে অস্তরাগ। ফুটফুটে বিকেল, একটি ফুল গুঁজে দিল রানা মেয়েটির খোঁপায়, খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি।

এসব কী? এগুলোও কি সেই হারানো বাহান্ন দিনের কোন ঘটনা, নাকি সুখ-স্বপ্ন?

পাথরের উপর বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা ছোট্ট কুটিরের কথা মনে হলো রানার। পাহাড়ের ধারে কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ঘরটা। ছাদ টিনের। দূরে আরেকটা পাহাড়ের গায়ে দেখা যাচ্ছে একটা জলপ্রপাত। খোলা জানালা দিয়ে দেখছে রানা সেটা।

পরিষ্কার ছবির মত দেখতে পেল সে কুটিরটা। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। চারদিকে চাইতেই পাহাড়ের গায়ে একটা পায়ে-চলা-পথ দেখতে পেল। চলতে আরম্ভ করল সে সেই পথ ধরে। আবছাভাবে পরিচিত মনে হলো পথটা, মনে হলো অনেক—অনেক আগে, হয়তো পূর্বজন্মে এই পথে হেঁটেছে সে একদিন।

এঁকেবেঁকে চলেছে পাহাড়ী পথ। খাড়াই উতরাই ভেঙে একনাগাড়ে পনেরো মিনিট চলার পরেও কোনও কুটির চোখে পড়ল না ওর। কিন্তু একটা পরিচিত গন্ধ পেল সে। চা-পাতার গন্ধ। এইবার কোনও সন্দেহ রইল না আর রানার মনে। এগিয়ে গেলে কুটির সে পাবেই।

ছয়ফুট লম্বা একটা কাবাগোয়া (ড্রাগনের মত সরীসৃপ) সড়সড় করে সরে গেল রানার পায়ের শব্দ শুনে। কয়েকটা দাড়িওয়ালা ওয়াণ্ডারু (বানর) একটা পাহাড়ী বাদাম গাছের উপর থেকে মুখ ভেংচাল ওকে।

দুইধারে ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। ডাইনে-বাঁয়ে চাইল রানা। কুটির দেখতে পেল না কোন দিকেই। ডানদিকের পথটা ধরে এগোতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। কি মনে করে বামদিকেই এগোল। অন্ধ যেন সে। আন্দাজের উপর নির্ভর করে চলেছে লাঠি ঠুকে ঠুকে।

আরও দশ মিনিট চলার পর দেখতে পেল সে কুটিরটা। বিরাট একটা চা বাগানের ধারে। টিনের ছাদ, কাঠের দেয়াল। ঠিক যেমনটি কল্পনা করেছিল রানা, তেমনি। লাফিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ডটা। দ্রুত পায়ে এগোল সে সেইদিকে।

চুরুট ফুঁকছে একজন বৃদ্ধ বারান্দায় একটা খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে। পরনে মলিন সারং, গায়ে খাকি কোর্তা।

'কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

অবাক হয়ে চাইল লোকটা রানার মুখের দিকে, তারপর চুরুটটা মুখ থেকে সরিয়ে বলল, 'এই তো চলে যাচ্ছে। তারপর? হঠাৎ কোত্থেকে?'

'এই পথেই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই। অনেক রাস্তা পাড়ি দিয়ে

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। চা খাওয়াতে পারবেন এক কাপ?'

'এক্ষুণি বানিয়ে খেলাম। এক কাপ আন্দাজ হয়ে যাবে। বসুন, নিয়ে আসছি।'

একটা কাঠের বাক্সের উপর বসে পড়ল রানা। ওর মনে হলো এই লোকটাকে দেখেছে সে আগে কোথাও। চোখ তুলেই দেখতে পেল ও যেদিক থেকে এসেছে তার পাঁচ ছ'শ গজ ডানদিকে জলপ্রপাত দেখা যাচ্ছে একটা। নিশ্চয়ই দেখেছে সে এই লোকটাকে। এখানেই।

এক বাটি চা নিয়ে এল বৃদ্ধ। হাঁ করে চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আশ্চর্য! আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!'

'আমার ভাইকে দেখেছেন,' বলল রানা অম্লানবদনে। '২২ মার্চ ওই ওদিকের রাস্তায় মোটর অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিল সে। মনে পড়েছে?'

একটু থতমত খেয়ে গেল বৃদ্ধ। তারপর অনাবশ্যকভাবে হাত নেড়ে বলল, 'অ্যাক্সিডেন্টের কথা কিছু জানি না আমি।'

রানা বুঝল, মিথ্যে কথা বলছে বুড়ো।

'আমার ভাই জখম হয়েছিল। স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল ওর। দুর্ঘটনার পর যে কোথায় গেল, আজ পর্যন্ত কোন খবর নেই। তাই খোঁজ করে বেড়াচ্ছি আমি।'

'এ ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। আপনার চা খাওয়া হলো? বাগানটা চক্কর দিতে হবে আমাকে। তারপর যেতে হবে ছোট সাহেবের বাসায়।'

পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে নিজের হাঁটুর উপর বিছাল রানা। বলল, 'আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না আমি। খবরের বিনিময়ে পয়সা দেব।'

'মেয়েলোকটা বলে গিয়েছিল একটি কথাও যেন প্রকাশ না পায়,' বলল বৃদ্ধ। দৃষ্টিটা আঠার মত সেঁটে গেছে ওর টাকাগুলোর উপর। 'কিন্তু আপনি যখন ওর আপন ভাই, তখন···'

টাকাগুলো বৃদ্ধের কম্পিত হাতে ধরিয়ে দিল রানা। একটাতেই কাজ হয়ে যেত, কিন্তু আগ্রহের আতিশয্যে দুটোই দিয়ে দিল সে। কিছু একটা খবর শুনবার আশায় হার্টবিট বেড়ে গেল রানার।

'কি হয়েছিল?'

'আপনার ভাই আর মেয়েলোকটা এসেছিল এখানে। মেয়েলোকটা বলেছিল, একটা ডাকাত আপনার ভায়ের মাথায় ডাণ্ডা মেরে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে। পরে জানলাম, সেটা মিছে কথা। আসলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ওই বড় রাস্তায়। আগুন ধরে গিয়েছিল গাড়িটায়। একটা লাশ পাওয়া গেছে পোড়া গাড়ির মধ্যে।'

'ঠিক বলেছেন। মেয়েলোকটা দেখতে কেমন ছিল?'

'দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু পেরেকের মত শক্ত। লাল একটা শাড়ি পরনে, গায়ে কালো ব্লাউজ। অনেক টাকাওয়ালা মেয়েলোক।'

রিটা! আর কেউ নয়!

'তারপর?'

'আপনার ভাই এমন ভাব দেখাচ্ছিল, যেন ভয়ানক চোট পেয়েছে। আসলে সব ভান। আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করেছিল সে। পেরাদেনিয়ায় গিয়ে গল্-এ একটা ট্রাঙ্ককল করবার জন্যে আমাকে একশো টাকা দিয়েছিল মেয়েলোকটা। পাহাড়ী পথে মাইলখানেক গেলেই পোস্ট অফিস। রাতের বেলা দশ মিনিটেই লাইন পেয়ে গেলাম। লোকটাকে ডেকে খবরটা জানাতেই বলল এক্ষুণি গাড়ি নিয়ে রওনা হচ্ছে সে, চার ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। ফিরে এসে জানালা দিয়ে দেখলাম মেয়েলোকটার সঙ্গে গল্প করছে আপনার ভাই। কিন্তু আমি দরজা দিয়ে ঢুকতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার ভান করল।'

ব্যাপারটা বুঝতে পারল না রানা।

'ফোন নাম্বারটা মনে আছে আপনার?'

'হ্যাঁ, খুব সহজ নম্বর। গল্—১২৩৪।'

'কাকে ডাকতে বলা হয়েছিল আপনাকে? কি নাম লোকটার?'

'জে সি হুলুগাল।'

শিরশির করে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল রানার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে।

'ঠিক কি কথাটা বলেছিল মেয়েটা?'

ভুরু কুঁচকে মনে করবার চেষ্টা করল বৃদ্ধ। তারপর বলল, 'বলেছিল, ভয়ানক এক দুর্ঘটনায় পড়ে আটকে গেছে নটরাজ হিক্কা। যেন সে গাড়ি নিয়ে এই মুহূর্তে রওনা হয়ে যায়।'

'এসেছিল সে?'

'খুব সম্ভব।'

'তার মানে? আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না।' মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'ঘণ্টা দু'য়েক পর চলে গিয়েছিল মেয়েলোকটা আপনার ভাইকে নিয়ে। বলেছিল, গাড়ি নিয়ে আসছে যখন, রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ানোই ভাল। আমি সাথে যাইনি। ঘুম এসেছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

আরও অনেক প্রশ্ন করল রানা, কিন্তু উল্লেখযোগ্য আর কিছুই জানা গেল না। যেটুকু তথ্য জানা গেল সেটা মনে মনে গুছিয়ে নিল সে। অ্যাক্সিডেন্টের পর রিটা এবং সে এসেছিল এই কুটিরে। তার মানে আসলে রিটার স্বামী কুমারের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল জ্বলন্ত গাড়ির মধ্যে। হুলুগাল লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে এখন। টেলিফোন নাম্বারটা কাজে দেবে। কিন্তু রিটা তাকে নটরাজ হিক্কা বলে পরিচয় দিল কেন? দ্বিতীয় সড়ক দুর্ঘটনায় কি রিটাই মারা গেল, না আর কেউ?

বৃদ্ধকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা। গল্-এ যেতে হবে। প্রায় দেড়শো মাইল পথ। কিন্তু তর সইছে না রানার। পথে কোথাও কিছু খেয়ে নিলেই হবে।

বেলা একটার সময় পৌঁছল রানা গল্-এ। এক নজরেই বোঝা যায় সৌখিন কোটিপতিদের অবসর বিনোদনের জন্যে তৈরি হয়েছে এই বিলাসবহুল শহর। সাজানো দোকান-পাট, বিরাট সব প্রাসাদ, চমৎকার ফুলের বাগান, সবকিছুতেই টাকার ছড়াছড়ি। এই শহরে এসে টাকা যেন খোলামকুচি হয়ে যায়।

প্রচুর দামী দামী গাড়ি চলছে রাস্তায়। ফুটপাথে লোকের ভিড়। গাড়িটা পার্ক করে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে পড়ল রানা। বিনা দ্বিধায় টেলিফোন করার অনুমতি দিল দোকানদার, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল অ্যাকাউন্টস নিয়ে। রানা ডায়াল করল ১২৩৪। তিনবার রিং হতেই একটা মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'গুড মর্নিং। গোল্ডেন ক্যাসিনো অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।'

'জে সি, হুলুগালকে দিন দয়া করে,' বলল রানা।

'মিস্টার হুলুগাল তো নেই। কে বলছেন আপনি?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু জিভটাও শুকিয়ে গেছে ওর। বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে কেউ।

'আমি ওঁর একজন বন্ধু। এই মাত্র পৌঁছেছি গল্-এ। কোথায় পাওয়া যাবে ওঁকে?'

'আমি দুঃখিত,' বলল মেয়েটি অপ্রতিভ কণ্ঠে। 'মানে, মিস্টার হুলুগাল মারা গেছেন।'

'তাই নাকি?' কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল রানা। 'জানতাম না তো! কবে মারা গেছেন?'

'২৩ মার্চ।'

অর্থাৎ যেদিন রানা এবং রিটা অ্যাক্সিডেন্ট করল তার পরদিনই। তাহলে কি...। হাত কাঁপতে আরম্ভ করল রানার।

'কি হয়েছিল? কিসে মারা গেছেন ভদ্রলোক?'

'একটু হোল্ড করুন। জাস্ট এ মোমেন্ট,' বলল মেয়েটি।

দশ সেকেণ্ড চুপচাপ কাটল। টপ টপ ঘাম পড়ছে রানার চিবুক বেয়ে। তারপর ক্লিক্ করে শব্দ হলো একটা। একটা কোমল অথচ ভারি পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'কে কথা বলছেন?'

এক নিমেষে চিনতে পারল রানা। হিক্কার কণ্ঠস্বর। উত্তর দিল না রানা। রিসিভারটা কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। আবার সেই ঠাণ্ডা স্রোতটা উঠে এল রানার মেরুদণ্ড বেয়ে।

'কে কথা বলছেন?' আবার জিজ্ঞেস করল হিক্কা। 'মাসুদ রানা নাকি?'

টুঁ শব্দ করল না রানা। বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল রিসিভার কানে ধরে। কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে।

হঠাৎ আরেকটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তীক্ষ্ণ কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর।

'আমি ইন্সপেক্টর সেনানায়েক বলছি। অপারেটর, এই কলটা এক্ষুণি ট্রেস করো।'

এইবার ঝট করে নামিয়ে রাখল রানা রিসিভার। বেরিয়ে এল দোকান থেকে। কিছুদূর উল্টো দিকে হেঁটে যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে আবার দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে উঠে বসল ওপেলের পিছন সীটে। সেলস্ম্যান তেমনি ব্যস্ত আছে তার হিসাব-পত্র নিয়ে। একজন হকারকে ডেকে

রানা পেপার কিনল একটা। মেলে ধরল সেটা চোখের সামনে।

কাজটা ঠিক হয়নি। জেনে গেছে ওরা যে গল্-এ আছে রানা এখন। হিপ পকেট থেকে পয়েন্ট টু-টু পিস্তলটা চলে এল রানার হাতে। খবরের কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইল সে চুপচাপ। চোখ জোড়া রইল রাস্তার উপর।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। করিৎকর্মা লোক এরা। কিন্তু পুলিসের গাড়ি কোথায়? সাদা একটা শেভ্রোলে এসে দাঁড়াল ওষুধের দোকানটার সামনে, রানার দশ গজের মধ্যে।

দু'জন লোক তড়াক করে লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। প্রায় দৌড়ে ঢুকল ওরা ওষুধের দোকানে, এবং প্রায় সাথে সাথেই বেরিয়ে এল। অবাক হয়ে দেখল রানা, লোক দু'জন আর কেউ নয়: লোরী ও পেরেরা।

চোদ্দ

পাথরের মত জমে গেল রানা। এই দু'জন এখানে এল কোত্থেকে? হিক্কার সঙ্গে কি যোগ-সাজস আছে এদের? স্যানসোনির কথা মনে পড়ল ওর। বলেছিল, এদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি কেউ, রানাও পাবে না। ভুলেই গিয়েছিল রানা এদের কথা, কিন্তু এরা যে ওকে ভোলেনি, হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া গেল।

চুপচাপ বসে রইল রানা। ডাইনে-বাঁয়ে চোখ বুলাল ওরা ফুটপাথে নেমে দাঁড়িয়ে। তারপর গাড়িতে উঠে বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ির ভিড়ে।

হিক্কাকে একাই সামলাতে পারবে, ভেবেছিল রানা। কিন্তু হিক্কা, লোরী, পেরেরা সবাইকে সে একা সামলাবে কি করে? তার উপর আবার জুটেছে এক ইন্সপেক্টর, সেই সাথে তার পুলিস বাহিনী। প্রতিপক্ষ ওর চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী।

কিন্তু যাই হোক, এই টাকার উপর কাউকে থাবা বসাতে দেবে না রানা। ওরা জেনে ফেলেছে, রানা এ-শহরেই আছে। কাজেই টাকা ভর্তি সুটকেসটা সঙ্গে রাখা নিতান্তই বোকামি হচ্ছে। নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে এটাকে।

শেভ্রোলেটা যেদিকে গিয়েছে তার উল্টোদিকে রওনা হলো রানা। বেশ কিছুদূর আসার পর চোখে পড়ল চৌমাথার উপর বিরাট এক চারতলা দালানে সাইনবোর্ড লাগানো: দ্য ব্যাঙ্ক অভ সিলোন, এস্ট্যাব ১৯৩৯। এবার আশপাশে আরও দুটো ব্যাঙ্কের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল রানার: চাটার্ড ব্যাঙ্ক আর হংকং অ্যাণ্ড ম্যাকাও ব্যাংকিং কর্পোরেশন। এদের মধ্যে দি ব্যাঙ্ক অব সিলোনকেই বেশি চৌকস মনে হলো রানার। সামনে দাঁড়ানো দারোয়ান দুটোকেও যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ মনে হলো।

দারোয়ানদের একজনকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'একটা সুটকেস জমা রাখতে চাই। ব্যবস্থা আছে?'

'আছে, স্যার। সোজা ঢুকে যান, ওই কাঁচ দিয়ে ঘেরা ঘরটার পাশেই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের টেবিল। উনিই সব নিয়ম-কানুন বলতে পারবেন।'

সুটকেসটা বের করে হাতে নিয়ে ঢুকে পড়ল রানা দরজা দিয়ে। ভিতরে ঢুকেই বুঝতে পারল রানা, এই ব্যাঙ্ক লুট হওয়ার উপায় নেই। ভিতরেও সশস্ত্র গার্ড দিয়ে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোজা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

'এই সুটকেসটা জমা রাখতে চাই আপনাদের কাছে। সেফটি ভল্টের ব্যবস্থা আছে আপনাদের?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বলল তরুণ ম্যানেজার। 'আসুন আমার সঙ্গে। আমাদের স্ট্রংরুম ভাড়া নিতে চান তো? আসুন।'

লিফটে করে তেতলায় উঠে এল ওরা। একটা করিডর দিয়ে খানিকটা এগিয়েই লোহার কোলাপসিবল গেট। অফিসারকে দেখে একজন গার্ড গেট খুলে স্যালুট করল।

'২৬ নম্বর ঘরের চাবিটা দাও।'

একটা চাবি বাড়িয়ে দিল গার্ড। লোহার গেট দিয়ে ঢুকে কিছুদূর এগিয়ে বাঁয়ে আরেকটা করিডর। ছয়টা দরজা পেরিয়ে ডানধারের একটা দরজা খোলা হলো চাবি দিয়ে। ছোট্ট একটা ঘর: ছয় ফুট বাই ছয় ফুট হবে। দুটো চেয়ার এবং একটা টেবিল পাতা আছে। দেয়ালের গায়ে স্টীলের সেফটি ভল্ট।

'বাহ্, চমৎকার ব্যবস্থা তো!' বলল রানা।

'হ্যাঁ। আমাদের কোন কোন ক্লায়েন্ট কাগজপত্র বাইরে না নিয়ে এখানেই ঘাঁটাঘাঁটি করতে পছন্দ করেন, তাই চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা রয়েছে। কাস্টোমারের সব রকম সুবিধের দিকে নজর রাখাই তো আমাদের কাজ। যাক্, আপনার কমবিনেশন ওয়ার্ড হচ্ছে স্করপিয়ন, মনে থাকবে শব্দটা?'

'তা থাকবে।'

'এইবার তাহলে দয়া করে আমার সামনে একবার খুলুন সেফটা। আপনার করতে হবে কি...'

'জানি আমি,' বলল রানা। 'এ ধরনের জিনিস আগেও ব্যবহার করেছি।'

নবটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্করপিয়ন শব্দটার বানান করে চলল রানা। অক্ষর শেষ হতেই ক্লিক করে শব্দ হলো একটা। খুলে গেল দরজা।

'ডালা বন্ধ করলেই আপনাআপনি এলোমেলো হয়ে যাবে কমবিনেশন,' বলল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। 'আর তালাও লেগে যাবে।'

'ভাল সিসটেম।'

'এই ভল্টের চাবি থাকবে গার্ডের কাছে। ওই গেটের ওপারে এ-চাবি নেবার নিয়ম নেই। তবে আপনি যে-কোনও সময় এসে চাবি চাইলেই পাবেন। আপনি একাই আসবেন, না অন্য কোন লোকও যাতে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখবেন?'

'আমি চাই না আমার অনুপস্থিতিতে অন্য কোনও লোক এই সেফটি ভল্টে

প্রবেশ করুক। কিন্তু আপনাদের গার্ড কি আমাকে চিনতে পারবে?'

মুচকে হাসল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

'যেইমাত্র আপনি সেফটা খুলছেন, অমনি আপনার ছবি উঠে গেছে। গার্ডদের কাছে এক কপি ছবি থাকবে। আপনি ছাব্বিশ নম্বর ভল্টের চাবি চাইলেই আপনার চেহারা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিয়ে তারপর চাবি দেবে। আচ্ছা, এবার তাহলে চলুন, কাগজপত্রগুলো সই করে ফেলা যাক। সামান্য কিছু ফরমালিটি আছে।'

'দু'মিনিট পর এলে হয় না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কাগজপত্রগুলো একটু দেখে নিয়ে তারপর সুটকেসটা রাখতে চাই আমি। অসুবিধে হবে কি?'

'না না। মোটেই না। আমি নিচে যাচ্ছি, আপনি আসুন।'

লোকটা বেরিয়ে যেতেই সুটকেস খুলে হাজার পাঁচেক টাকা বের করে নিল রানা। কয়েকদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। সুটকেসটা বন্ধ করতে গিয়েও থামল রানা, পয়েন্ট টু-টু পিস্তলটা রেখে দিল ওটার ভেতর। দুটো পিস্তলের প্রয়োজন পড়বে না। সেফের ভেতর ঢুকিয়ে দিল সে সুটকেসটা তারপর তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এল ভল্ট থেকে। চাবি লাগিয়ে দিল দরজায়। গার্ডের কাছে চাবি দিয়ে নেমে এল নিচে।

কাগজপত্র তৈরি করেই রেখেছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। সই এবং পেমেন্ট করে দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল রানা ব্যাঙ্ক থেকে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে সে। এবার ভাল কোন হোটেলে উঠে খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে খানিক বিশ্রাম নেয়া দরকার।

রাজকীয় সম্মানে গাড়ির দরজা খুলে ধরে খাতির-যত্ন করে নিয়ে গেল হেড পোর্টার রানাকে হোটেলের মধ্যে। সিঙ্গেল রুম ভাড়া নিল রানা। পাঁচ তলার উপর ৪০৫ নম্বর রুম। প্রকাণ্ড ঘর, সাগরের দিকে মুখ করা প্রশস্ত ব্যালকনি, খোলা দরজা দিয়ে হু-হু হাওয়া আসছে সাগর থেকে। স্নান সেরে খেয়ে নিল রানা। নরম বিছানায় গড়াগড়ি দিল ঘণ্টাখানেক। তারপর জামা-কাপড় পরে নিয়ে নেমে এল নিচে। পর্তুগীজ এভিনিউ খুঁজে বের করতে হবে ওকে। ৩২৫-বি, পর্তুগীজ এভিনিউ।

খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। যাকেই জিজ্ঞেস করল সবাই আঙুল তুলে ডানদিকে দেখাল। শহরের প্রায় শেষ সীমায় সমুদ্রপারে চলে এসেছে রানা। একটা আম গাছের তলায় গাড়িটা রেখে পায়ে হেঁটে এগোল সে এবার। বাইশ, তেইশ, চব্বিশ। তিনশো পঁচিশের এ ছাড়িয়ে বি-র গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। একতলা একটা বাড়ি। সন্তর্পণে চাইল চারপাশে। আশপাশে কোথাও একটি লোক দেখতে পেল না। পরিষ্কার বুঝতে পারল মস্ত বড় ঝুঁকি নিতে চলেছে সে, কিন্তু বাড়িটার মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে ওর বিশ্বাস অনেক কিছু মনে পড়ে যাবে ওর। হয়তো কোনও চিঠিপত্র পাবে, ফটোও পেতে পারে কিংবা হয়তো ডায়েরী পেয়ে যাবে একটা। দেখাই যাক না ঢুকে।

তিন-চার ধাপ সিঁড়ি টপকে বারান্দায় উঠে এল রানা। পিস্তলটা ধরে আছে সে ডান হাতে। বাম হাতে কলিং বেলের বোতাম টিপল। দরজায় তালা নেই যখন, ভিতরে লোক আছে হয়তো।

চারদিক নিস্তব্ধ। আবার বোতাম টিপল সে। বেলের শব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা।

কেউ কি নেই? হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে গেল রানার। দরজার দিকে এগিয়ে আসছে কেউ।

পিস্তল হাতে প্রস্তুত রইল রানা। ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটা।

দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। বাইশ-তেইশ বছর বয়স। রিটার মত অপূর্ব সুন্দরী নয়, কিন্তু সারামুখে ছড়িয়ে আছে নিষ্পাপ সারল্য আর শিশুসুলভ পবিত্র একটা কমনীয়তা। কাজল-কালো দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

পাথরের মূর্তির মত জমে গেছে যেন রানা। মেয়েটিকে দেখা মাত্রই এক নিমেষে সমস্ত কুয়াশা যেন কেটে গেল ওর চোখের সামনে থেকে। বাহান্ন দিনের সব কথা একসাথে ভিড় করতে চাইল ওর মনের মধ্যে, অন্ধ একজন লোক যেন হঠাৎ ফিরে পেয়েছে দৃষ্টিশক্তি।

'রানা! রানা! ফিরে এসেছ তুমি! পিস্তল কেন তোমার হাতে? তোমার পথ চেয়ে চেয়ে দু'চোখ ব্যথা হয়ে গেছে আমার, রানা। কোথায় ছিলে তুমি...' হঠাৎ থেমে গেল সবিতা।

পিছনে না ফিরেই বুঝতে পারল রানা, ফিরে এসে লাভ হলো না। হঠাৎ ভীতি দেখতে পেল সে সবিতার চোখে। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। দেরি হয়ে গেছে তখন। ছিটকে পড়ল রানার হাতের পিস্তল কব্জির উপর জোরে কিসের আঘাত খেয়ে। ঝট্ করে ঘুরল রানা। ঠিক কপালের উপর লাগল দ্বিতীয় আঘাত। অনেকগুলো সূর্য জ্বলে উঠল যেন ওর চোখের সামনে। পড়ে যাচ্ছে রানা। হাত দিয়ে চৌকাঠ ধরবার চেষ্টা করল। চড়াৎ করে আরেকটা বাড়ি পড়ল পিঠের উপর।

তলিয়ে যাচ্ছে রানা। বর্তমান ছেড়ে তলিয়ে যাচ্ছে সে অতীতে।

পনেরো

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মেয়েটা।

পাথরের মত ভারি একটা হাত তুলে অন্ধের মত এদিক-ওদিক হাতড়াল রানা। থেমে গেল চিৎকার। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা কেবল। উঠে বসবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না।

'রানা! মাসুদ রানা!'

চিনতে পারল রানা এবার কণ্ঠস্বরটা। রিটার কণ্ঠস্বর।

প্রচণ্ড জোরে লাথি মেরেছে হাম্বানটোটা। সুযোগ দিয়েছিল রানাই, কিন্তু তাই বলে কি এতজোরে মারতে হবে? শুনতে পেল চিৎকার করে বলছে রিটা—উঠে পড়ো রানা, উঠে পড়ো! কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না ওর।

বহুকষ্টে চোখ খুলল রানা। অন্ধকার কেন? স্টেডিয়ামের ফ্লাড লাইটের আলোগুলো সব নিভে গেল? নাকি অন্ধ হয়ে গেছে সে—চোখ উপড়ে নিয়েছে হাম্বানটোটা? কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল সে কোনমতে।

'রানা! কিছু একটা বলো। সে সামথিং! খুব বেশি চোট লেগেছে?'

রানার মুখের কাছে ঝুঁকে এসেছে রিটা। ওর কাঁধের উপর দিয়ে আবছা ঝোপঝাড় দেখতে পেল রানা। তার ওপারেই তারাজ্বলা আকাশ। হঠাৎ মনে পড়ে গেল রানার গাড়িটার কথা। রাস্তার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে আসছে সেটা ফুলস্পীডে। প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দ শুনতে পেল সে আবার। উল্টে যাচ্ছে গাড়িটা। সাতটা সূর্য জ্বলে উঠেছে ওর চোখের সামনে।

'না, ঠিক আছি,' বলল রানা। নিজের কানেই কর্কশ শোনাল নিজের কণ্ঠস্বর। 'দাঁড়াও, এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে।' নিজের গালের উপর হাত রাখল রানা, ভেজা চট্‌চটে মনে হলো। ভারি গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'কি হয়েছিল?'

'উঠে পড়ো, রানা। কুইক। সাহায্য করতে হবে আমাকে। আমার মনে হচ্ছে মারা গেছে ও।'

'কে? কে মারা গেছে?'

'কুমার! জলদি ওঠো, সাহায্য করো আমাকে!'

'একটু দাঁড়াও।' মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়ল রানা। তিনমন ওজন মনে হচ্ছে মাথাটার। টনটন করছে ব্যথায়। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। সাহায্য করল ওকে রিটা।

'কি ন্যাকামি করছ!' রিটার কণ্ঠে জরুরী ভাব। সেই সাথে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা। অবাক হয়ে চাইল রানা ওর মুখের দিকে। 'মরে পড়ে আছে লোকটা। আই থিঙ্ক হি ইজ ডেড। দম নেই।'

প্রতি পদক্ষেপে রানার মনে হলো ঘাড় থেকে ছিঁড়ে পড়ে যাবে মাথাটা। তবু এগিয়ে গেল সে লোকটার দিকে। উল্টানো ক্যাডিলাকের পাশেই পড়ে আছে কুমারের দেহ। এমন একটা অসম্ভব ভঙ্গিতে পড়ে আছে লোকটা যে পাল্‌স্ পরীক্ষা না করেও বলে দেয়া যায়, মারা গেছে। পা দুটো উপুড় হওয়ার ভঙ্গিতে রয়েছে আর কোমর থেকে উপরের ভাগটা রয়েছে চিৎ হয়ে। একটু পরীক্ষা করেই বুঝল রানা ঘাড় মটকে গিয়েছে লোকটার, খুলি ভেঙে মগজ বেরিয়ে এসেছে খানিকটা।

উঠে দাঁড়াল রানা। রানার বাম বাহুর ওপর একটা হাত রাখল রিটা। থরথর করে কাঁপছে রিটার হাত।

'মারা গেছে,' বলল রানা।

কোন কথা বলল না রিটা। আঙুলের নখগুলো শুধু বসে গেল রানার হাতের মাংসে।

'এখানেই দাঁড়াও,' বলল রানা। 'আমি দেখি আশপাশে কোন লোক পাওয়া যায় কিনা।'

'মারা গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই তো?' ঠাণ্ডা কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রিটা।

আবার একটু অবাক হলো রানা। বলল, 'মারাই গেছে। ঘাড় ভেঙে গেছে। খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে এসেছে।'

কথাটা শুনেই যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল রিটা খানিকটা। সরে গিয়ে পাহাড়ের

গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ম্লান চাঁদের আলো পড়েছে ওর ওপর। যত্ন করে বাঁধা খোপা খুলে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে, শাড়ি ছিঁড়ে গিয়েছে কয়েক জায়গায়। নীল দুই চোখ স্থির হয়ে রয়েছে রানার উপর। যেন কোনও জরুরী সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করছে রিটা গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে।

'হারামি গাড়িটা ওই ওখানে উল্টে রয়েছে, রানা,' বলল রিটা। 'গো অ্যাণ্ড হ্যাভ আ লুক। ড্রাইভারের কি অবস্থা দেখো।'

'আর লোরীদের গাড়িটা?'

'তাই তো! ওটাকে তো দেখছি না! হয়তো আমরা মারা গেছি মনে করে ফিরে গেছে ওরা। যাই হোক, তুমি ওই গাড়ির অবস্থাটা দেখে এসো জলদি।'

ল্যাণ্ড রোভার। ঝোপঝাড় ভেঙে রাস্তা থেকে নেমে গেছে ওটা খানিকটা নিচে। ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল রানা উল্টানো গাড়িটার পাশে। ভাঙা জানালা দিয়ে দেখল ড্রাইভিং সীটে উল্টো হয়ে বসে আছে ড্রাইভার। অল্পবয়সী সিংহলী ছোকরা। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চোখ দুটে রানার দিকে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওকে বের করবার চেষ্টা করতে গেল রানা, পরমুহূর্তে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। মারা গেছে ছোকরা। স্টিয়ারিং কলামটা পাঁজর ভেঙে ঢুকে গেছে ওর বুকের মধ্যে।

পিছিয়ে এল রানা দুই পা। গাড়ির ভেতর আর কেউ নেই। কিছুই করবার নেই রানার। ফিরে এল সে রিটার কাছে।

'মারা গেছে।'

'আর কেউ নেই গাড়িতে? ড্রাইভার একাই ছিল?' জিজ্ঞেস করল রিটা।

'হ্যাঁ। একাই।'

'ভাল করে দেখেছ? সত্যিই মারা গেছে? আর ইউ শিওর?'

'হ্যাঁ।'

অপ্রকৃতিস্থ এক টুকরো হাসি বেরিয়ে এল রিটার কণ্ঠ থেকে।

'আমরা দু'জন বেঁচে আছি তো?'

অবাক হয়ে চাইল রানা, মেয়েটির দিকে। কিছুই যেন এসে যায় না ওর। হঠাৎ বুঝতে পারল রানা, অ্যাক্সিডেন্ট, স্বামীর মৃত্যু, ড্রাইভারটার মৃত্যু ইত্যাদির কিছুতেই কিছু এসে যায় না রিটার। এসব কথা চিন্তাই করছে না সে, অন্য কোনও অত্যন্ত জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে ভাবছে, যার ফলে এসব ঘটনা কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারছে না ওর মনের উপর। কি এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকতে পারে? ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা?

'কি হয়েছে তোমার, রিটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার হ্যাণ্ডব্যাগটা কোথায়?'

'আশ্চর্য! হ্যাণ্ডব্যাগ খুঁজছ তুমি এখন? মাথা খারাপ হলো তোমার?'

'না। আই অ্যাম অলরাইট। মাথা আমার ঠিকই আছে।' উল্টানো ক্যাডিলাকের দিকে চলল রিটা। 'রানা, একটু সাহায্য করো, আমার হ্যাণ্ডব্যাগটা...'

'রাখো তোমার হ্যাণ্ডব্যাগ। এর চেয়ে জরুরী কাজ পড়ে রয়েছে সামনে,'

বলল রানা অসহিষ্ণু কণ্ঠে। 'পুলিসে খবর দিতে হবে এখন।'

'পুলিস?' রানার দিকে ফিরে অবাক দৃষ্টিতে চাইল রিটা। 'স্ট্রেঞ্জ! পুলিস ডেকে কি হবে? কি লাভ হবে পুলিস ডাকলে?'

'লাভ হোক আর নাই হোক, খবর দেয়ার নিয়ম, খবর দিতে হবে। হলো কি তোমার? দুই-দুইটা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে...'

'পুলিসের ব্যাপারে চিন্তা করবার আগে ব্যাগটা খুঁজে পেতেই হবে আমাকে। অত্যন্ত দামী একটা জিনিস আছে ওটার মধ্যে।' একগুঁয়ে কণ্ঠে বলল রিটা।

'আচ্ছা, আচ্ছা, দিচ্ছি খুঁজে।' এগিয়ে গিয়ে অনেক কষ্টে একটা দরজা খুলে ফেলল রানা।

'আমাকে দেখতে দাও।' কথাটা বলেই রানাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজেই খুঁজতে আরম্ভ করল রিটা। অন্ধকারে পাগলের মত হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, 'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি। ম্যাচ নেই তোমার কাছে?'

ওপাশ দিয়ে পেট্রল ম্যাচটা জ্বেলে ধরল রানা গাড়ির জানালা দিয়ে। পাওয়া গেল ব্যাগ। ক্লাচ-পেডালের সাথে আটকে ছিল।

'এবার শান্তি হয়েছে তো?' বলল রানা রাগত স্বরে। 'এবার চুপচাপ বসে থাকো ওই পাথরের ওপর, খোঁজ করে দেখি লোকজন পাওয়া যায় কিনা।'

রানার পাশে চলে এল রিটা।

'না, রানা। লোকজনও ডাকতে হবে না, পুলিসও ডাকতে হবে না। কুমারের মৃত্যু-সংবাদ কাউকে জানালে চলবে না।'

'তুমি না জানালে কি হবে, যারা জানবার তারা জেনে যাবেই। গাড়ির নাম্বার থেকে...' হঠাৎ থেমে গিয়ে সোজা চাইল রানা রিটার চোখের দিকে। 'কি বলতে চাইছ তুমি! ওর মৃত্যুর কথা কেউ জানলে কি হবে? কেন কাউকে জানানো যাবে না?'

'সব কথা এখন তোমাকে বুঝিয়ে বলা যাচ্ছে না, রানা। সব বলব পরে। ডোন্ট লুক সো উওরিড, রানা। পরে বুঝিয়ে বলব তোমাকে সব কথা।'

'কি যা-তা বকছ!' বলল রানা ধমকের সুরে। 'বসে থাকো এখানে। আমি চললাম পুলিসে খবর দিতে।'

ঘুরতে যাচ্ছিল রানা, থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। ব্যাগের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে নাইন মিলিমিটার ক্যালিবারের একটা ল্যুগার পিস্তল। সোজা রানার বুকের দিকে লক্ষ্য স্থির করল রিটা।

'যেখানে আছ সেখানেই থাকবে তুমি। এক পা নড়বার চেষ্টা কোরো না, মাসুদ রানা!'

ষোলো

চন্দ্রালোকিত রাস্তার উপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল দু'জন দু'জনের চোখের

দিকে।

'বোকামি কোরো না, মাসুদ রানা। আই ওউন্ট হেযিটেট। একবিন্দু দ্বিধা করব না গুলি ছুঁড়তে!' কঠোর শোনাল রিটার কণ্ঠস্বর।

'পাগল হয়ে গেছ তুমি! পিস্তল নামাও নিচে,' বলল রানা।

'পাগল হইনি। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। কেবল তুমি আর আমি, এই দু'জন জানি যে মারা গেছে কুমার। নো বডি এল্স্। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কি সুবিধা আদায় করে নিতে পারি আমি এই খবরটা চেপে গেলে।' বাম হাতে কপালের উপর থেকে একগুচ্ছ চুল সরাল রিটা। ঝিক্ করে উঠল রক্তমুখী নী৹ টা চাঁদের আলোয়। 'তোমার জন্যে এখন দুটো মাত্র পথ খোলা আছে, রানা। হয় সাহায্য করো আমাকে, নয় মৃত্যুবরণ করো। প্লীজ, ইয়োরসেলফ। এক মিনিট সময় দিলাম, তারপর গুলি করব আমি।'

রানা বুঝল, মাথা খারাপ হয়ে গেছে রিটার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে গুলি করতে দ্বিধা করবে ও। বিচিত্র একটা মিশ্র অনুভূতি হলো রানার মধ্যে।

'সময় নেই, নইলে বুঝিয়ে বলতাম তোমাকে সব কথা,' বলল রিটা আবার। 'খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে আমাকে। যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও দিক থেকে গাড়ি এসে পড়তে পারে। আমার হয়ে কাজ করতে রাজি আছ, না টিপে দেব ট্রিগারটা?'

'কি কাজ করতে হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কুমারের জামা-কাপড় খুলে নিয়ে তোমারগুলো পরিয়ে দাও ওকে, যেন ওরা মনে করে তুমিই মারা গেছ অ্যাক্সিডেন্টে।'

'আমি?' খুবই অবাক হলো রানা। বলল, 'কাণ্ডির সবাই চেনে আমাকে। ওরা একনজর...'

'ডু হোয়াট আই সে। এসব ব্যাপারে তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক না ঘামালেও চলবে। কাপড় পরিয়ে গাড়িতে ওঠাবে ওকে, তারপর আগুন ধরিয়ে দেবে গাড়িতে।'

'অসম্ভব! আমি পারব না। দেখো, রিটা...'

'পারতেই হবে। নইলে আমার বাধ্য হয়ে খুন করতে হবে তোমাকে। সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন না করলে হাতছাড়া হয়ে যাবে টাকাগুলো।'

ভাবতে পারছে না রানা। মাথায় আঘাত লেগে মাথাটা কেমন যেন ঘোলা হয়ে গেছে ওর। তবু একবার আবছাভাবে চিন্তা করল সে পিস্তলটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে কিনা। আবছাভাবেই বুঝতে পারল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে রিটা ওর উপর, একটু এদিক-ওদিক দেখলে গুলি করবে। রিটার এক হাতের মধ্যে পৌঁছবার আগেই গুলি করবে ও নির্দ্বিধায়।

'কাজেই বুঝতে পারছ,' বলল রিটা, 'কোনও রকম কৌশলের সুযোগ নেই। যা বলছি, তাই করতে হবে তোমাকে। মিছেমিছি সময় নষ্ট না করে এগোও। হারি আপ, রানা।'

'কিন্তু কেন? কেন শুধু শুধু...'

'বলব তোমাকে, রানা। চাই কি টাকার ভাগও পেতে পারো তুমি। অনেক

টাকা। কিন্তু এখন সময় নয়, সব বলব তোমাকে পরে। এখন বলো, আমার প্রস্তাবে রাজি আছ?' একটুকরো ভয়ঙ্কর হাসি লেগে আছে রিটার ঠোঁটে। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো যেন রক্তপিপাসায়। এত সৌন্দর্যের মধ্যে এতটা ভয়ঙ্করত্ব থাকতে পারে কল্পনাতেও ছিল না রানার। ট্রিগারের উপর নড়ে উঠল আঙুলটা। রানা বুঝল, ঠাট্টা নয়, এক্ষুণি গুলি করবে রিটা।

'রাজি।'

ফোঁস করে আটকে রাখা দম ছাড়ল রিটা। নিষ্ঠুর হাসিটা মিলিয়ে গেল ঠোঁট থেকে।

'তাহলে জলদি করো।'

ঘেমে উঠেছে রানা। কপালের ঘাম মুছে এগিয়ে গেল সে মৃতদেহটার দিকে। প্রথমে লোকটার সমস্ত জামা-কাপড় খুলে ফেলল। বিশেষ অসুবিধে হলো না, হাত-পা শক্ত হয়ে যায়নি এখনও। তারপর নিজের জামা-কাপড় খুলে পরে ফেলল কুমারের জামা-কাপড়। পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে রিটা রানার প্রতিটি কার্যকলাপ। কুমারের গায়ে চড়ানো হলো রানার জামা-কাপড়। প্রায় একই রকম দু'জনের দেহের গঠন, একই সমান লম্বা-চওড়া, কিন্তু কুমারের পা দুটো রানার চেয়ে অনেক বড়।

'আমার জুতো ওর পায়ে লাগবে না কিছুতেই।'

'অল রাইট। জুতো জোড়া না বদলালেও চলবে। জুতো দেখে কেউ চিনতে পারবে না ওকে। এবার ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসিয়ে দাও।'

টেনে নিয়ে গেল মৃতদেহটাকে রানা সামনের দরজার কাছে। বহু কষ্টে তুলে দিল ড্রাইভিং সীটে। স্টিয়ারিং হুইলের উপর হুমড়ি খেয়ে রইল দেহটা।

'কারবুরেটর পাইপটা ঢিল করে দিয়ে একটা রুমাল জড়াও জায়গাটায়। রুমালটা পেট্রলে ভিজে গেলে আগুন ধরিয়ে দাও ওখানে।'

'এই কাজের জন্যে জেল খাটতে হতে পারে, তা জানো?'

'জানি। কিন্তু সে-সব আমি সামলাব, তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবে না। যা বলি তুমি তাই করে যাবে কেবল।'

রানার মাথাটা চলতে চাইছে না কেন? নিজেকে কেমন যেন বোকা বোকা লাগছে ওর। বুঝতে পারছে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না এর বিরুদ্ধে। এটা কি মাথায় আঘাত পাওয়ার ফল? আদেশমত কাজ করে গেল রানা। আগুন ধরিয়ে দিয়েই লাফিয়ে সরে গেল কয়েক হাত।

'চলে এসো,' বলল রিটা। 'কেউ এসে পড়বার আগেই সরে পড়তে হবে।'

একটা পাহাড়ী পথ ধরে দ্রুত হেঁটে চলেছে রিটা। রানাও চলেছে পিছু-পিছু। যতক্ষণ না আগুনের লেলিহান শিখা চোখের আড়াল হলো প্রায় দৌড়ে চলল ওরা। রানা যে কেন যাচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছে না সে। রিটাকে অনুসরণ করাই যেন তার একমাত্র কাজ বলে ধরে নিয়েছে সে। নিজস্ব চিন্তা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে।

'দাঁড়াও।'

থমকে দাঁড়াল রানা। ভয়ে ভয়ে চাইল রিটার হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে। মুচকে হাসল রিটা।

'ভয় নেই, মারব না। তোমাকে আমার দরকার আছে। আশ্চর্য! কত কম চিনি তোমাকে আমি, অথচ আজ থেকে একসাথে কাজ করতে হবে আমাদের, বিশ্বাস করতে হবে পরস্পরকে, থাকতে হবে একসাথে। কেমন চরিত্রের লোক তুমি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা কতখানি, বিপদের সময় মনের জোর কেমন, কিছুই জানি না—তবু চলতে হবে তোমারই সঙ্গে।'

'আমাকে কুমার বলে চালাবার মতলব আঁটছ বোধহয়?'

'না। নটরাজ হিক্কা হিসেবে চালাব তোমাকে।'

'ইনি আবার কে হলেন?'

'সবই বলব তোমাকে সংক্ষেপে। আরেকজনের অভিনয় করতে হবে তোমাকে। বিশ লাখ টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে আগামী তিনদিনের মধ্যে। অর্ধেক তোমার। যদি থাকতে না চাও, জোর করে ধরে রাখব না তোমাকে—পাওনা টাকা দিয়ে বিদায় করে দেব। যদি আমার সাথে থাকতে চাও তাহলে সবই তোমার। আমিও। চলো হাঁটি, এদিকে লোকবসতি পাওয়া যেতে পারে। হাঁটতে হাঁটতেই বলছি সবকথা।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রায় সমস্ত তথ্য জানা হয়ে গেল রানার। মৃত লোকটার নাম রত্নসূর্য কুমারস্বামী। পাঁচটা মস্ত জুয়ার আড্ডার মালিক। গল, কলম্বো, জাফনা, বম্বে এবং ক্যালকাটায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ক্যাসিনো তৈরি করেছে কুমারস্বামী। তৃতীয় শ্রেণীর গুণ্ডা থেকে নিজেকে উন্নীত করেছে সম্মানিত কোটিপতির আসনে। নিজে সে মনেপ্রাণে গুণ্ডা, প্রত্যেকটি ক্যাসিনোর ম্যানেজারকেও বেছে নিয়েছে সে ভয়ঙ্কর প্রতাপশালী গুণ্ডা দেখে। যে-মুহূর্তে ওরা জানতে পারবে যে মারা গেছে কুমারস্বামী—শকুনের মত কামড়াকামড়ি করে দখল করে নেবে সবকিছু, একটি কানাকড়িও জুটবে না রিটার কপালে। কিন্তু যতক্ষণ ওরা জানছে যে বেঁচে আছে কুমারস্বামী, কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না। সেই সুযোগেই যতটা পারে হাতিয়ে নিতে চায় রিটা নিজের পাওনা অংশ।

'এই হচ্ছে ব্যাপার। একা আমার দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। তোমার মত একজন চমৎকার ফাইটার যদি পাশে থাকে তাহলে অনেক সহজ হয়ে যাবে কাজটা। অর্ধেক টাকা তোমার। কোনও ঝুঁকি নেই। আমি যা করতে বলব কেবল তাই করবে তুমি, দেখবে, কিচ্ছু ঝামেলা হবে না। এভরিথিং উইল বি অল্ রাইট।'

'কিন্তু কুমারস্বামীর মৃত্যুর কথাটা চাপা দেবে কি করে? কয়দিন পারবে চেপে রাখতে?' এছাড়া আর কোনও প্রশ্ন উদয় হলো না রানার মনে।

'তিন-চার দিন চাপা থাকলেই যথেষ্ট। দ্যাটস্ অল উই নীড। আসলে প্রত্যেকটা ক্যাসিনোতে ক্যাশ রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয় প্রচুর টাকা, যে-কোনও সময় দরকার হতে পারে বলে। গল্-এর ক্যাসিনো পৃথিবী-বিখ্যাত। কোটিপতিরা এসে ভিড় জমায় এখানে, লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা হয় প্রত্যেকদিন। তাই বিশ লক্ষ টাকা রিজার্ভ রাখা আছে আয়রন সেফে। ম্যানেজার জে. সি. হুলুগালের অধীনে।

জাফনার ক্যাসিনো চালায় নটরাজ হিক্কা।' একটা বড়সড় পাথর পেয়ে বসে পড়ল রিটা, রানাকেও ইঙ্গিত করল বসবার জন্যে। বলল, 'কুমার আসলে কলকাতায় চলেছিল। হঠাৎ ওর কানে গেল যে জুয়া খেলতে গিয়ে অনেক টাকা হেরে গেছে হুলুগাল, রিজার্ভ থেকে টাকা নিয়ে মেকআপ করতে চেষ্টা করছে সে বেশ কিছুদিন যাবৎ। মান্নার পর্যন্ত চলে গিয়েছি আমরা তখন, তাছাড়া কলকাতায় যাওয়া খুব জরুরী, কাজেই হিক্কাকে গল্-এ পাঠাবে বলে স্থির করল সে। হুলুগালকে টেলিফোনে জানিয়ে দিল যে হিক্কা যাচ্ছে গল্-এ, যেন তাকে সমস্ত অ্যাকাউন্টস দেখানো হয়। কিন্তু নটরাজ হিক্কাকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। সে নাকি কার সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে বাড়িতে পড়ে আছে। ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী, কণ্ট্রোল না করলে সব টাকা নষ্ট করে বসতে পারে হুলুগাল। তাই কলকাতার ট্রিপ ক্যান্সেল করে নিজেই রওনা হয়ে গেল কুমার গলের উদ্দেশে। হিক্কা যে যাচ্ছে না, ও নিজেই যাচ্ছে, একথা হুলুগালকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি কুমার। পথে আমার অনুরোধে কাণ্ডি স্টেডিয়ামের খেলা দেখতে রাজি হয়েছিল সে। তার পরের ঘটনা তুমি সবই জানো।' রানার হাঁটুর উপর একটা হাত রাখল রিটা, 'শোনো, হুলুগাল জানে না যে কুমারই চলেছিল গল্-এ হিক্কার বদলে। এবং হুলুগাল নামই শুনেছে কেবল, জীবনে কখনও দেখেনি হিক্কাকে। দিস্ ইজ দা পয়েন্ট। এই সুযোগটাই গ্রহণ করব আমরা। তুমি যাবে সেখানে ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ নটরাজ হিক্কা সেজে। টাকাগুলো হাতে এসে গেলেই কেটে পড়ব আমরা। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'কিন্তু কাজটা অন্যায় হয়ে যাচ্ছে না?'

'কিছুতেই না। ওই টাকায় হক আছে আমার। অন্তত হুলুগালের চেয়ে আমার দাবিই বেশি। সব টাকা কুমারের। আর ক'টা দিন পরে যদি মরত তাহলে আমি তোমার সাহায্য ছাড়াই আইনসম্মত উপায়ে দখল করতাম সব ক'টা ক্যাসিনো। কিন্তু সে-সব কথা ভেবে আর কি হবে, যা হবার হয়ে গেছে। তবে টাকাগুলো আমার চাই-ই!'

'এত টাকা নিয়ে কেটে পড়তে পারব আমরা?'

'হোয়াই নট? একটু মনের জোর দরকার। ব্যস, সব টাকা আমার।'

'আর আমি···?'

'ও, হ্যাঁ, অর্ধেক টাকা তোমাকে দিয়ে দেব। ঠিক দেব। প্রমিজ।'

রানা বুঝল টাকা পেলে একটি পয়সাও দেবে না ওকে রিটা। বলল, 'তুমি দেবে ঠিকই। কিন্তু অত টাকা পেয়ে আমি যদি তোমাকে না দিই? তার চেয়ে তুমি যখন কুমারের স্ত্রী, তখন সমস্ত সম্পত্তি তো পাচ্ছই, কেন মিছেমিছি এই সব ঝামেলার মধ্যে যাচ্ছ? বরং কোন ভাল উকিলের পরামর্শ···'

'ও, আসল কথাই বলা হয়নি তোমাকে। কুমারের সঙ্গে এই বছরখানেক হলো পরিচয় হয়েছে আমার বম্বেতে। সিনেমাতে ঢোকার চেষ্টা করছিলাম আমি তখন। সেই সময় পরিচয়, ফিল্ম করছে, নায়িকার পার্ট দেবে, এসব বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিয়ে করেছিল ও আমাকে। অত্যন্ত স্বার্থপর, বদরাগী, নিষ্ঠুর লোক—কিন্তু অজস্র

টাকা। তাই টিকে গেলাম আমি। মাস তিনেক আগে হঠাৎ টের পেলাম ঠকিয়েছে আমাকে ও। দ্বিতীয় পক্ষের বউ ছিল ওর। প্রথম পক্ষের একটা মেয়েও আছে। সমস্ত সম্পত্তি মেয়ের নামে উইল করে দিয়েছে সে। দ্বিতীয় পক্ষের বউ স্বয়ং এসে উপস্থিত হলো একদিন। জানতে পারলাম বিয়ের নকল অনুষ্ঠান করে ফাঁকি দেয়া হয়েছিল আমাকে—আইনসম্মত উপায়ে বিয়েই হয়নি। তৃতীয় পক্ষের বউ-ও নই আমি ওর। ভয় দেখালাম ওকে নানানভাবে। শেষে রাজি হলো দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আমাকে আইনসম্মতভাবে বিয়ে করবে। দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে সে ঠিকই, কিন্তু আমাদের বিয়ে হয়নি এখনও। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কাজটা সেরে ফেলবে ঠিক করেছিল ও। কিন্তু তার আগেই তো শেষ হয়ে গেল। এখন ওর ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে এবং যত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আছে সব পাবে ওর একমাত্র কন্যা—অবশ্য যদি আদায় করতে পারে। আমি কিছুই পাব না। ওর কর্মচারীরা সবাই জানে যে আসলে আইনত আমি ওর বউ নই। ওর সম্পত্তিতে আমার অধিকার নেই। কিন্তু আমি আমার দাবি ছাড়ব কেন? সোজা পথে হবে না যখন, বাঁকা পথেই আদায় করে নেব।' উঠে দাঁড়াল রিটা। 'সবটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছ তো? এবার চলো, এগিয়ে দেখি সাহায্য পাওয়া যায় কিনা কারও কাছ থেকে।'

চলল রানা রিটার পিছন পিছন।

সতেরো

কিছুদূর গিয়েই একটা হ্যারিকেনের আলো দেখতে পেল ওরা। আবছাভাবে একটা কুটির দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গেল ওরা সেইদিকে।

'তুমি মাথায় ভয়ানক আঘাত পাওয়ার ভান করবে। লিভ দা টকিং টু মি! কথা যা বলবার আমিই বলব।'

'ভান করতে হবে না। সত্যিসত্যিই আর সোজা করে রাখতে পারছি না মাথাটা,' বলল রানা করুণ কণ্ঠে।

'তাহলে এক কাজ করো। এখানেই শুয়ে পড়ো, আমি লোক ডেকে আনছি,' বলল রিটা। সাথে সাথেই যোগ করল, 'পালাবার চেষ্টা কোরো না। তাহলে সব দোষ চাপিয়ে দেব তোমার কাঁধে। দুই দিনেই খুনের দায়ে ধরা পড়বে পুলিসের হাতে। সাবধান!'

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা মাটিতে। মিট মিট করছে অসংখ্য তারা সারা আকাশময়। ম্লান চাঁদ ঝিমুচ্ছে একপাশে। চলে গেল রিটা ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে পিস্তলটা ঢুকিয়ে রেখে। আধ মিনিট পর হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রানা। কি করছে সে এখানে শুয়ে শুয়ে? কে সে? কি করতে এসেছিল সে কাণ্ডিতে? এই সব ঝামেলার মধ্যে সে জড়াচ্ছে কেন নিজেকে? এর থেকে কি উদ্ধার পাওয়ার কোন রাস্তা নেই? অ্যাক্সিডেন্ট পর্যন্ত সব কথা পরিষ্কার মনে পড়ল রানার—তার আগের

কিছু কিছু কথাও আবছাভাবে মনে পড়ল, কিন্তু আর কোনও কথাই মনে আনতে পারল না সে। স্মৃতিবিভ্রাট ঘটল নাকি ওর? কে সে? কি কাজ করে সে? সে কি সত্যিই কুস্তিগীর একজন? তাহলে ভুঁড়ি নেই কেন? সবকিছু গোলমাল পাকিয়ে গেল রানার মাথার মধ্যে।

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই আবার শুয়ে পড়ল রানা। এগিয়ে আসছে কারা যেন।

'...খুব সম্ভব মারাত্মক কিছু না। হঠাৎ আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, ধকলটা সামলে উঠতে পারেনি এখনও,' বলল রিটা।

'কোনও চিন্তা করবেন না আপনি। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি,' বলল একটি পুরুষ কণ্ঠ।

রানাকে তুলে দাঁড় করাল শক্ত-পোক্ত দুটো হাত। চেয়ে দেখল বুড়ো একজন লোক, কিন্তু গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে। রানার একটা হাত নিজের কাঁধের উপর দিয়ে নিয়ে বলল, 'বেশিদূর যেতে হবে না। এই সামনেই আমার ঘর। আমার উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চলে আসুন। কোনও কষ্ট হবে না।'

আরেকটা হাত ধরল রিটা। বৃদ্ধের অনুকরণে নিজের কাঁধের উপর তুলে নিল হাতটা।

ঘরের ভিতর একটা খাটিয়ায় শুইয়ে দেয়া হলো রানাকে। হ্যারিকেনের আলোয় পরীক্ষা করল বৃদ্ধ রানাকে। বলল, 'ঠিকই। ফুলে আছে মাথাটা। জোর মার মেরেছে ব্যাটারা একে। তা এখন কি করা? আমাদের ডাক্তারবাবুকে ডাকব?'

'টেলিফোন আছে না কাছাকাছি কোথাও?' জিজ্ঞেস করল রিটা।

'কাছাকাছি মানে এই বরাবর পাহাড়ী রাস্তায় গেলে মাইল খানেক। কেন? খবর দেবেন কাউকে?'

'হ্যাঁ।' বসে পড়ল রিটা খাটের একপাশে। একশো টাকার একটা নোট বের করল ব্যাগ থেকে। 'আমাদের গাড়ি চুরি হয়ে গেছে। অথচ আজই পৌঁছানো দরকার গল্-এ। আপনি কি একটু কষ্ট করে ট্রাঙ্ককল করে একটা খবর দিতে পারবেন আমাদের লোকের কাছে? ভাঙতি নেই আমার কাছে, ট্রাঙ্ককলের খরচ বাদে যা বাঁচবে আপনার।'

'পারব না কেন? আপনাদের কোন উপকারে আসতে পারলে খুশিই হব আমি।'

'অনেক ধন্যবাদ,' টাকাটা এগিয়ে দিল রিটা। হাসল মিষ্টি করে। 'মাথায় আঘাত না পেলে অবশ্যি মি. হিক্কাই যেতে পারতেন টেলিফোন করতে। আপনার কষ্ট হবে...'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না!' মাথা এবং এক হাত নেড়ে আশ্বাস দিল বৃদ্ধ। টাকাটা নিয়ে ভাঁজ করে রাখল খাকি কোর্তার বুক পকেটে। 'কোন্ নাম্বারে রিং করতে হবে বলুন শুধু। পুলিসেও কি সেই সাথে খবর দিয়ে দেব?'

'আমি একে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছতে চাই আগে। গল্ থেকে পুলিসে রিপোর্ট করব আমরা। ফোন নাম্বারটা হচ্ছে গল্—১২৩৪—মনে থাকবে?'

'মনে থাকবে।'

'মিস্টার জে. সি. হুলুগালকে চাইবেন এই নাম্বারে। ওকে বলবেন: মিস্টার নটরাজ হিক্কা ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনায় পড়ে আটকে গেছেন এখানে। এক্ষুণি যেন সে গাড়ি নিয়ে পেরাদেনিয়ার পথে রওনা হয়ে যায়। রাস্তার উপর অপেক্ষা করবেন তিনি তার জন্যে।'

কথাগুলো একবার আবৃত্তি করে শুনিয়ে রওনা হয়ে গেল বৃদ্ধ অবিলম্বে।

'রাস্তার উপর পোড়া গাড়ি দেখলে তো বুঝে ফেলবে হুলুগাল,' বলল রানা লোকটা বেরিয়ে যেতেই। 'তাছাড়া গাড়ি চুরি আর মাথায় আঘাতের কথা বললে আবার পুলিসি তদন্তের পাল্লায় পড়তে হবে আমাদের।'

'ওসব তোমার ভাবতে হবে না,' বলল রিটা শাসনের ভঙ্গিতে। 'আমরা আধ মাইল হেঁটে এগিয়ে থাকব। পোড়া গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতেই দেব না হুলুগালকে। এখন শোনো, ঘণ্টা তিন-চারেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে হুলুগাল। অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক ও। বি কেয়ারফুল। খুব সাবধান থাকতে হবে তোমাকে। কোনও রকম প্রশ্ন করবার সুযোগ দিয়ো না ওকে। ও যা জিজ্ঞেস করবে, আমি উত্তর দেব। তুমি এমন ভাব দেখাবে, যেন এত দুর্বল বোধ করছ যে কথা বলবারও শক্তি নেই। বুঝলে?'

মাথা নাড়ল রানা। উঠে বসল বিছানার উপর বালিশে হেলান দিয়ে।

'প্রথমেই যে ব্যাপারটায় সন্দিহান হয়ে উঠবে হুলুগাল, সেটা হচ্ছে আমি তোমার সঙ্গে কেন। নটোরিয়াস হিক্কা হিসেবে তুমি পরিচিত। ও ভাববে, তোমার মত একটা বিশ্ববিখ্যাত চরিত্রহীন লোকের সঙ্গে আমাকে একা ছাড়ল কেন কুমার। টেলিফোনে কুমারের ব্যাপারে কলম্বো ম্যানেজারের সাথে আলাপ করবার চেষ্টা করবে ও খুব সম্ভব। ওরা শুধু এইটুকুই বলতে পারবে যে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছে কুমার। যদি বেশি সন্দেহ হয় তাহলে হয়তো কলকাতা আর বোম্বেতে টেলিগ্রাম, এমন কি টেলিফোন করবে। কিন্তু তাতেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সবাই জানে মোটরগাড়ি ছাড়া আর কিছুতেই চড়ে না কুমার, বরাবর অ্যাডামস্ ব্রিজের ফেরি পার হয়ে ভারতে যায় সে, ফিরেও আসে একই রাস্তায়। কলকাতা পৌঁছতে ওর চারদিন লাগে, কাজেই চারদিনের আগে ওর সম্পর্কে কেউ কিচ্ছু বলতে পারছে না নিশ্চিত করে। চারদিনের মধ্যে কাজ সেরে পগার পার হয়ে যাব আমি।'

'সহজ হবে না,' বলল রানা এতক্ষণ পর।

'খুব সহজ হবে। তিনঘণ্টার মধ্যেই হিক্কা আর কুমার সম্পর্কে হাফেজ বানিয়ে ফেলব আমি তোমাকে। তুমি যদি কেবল সন্দেহের বাইরে থাকতে পারো তাহলে আর চিন্তা নেই কোন। কথাবার্তার ভার আমার উপর ছেড়ে দেবে, তাহলে দেখবে কাজটা কত সহজ।'

শক্ত মত লাগায় হিপ পকেটে হাত দিয়ে একটা সিগারেট কেস বের করল রানা। অবাক হয়ে দেখল ওটা কুমারের সোনার সিগারেট-কেস। আবার হিপ পকেটে রেখে দিল রানা কেসটা। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইল রানা। চাঁদের আলোয় জলপ্রপাত দেখা যাচ্ছে একটা।

রানার চিবুক ধরে মুখটা নিজের দিকে ফিরাল রিটা। ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। একটা হাত রাখল রানার হাতের উপর।

'নাউ, লিসেন। প্রথমে কুমারের কথা বলে নিই, তারপর হিক্কার কথা বলব। খুঁটিনাটি অনেক কিছু বলে যাচ্ছি, মনে রাখার চেষ্টা করো।'

টেলিফোন নাম্বার, বাড়ির ঠিকানা, কেমন বাড়ি, কি কি গাড়ি আছে, বদভ্যাস, ক্যাসিনো, কি ধরনের কি কাঠের টেবিল, কতজন কর্মচারী, মাসিক আয়, বেতনের জন্যে কত খরচ, ইত্যাদি প্রতিটা খুঁটিনাটি ব্যাপার বলে গেল রিটা গড়গড় করে। নটরাজ হিক্কা সম্পর্কেও অসংখ্য তথ্য জানা হয়ে গেল রানার। প্রশ্ন করে করে পরীক্ষা করে দেখল রিটা মনে রাখতে পারছে কিনা রানা সব কথা।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা রিটার, কিন্তু মনের ভিতর অদ্ভুত একটা বিতৃষ্ণা দানা বেঁধে উঠছে, স্পষ্ট অনুভব করল রানা। স্বার্থ। অস্বাভাবিক স্বার্থপর স্ত্রীলোক এই রিটা। করতে পারে না এমন কাজ নেই।

কথা বলছে ওরা, এমনি সময় দরজার কাছে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঝট্ করে শুয়ে পড়ল রানা। ঘরে প্রবেশ করল বৃদ্ধ।

'লাইন পেয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রিটা।

'হ্যাঁ, আসছে লোকটা।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর রানার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধ রিটাকে, 'ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি উনি?'

'মনে হচ্ছে,' বলল রিটা। 'খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে বেচারা মার খেয়ে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ অস্বস্তিকর সময় কাটল। তারপর বৃদ্ধ বলল: 'লোকটা বলল, ঘণ্টা তিনেক লাগবে এখানে পৌঁছতে। ততক্ষণ বিশ্রাম করুন আপনারা। আমি শুয়ে পড়ব।'

'নিশ্চয়ই। আপনি কেন কষ্ট করে জেগে থাকবেন? আমরা আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রওনা হয়ে যাব। আপনাকে আর জাগাব না। বাতিটা নিয়ে যেতে পারেন, আমাদের অসুবিধে হবে না কোন। আপনার সাহায্যের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'না, না। এটা তো আমার কর্তব্য। আচ্ছা, আসি। আর কিছু লাগবে না তো আপনাদের?'

'না,' আরও একশো টাকার নোট বের করল রিটা। 'তবে একটা ব্যাপারে অনুরোধ করব আপনাকে। এই গাড়ি চুরি কিংবা মিস্টার হিক্কার দুর্ঘটনা, আমাদের এখানে আসা, এইসব ব্যাপারে যদি কাউকে কিছু না বলেন…মানে, ব্যাপারটা আমাদের খুবই ব্যক্তিগত…'

'ঠিক আছে। এর জন্যে আবার টাকা কেন?' টাকাটা রিটার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলল বৃদ্ধ। 'আমি বোবা বনে যাব। দেখিইনি আপনাদের। চিনিই না।'

হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে পাশের একটা ঘরে ঢুকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল বৃদ্ধ।

আঠারো

রানা ভেবেছিল নামকরা গুণ্ডা যখন, দুর্দান্ত চেহারা হবে জে. সি.হুলুগালের। কিন্তু ছিপছিপে লম্বা এক ছোকরা নামল একটা সাদা বুইক থেকে। পরনে দামী স্যুট, অভিজাত দর্জির দোকান থেকে তৈরি। ব্যাক ব্রাশ করা কোঁকড়া চুল। চমৎকার প্রতিভাদীপ্ত কপাল। ঠোঁটের দুই কোণ নেমে আছে নিচের দিকে, বেপরোয়া একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তার ফলে।

'হ্যাল্লো!' বলল সে রিটাকে দেখেই। 'আপনাকে তো আশা করিনি!'

'ভেবেছিলাম অবাক করে দেব তোমাকে। কিন্তু তা আর হলো কোথায়। বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে গেল পথে।'

'ইনি কে? মিস্টার নটোরিয়াস্ হিক্কা?'

'হ্যাঁ। ওর চেয়ে নটোরিয়াস্ আরেকজনের পাল্লায় পড়েছিল বেচারা। এসো হিক্কা, উঠে পড়ি।'

রানা বুঝল, তীক্ষ্ণ, বৈরি ভাবাপন্ন দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে হুলুগাল। রিটার কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠে পড়ল সে পিছনের সীটে। পাশে রিটা। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসতে বসতে আবার প্রশ্ন করল হুলুগাল রিটাকে, 'আপনি হঠাৎ কোত্থেকে? আপনাকে তো আশা করেনি, ম্যাডাম?'

'কুমার বোধহয় মনে করছে আমি সাথে থাকলে কলকাতার রোমান্স ঠিক জমবে না, তাই একাই চলে গেছে।' মুচকি হেসে রসিকতার চেষ্টা করল রিটা, কিন্তু জমল না। তাই প্রায় সাথে সাথেই যোগ করল, 'আসলে হিক্কার কাজের ব্যাপারে আমার গল্-এ থাকা দরকার বলে বোধ করেছে কুমার।'

'কিন্তু মি. কুমারস্বামী তো আপনার আসবার কথা কিছু বলেনি?'

'হিক্কার সাথে আমাকে গল্-এ পাঠানোটা ওর লাস্ট মিনিট ডিসিশন। কেন, আমি আসায় অসুবিধে হবে তোমার খুব?'

টিটকারিটা হজম করে নিল হুলুগাল। বলল, 'যাক, গাড়ি চুরির ব্যাপারটা ঘটল কি করে? মানে, কি হয়েছিল?'

'বিচ্ছিরি ব্যাপার। একটা লোক কাকুতি-মিনতি করল যেন গামপোলা পর্যন্ত একটা লিফট দিই ওকে। আমি চালাচ্ছিলাম। নির্জন একটা জায়গায় এসেই পিছন থেকে হিক্কার মাথায় আঘাত করে বসল লোকটা। গাড়ি থামাতে বাধ্য করল আমাকে। তারপর আমাদের টেনে-হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে।

'পুলিসে খবর দিয়েছেন?'

'না। গল্-এ গিয়ে তারপর জানাব ঠিক করেছি।'

'ঠিক আছে, ইন্সপেক্টর সেনানায়েককে লাগিয়ে দেয়া যাবে। খবরের কাগজ-ওয়ালাদের হাত থেকে বাঁচা যাবে তাহলে। তা, লোকটা দেখতে ছিল কেমন?'

'অনেকটা হিক্কারই মত। গাড়িতে উঠে বসবার পর কার্টসি লাইটে একনজর দেখেছি মাত্র। মনে হলো কারও সাথে মারামারি করে এসেছে লোকটা। চকলেট রঙের টেট্রেন স্যুট পরা ছিল।'

'এই রকম একটা লোককে গাড়িতে তুলতে গেলেন কেন?'

খুবই বিপদগ্রস্ত মনে হচ্ছিল লোকটাকে। ভয়ে কাঁপছিল। আমরা মনে করলাম ওদিক দিয়েই যাচ্ছি যখন, আর পিছনের সীটটাও খালি রয়েছে, কাজেই নিয়ে নিই। প্রথম দর্শনে খুব নিরীহ লোক মনে হয়েছিল। হি ডিডন্ট লুক লাইক এ পাইরেট।'

'ঠিক কোন্ জায়গাটায় উঠেছিল লোকটা?'

'কাণ্ডি শহরের শেষ সীমায়।'

'অলরাইট। সব ঠিক হয়ে যাবে। পাওয়া যাবে ক্যাডিলাক। ওটা খোয়া গেলে খেপে যাবেন মি. কুমারস্বামী। দুই দিনের মধ্যে বের করে ফেলব এই বাছাধনকে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। বিটুমেন সারফেস করা রাস্তার উপর দিয়ে প্রায় উড়ে চলল সিক্সটি-সেভেন মডেলের বুইক গাড়িটা। আশি মাইল স্পীডে চলছে গাড়ি, অথচ এতটুকু অতি মনোযোগ নেই হুলুগালের, যেন ত্রিশ মাইল বগে চলেছে ওরা। রানা বুঝল দেখতে যেমনই হোক, স্নায়ুর জোর আছে লোকটার।

'খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক আপনি, তাই না?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল হুলুগাল রানাকে।

'হ্যাঁ। এত গম্ভীর লোক পাওয়া মুশকিল।'

'আপনার কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু সামনাসামনি পরিচয়ের সুযোগ হয়নি কখনও।'

এ কথার কোনও জবাব দিল না রানা। এবার রিটার সাথে গল্প জমাবার চেষ্টা করল হুলুগাল। আসলে তথ্য বের করবার চেষ্টা করছে ও।

'আপনাদের দু'জনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল, আর আপনি কিছু বললেন না?'

'একা মেয়েমানুষ, কি করব আমি? আই জাস্ট স্ক্রীম্ড, অ্যাণ্ড নোবডি কেম টু হেল্প। এদিকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে হিক্কা।'

'আমার ধারণা ছিল আপনার ব্যাগের মধ্যে সবসময় পিস্তল থাকে একটা। ওটাতেও কাজ হলো না কিছু?'

একটু যেন ঘাবড়ে গেল রিটা। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বলল, 'পিস্তলটা ছিল না এবার আমার সঙ্গে।'

'তাই নাকি? আশ্চর্য! এই প্রথম জানলাম ওটা ছাড়াও চলাফেরা করেন আপনি।' টিটকারির ভঙ্গিতে বলল হুলুগাল। একটু হেসে বলল, 'হয় এ রকম। যেদিন ছাতা রেখে বেরোবেন, দেখবেন, ঠিক সেইদিনই বৃষ্টি হবে।'

রানা একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারল, এই লোকটা ওদের দুর্বলতা খুঁজছে। বিপদের গন্ধ পেয়েছে সে—ভয়ানক সন্দিহান হয়ে উঠেছে। রিটার হাঁটুর উপর হাত রাখল রানা। ওর দিকে চাইতেই আঙুল দিয়ে ব্যাগটার দিকে দেখাল, তারপর আঙুলটা ঠেকাল নিজের বুকে। বুঝতে পারল রিটা ইঙ্গিতটা। হুলুগালকে আড়াল

করে সাবধানে ব্যাগ খুলে পিস্তলটা পাচার করে দিল রানার কোটের পকেটে। কারণ গাড়ি থেকে নামবার সময় যদি রিটার ব্যাগের মধ্যে ঢলঢল করতে থাকে পিস্তল, তাহলে অসুবিধে আছে।

'কাণ্ডি গিয়েছিলেন কি করতে?' আবার জিজ্ঞেস করল হুলুগাল।

'ব্যাপার কি?' এবার কথা বলল রানা। 'উকিলের মত জেরা আরম্ভ করেছেন কেন? এত প্রশ্ন কেন আপনার মনের মধ্যে?'

তিন সেকেণ্ড চুপ করে থাকল হুলুগাল, তারপর বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আমি কথা একটু বেশিই বলি। আপনার যে খারাপ লাগছে সেটা বুঝতে পারিনি।'

এরপর চুপচাপ কাটল অনেকক্ষণ। গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল হুলুগাল। চোখ বন্ধ করে সীটে হেলান দিয়ে বসে রইল রানা।

'ওই দেখা যাচ্ছে গল্!' বলল রিটা।

সমুদ্রের ধার দিয়ে চলেছে ওরা। দূরে অনেক বাতি দেখতে পেল রানা। এত রাতেও লাল, নীল, সবুজ নিয়ন সাইনগুলো জ্বলছে নিভছে। এই হচ্ছে অভিজাত কোটিপতিদের বিলাস-বন্দর। দ্রুত এগিয়ে আসছে শহরটা রানার দিকে। প্রকাণ্ড সব প্রাসাদ দেখা গেল আবছাভাবে। বন্দরটিকে স্বপ্নের দেশ মনে হলো ওর।

'চমৎকার!' বলল রানা।

'ওই যে দেখা যাচ্ছে ক্যাসিনো। ওই যে বামধারে আলোগুলো সাগরের মধ্যে চলে গেছে—ওটা। আধ মাইল ঘেরাও করা কম্পাউণ্ড নিয়ে আমাদের গোল্ডেন ক্যাসিনো,' বলল রিটা। 'চমৎকার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, তাই না?'

'আমার পেছনে লক্ষ কোটি টাকা ঢাললে আমাকেও অমন চমৎকার দেখাবে,' বলল হুলুগাল বিরস কণ্ঠে।

বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা একটা প্রকাণ্ড লোহার গেটের সামনে। কালো ইউনিফরম পরা দু'জন সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে গেটের দুই ধারে। মুখের ভাবে কিছুমাত্র পরিবর্তন হলো না, খটাস করে বুট ঠুকে স্যালুট করল দু'জন একসাথে।

আঁকাবাঁকা আধ মাইল লম্বা রাস্তা, ডাইনে-বাঁয়ে কয়েকটা শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে গেছে তার থেকে, কোনটা গেছে সুইমিং পুলে, কোনটা বোটানিক্যাল গার্ডেন, কোনটা বা চিড়িয়াখানায়। মেইন রোড শেষ হয়েছে সমুদ্রের ধারে গিয়ে। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝেই ফুলের বাগান, প্রত্যেকটি গাছ নানান রঙের বাতি দিয়ে সাজানো। বাগান দেখতেও আসে অনেক লোক, তারপর ঢোকে রেস্টুরেন্টে কিংবা বারে, সবশেষে ক্যাসিনো দেখতে গিয়ে পকেট খালি করে ফিরে যায়।

একটা মোড় ঘুরতেই আলোকোজ্জ্বল গোল্ডেন ক্যাসিনো চোখে পড়ল রানার। আরব্যোপন্যাসের রাজপ্রাসাদ যেন একটা বসিয়ে দেয়া হয়েছে সিংহলের সাগর-তীরে। স্বপ্নের মত লাগছে।

'এত আলো দেয়া হয়েছে কেন জানেন?' জিজ্ঞেস করল হুলুগাল। তারপর নিজেই উত্তর দিল। 'আমার ধারণা, উজ্জ্বল আলো কেবল কীটপতঙ্গকেই আকর্ষণ করে না, মানুষকেও করে। এত খরচ করার জন্যে ভয়ানক চটে গিয়েছিলেন আমার

ওপর মিস্টার কুমারস্বামী, কিন্তু এক মাসের মধ্যেই খরচের সব টাকা তুলে লাভ দেখিয়ে দিয়েছি। লাভ বেড়ে গেছে আমাদের দেড়গুণ।' গর্বের সঙ্গে চাইল হুলুগাল নিজের ক্যাসিনোর দিকে। 'জাফনা ক্যাসিনোর লাইটিং ব্যবস্থা এই রকম করে নিন, মিস্টার হিক্কা। মাত্র হাজার পঞ্চাশেক খরচ হবে।'

ক্যাসিনোর পাশ দিয়ে একশো গজ গেলেই পঁচিশ-তিরিশটা কেবিন। অর্ধচন্দ্রের মত করে সাজানো। প্রত্যেকটার মুখ সাগরের দিকে ফেরানো। পাকা দেয়াল, উপরে টালির ছাত। ঝাউ আর স্বর্ণলতা দিয়ে প্রত্যেকটি কেবিনকে আড়াল করা হয়েছে অন্যগুলো থেকে। গাড়ি এসে থামল একটা কেবিনের সামনে।

'আপনার কেবিন,' বলল হুলুগাল রিটার দিকে ফিরে। 'সবকিছু তৈরি আছে আপনার জন্যে। কিন্তু মিস্টার হিক্কাকে কোথায় থাকতে দিই ভাবছি।'

'আমার পাশের কেবিনে থাকবে হিক্কা। কুমারের কেবিনটায়,' বলে নেমে পড়ল রিটা গাড়ি থেকে। রানাও নামল পিছন পিছন।

'ওঁর জন্যে ডাক্তার পাঠিয়ে দেব?'

'না, না,' নিষেধ করল রানা। 'ঠিক আছি আমি। এক ঘুম দিয়ে উঠলেই ঠিক হয়ে যাবে সব।'

'যেমন ভাল বোঝেন,' উদাস ভঙ্গিতে বলল হুলুগাল।

'তোমাকে আর তদারকি করতে হবে না, হুলুগাল। অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে আজ রাতে। থ্যাঙ্কস ফর পিকিং আস্ আপ।'

হাসল হুলুগাল। পাশাপাশি দাঁড়ানো রানা এবং রিটাকে দেখল একবার আপাদমস্তক। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। চলি আমি। কাল সকালে আলাপ করা যাবে।'

চলে গেল হুলুগাল। ক্যাসিনোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ির পিছনের লাল বাতি দুটো। যতক্ষণ দেখা গেল, চেয়ে রইল ওরা দু'জন।

'কেমন বুঝলে লোকটাকে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল রিটা।

'খুবই ধুরন্ধর লোক।'

'ঠিক বলেছ। চলো এবার, ভয়ানক শ্যাম্পেন-তেষ্টা পেয়েছে আমার।'

চমৎকার সুসজ্জিত একটা কেবিনে এসে ঢুকল রানা রিটার পিছন পিছন। বেশ বড় একটা ঘর, অ্যাটাচড বাথ, একটা ছোট্ট রান্নাঘর। প্রচুর টাকা খরচ করে সাজানো হয়েছে ঘরটাকে। অনেকগুলো বোতাম রয়েছে দেয়ালের গায়ে। বোতাম টিপলেই খাট বেরিয়ে আসবে দেয়ালের মধ্যে থেকে। শুয়ে শুয়েই দরজা, জানালা, পর্দা, এয়ারকুলার, খোলা বা বন্ধ করা যায়। বিলাসিতার চরম মাত্রাও যেন ছাড়িয়ে গিয়েছে কুমারস্বামী এই কেবিনগুলো তৈরি করতে গিয়ে। দিনের বেলা ড্রইংরুম, রাতে কয়েকটা সুইচের গুণে এটা হয়ে যায় বেডরুম।

'কেমন? পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রিটা ডিভানে বসে। 'তিরিশটা কেবিনের প্রত্যেকটায় আলাদা সিস্টেম, একেক ঘরের একেকটা বৈশিষ্ট্য। এটা আমার ঘর। গেট মি আ ড্রিঙ্ক, উড ইয়ু? ওই দেয়ালের গায়ে ক্যাবিনেট আছে একটা। ওর মধ্যে শ্যাম্পেনের বোতল গ্লাস সব পাবে, নিয়ে এসো।' বালিশে পিঠ

ঠেকিয়ে আধশোয়া হয়ে বসল রিটা। হাত দুটো মাথার উপর তুলে আড়মোড়া ভাঙল।

বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে ফিরে এল রানা ডিভানের পাশে। একটু সরে জায়গা করে দিল রিটা রানাকে। একটা গ্লাস ভর্তি করে এগিয়ে দিল রানা।

'কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করেছে কুমার এই গোল্ডেন ক্যাসিনো। সব আমার হতে পারত শুধু যদি হুলুগালকে সামলাতে পারতাম।'

'এত টাকা দিয়ে কি করতে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা বোকার মত।

'মানুষ যা করে, তাই করতাম। উপভোগ করে নিতাম জীবনটাকে। যেমন খুশি তেমন চলতাম, পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস গন্ধ চেখে নিতাম প্রাণ ভরে। আরও দাও!' গ্লাসটা শেষ করে আবার বাড়িয়ে ধরল সে সামনে। ভর্তি করে দিল রানা। 'এখনও কিন্তু আশা ছাড়িনি আমি। হুলুগালকে সামাল দিতে পারলেই এই সমস্ত কিছু আমার হয়ে যায়।'

'এই লোককে সামাল দেয়া অত সহজ হবে না,' বলল রানা শ্যাম্পেনে মৃদু চুমুক দিয়ে।

এ-কথার জবাব দিল না রিটা। একটা বোতাম টিপে দিল। কালো একটা পর্দায় ঢাকা পড়ল প্রকাণ্ড জানালাটা। গ্লাসটা শেষ হতেই আবার ভর্তি করে দিল রানা। হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখল অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রিটা ওর দিকে।

'আমি যাই,' বলল রানা। 'ঘুম পেয়েছে বড্ডো। তোমারও বিশ্রাম দরকার, অনেক ধকল গেছে আজ সন্ধে থেকে। শুয়ে পড়ো তুমিও।'

উঠে নিজের কামরায় চলে গেল রানা।

উনিশ

সকালে সমস্ত এলাকাটা ঘুরে দেখাতে বের হলো রিটা রানাকে নিয়ে। আকাশী নীল শাড়ি পরেছে রিটা, সাদা ব্লাউজ, কপালে কুমকুম টিপ, মুখে কথার ফুলঝুরি, ব্যবহারে ভদ্র দূরত্ব—রাতের সেই মেয়েটা বলে মনেই হচ্ছে না।

ঘণ্টাখানেক ঘুরল ওরা। হরেক রকম কৌশলে গড়েছে হুলুগাল ওর রাজত্ব। একেকটা ফুলের বেড যেন একেকটা শিল্পকর্ম। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে মাটি খুঁড়ে বসানো বিরাট সব গামলায় নীল-পদ্ম আর লাল শাপলা। ক্যাসিনোর কাছেই একসারি আধুনিক দোকান—টিপ বোতাম থেকে নিয়ে হীরে বসানো জড়োয়া সেট পর্যন্ত সব পাওয়া যায় এখানে। হরেক রকম জীবজন্তু আর পাখি আছে ক্যাসিনোর নিজস্ব চিড়িয়াখানায়।

'বাঘের ঘর দেখবে এসো,' ডাকল রিটা। 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার।'

'সিংহলে বাঘ আছে?'

'সিংহলে বাঘ-সিংহ কিছুই নেই। এগুলো বাইরে থেকে আনানো। এখানে সিংহ আছে কেবল জাতীয় পতাকায়। আমাদের জঙ্গলে বাঘ আছে অল্প

কয়েকটা—তবে চিতা বাঘ। এই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখতে বহু লোক ভিড় করে এখানে। হুলুগাল বাঘের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। নিজ হাতে খাওয়ায় প্রতিদিন।

মাটির নিচে বাঘের বাসা। সিমেন্ট করা ঘর। উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা রয়েছে গর্তটা। সামনের দিকে ঝুঁকে দেখল রানা তিনটে প্রকাণ্ড বাঘ পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ঘরময়। একটা বাঘিনী বেরিয়ে এল দেয়ালের গায়ের গর্ত থেকে, একটা বুক ডন দিয়ে সেটাও আরম্ভ করে দিল পায়চারি। বোটকা গন্ধে টিকতে পারল না ওরা ওখানে বেশিক্ষণ।

আরও খানিকটা দূরে এসে দেখা গেল একটা কুঞ্জবীথি। আসলে ওটা একটা রেস্তোরাঁ। রিটাকে দেখেই একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়াল এসে ধোপদুরস্ত কাপড়-চোপড় পরা একজন মোটাসোটা লোক।

'এই যে, জোসেফ। কেমন আছ?' বলল রিটা। তারপর রানার দিকে চেয়ে বলল, 'এ হচ্ছে জোসেফ। ক্যাসিনোর তিনটে রেস্তোরাঁ চালায় ও। আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার নটরাজ হিক্কা।'

'আচ্ছা!' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল জোসেফ রানার মুখের দিকে। 'আপনার নাম শুনছি বহুদিন থেকে। পরিচিত হতে পেরে খুব খুশি হলাম। জাফনার সব খবর ভাল তো?'

'খুব ভাল। কিন্তু আপনাদের মত এত ভাল না। আপনাদের এখানে তো এলাহি কারবার দেখতে পাচ্ছি সব।'

বিনয়ে গদগদ হয়ে গেল জোসেফ। হাত কচলে বলল, 'কি যে বলেন, স্যার।'

'ভাল কথা। আমাদের খাবার তোমার রেস্তোরাঁ থেকে পাঠাবে ঠিক সময়মত, কেমন?' বলল রিটা।

'নিশ্চয়ই। তিনজনের জন্যে স্পেশাল খাবার পাঠিয়ে দেব আমি…'

'তিনজন নয়। দু'জন। কুমার গেছে কলকাতায়। আমরা দু'জন এসেছি এবার।'

একটু অবাক হলো জোসেফ, কিন্তু চেহারায় সে-ভাবটা ফুটতে দিল না। এগিয়ে গেল রিটা রানাকে নিয়ে। সুইমিং পুল আর বোটানিকাল গার্ডেন হয়ে ক্যাসিনোর দিকে চলল ওরা।

বুইকটা দাঁড়িয়ে আছে ক্যাসিনোর গেটের সামনে।

'এই গাড়িটা যদি আমাদের হয়, গোল্ডেন ক্যাসিনোর সবটা যদি আমাদের হয়, রত্নপুরের অর্ধেক জুয়েলারীর দোকান যদি আমাদের হয়—তাহলে কেমন হয় বলো তো?'

'অপূর্ব হয়, কিন্তু দুঃখ, মাত্র বিশ লাখ নিয়েই কেটে পড়তে হবে আমাদের।'

'কেটে না-ও পড়তে হতে পারে,' বলল রিটা অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে।

অবাক দৃষ্টিতে চাইল রানা রিটার মুখের দিকে। সংকল্প দেখতে পেল সে ওর দুই চোখে।

'বলো কি? বিশ লাখে মন উঠছে না? নতুন কিছু প্ল্যান করছ নাকি?'

'ও দিয়ে ক'দিন চলবে? ইট ওউন্ট লাস্ট। দুই মাসেই বরফের মত গলে

বেরিয়ে যাবে এই ক'টা টাকা।'

'পুলিসের ভয় নেই এদেশে?'

'টাকা হচ্ছে আলাদীনের প্রদীপ। যার হাতে থাকবে, দৈত্যটা তারই বশ। মাসে পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছে ইন্সপেক্টর সেনানায়েক—আমরা না হয় বাড়িয়ে দেব। কিন্তু এ নিয়ে আর আলাপ করা ঠিক হচ্ছে না। ওই দেখ দাঁড়িয়ে আছে হুলুগাল আমাদের অপেক্ষায়।

সিঁড়ি দিয়ে তিন-চার ধাপ উঠতেই প্রশস্ত একটা লাউঞ্জ। চেয়ার-টেবিল পাতা রয়েছে অনেকগুলো। সোজা দোতলায় অফিস ঘরে নিয়ে এল ওদের হুলুগাল। একজন লোক বসে আছে দরজার দিকে পিছন ফিরে।

পিছন থেকে ক্রু-কাট চুল দেখা যাচ্ছে কেবল। ঘরে ঢুকতেই ঘাড় ফিরিয়ে চাইল লোকটা রিটার দিকে, তারপর মুখ ভর্তি হাসি টেনে এনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার চিনতে পারল রানা লোকটাকে। খাকি পোশাক, কোমরে রিভলভার, টুপিটা ডেস্কের উপর খুলে রাখা। নিশ্চয়ই ইন্সপেক্টর সেনানায়েক।

'আরে, মিসেস কুমারস্বামী! বহুদিন পর দেখা হলো আবার। কেমন আছেন?'

'ভাল,' মিষ্টি হাসি ঠোঁটে টেনে বলল রিটা। 'আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি নটরাজ হিক্কা, আমাদের জাফনা ক্যাসিনোর ম্যানেজার, আর ইনি পুলিস ইন্সপেক্টর বিজয়তুঙ্গ সেনানায়েক, আমাদের বিশেষ বন্ধুলোক।'

রানার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবার সময় মুখের হাসিটা মুছে নিল ইন্সপেক্টর। চাপ দিয়ে শক্তি দেখাবার চেষ্টা করেছিল, উল্টে ব্যথা দিয়ে দিল রানা।

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, মিস্টার হিক্কা। আপনার নাম শুনেছি অনেক।'

দুটো চেয়ারে বসে পড়ল রানা এবং রিটা। চুপচাপ এদের পরিচয়ের পালা দেখছিল হুলুগাল ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে, এবার ডেস্কের ওপাশে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। বলল, 'আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে, ম্যাডাম। গাড়িটা পাওয়া গেছে।'

'তাই নাকি?' চোখেমুখে মিথ্যা বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল রিটা। ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বলল, 'খুব ঝটপট কাজ করেছেন দেখছি?'

'না, আমার কিছু করতে হয়নি। গতরাতে রিপোর্ট এসেছিল থানায়। আজ সকালে হুলুগালের ফোন পেয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু,' বলল সেনানায়েক গম্ভীর কণ্ঠে।

'কি পরিষ্কার হয়ে গেল?'

'পেরাদেনিয়ার কাছে একটা ভয়ানক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে গতরাতে। দুইজন ড্রাইভারই মারা গেছে। একজন চালাচ্ছিল আপনাদের ক্যাডিলাকটা। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে গাড়িটা।'

'হায় হায়! পুড়ে শেষ হয়ে গেছে? কুমারের প্রিয়…জোর করে এনেছিলাম আমি…ভয়ানক রেগে যাবে ও,' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল রিটা।

'আচ্ছা, গোড়া থেকে ঘটনাটা বলুন দেখি। রিপোর্ট পাঠাতে হবে আমাকে।'

সব কথা নোট করে নিল ইন্সপেক্টর। বলল চেনা নেই শোনা নেই রাতের

বেলা আরেকজন লোককে গাড়িতে তোলাই ভুল হয়েছিল। রানা অন্যমনস্ক ছিল এতক্ষণ, এবার ভাবল কিছু একটা বলা দরকার।

'লোকটা আসলে কে?'

'বিশেষ কিছু অবশ্য অবশিষ্ট ছিল না লোকটার, তবু সনাক্ত করা গেছে। লোকটার নাম মাসুদ রানা, ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কর্পোরেশন বলে একটা কোম্পানীর ম্যানেজার ছিল। বেড়াতে গিয়েছিল কাণ্ডিতে, স্থানীয় সর্দার রঘুনাথ জয়ামান্নের পাল্লায় পড়ে জড়িয়ে পড়েছিল স্টেডিয়ামের একটা ফাইটে। ফাইটের পর গায়েব হয়ে যায় লোকটা। বোঝা যাচ্ছে তারপরই এই কাণ্ডটা করে সে।'

মাথার মধ্যে বোঁ করে উঠল রানার। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কর্পোরেশনের নামটা অত্যন্ত পরিচিত মনে হলো ওর। সে কি তাহলে বাঙালী? ওই কোম্পানীর ম্যানেজার? স্মৃতি-বিভ্রাট ঘটেছে ওর? যাক, এ-নিয়ে পরে ভাবতে হবে ভাল করে, এখন চিন্তার সময় নয়। কিছু একটা বলতে হবে।

'বাহ্, অল্প সময়ের মধ্যে অনেক তথ্য জোগাড় করে ফেলেছেন তো। চমৎকার!'

'বাহবার কিছু নেই। আমাদের অর্গানাইজেশনটাই এ রকম। তাছাড়া মাসুদ রানার পকেটে একটা ব্রোঞ্জের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। পিল্লাই বলে একটা হোটেলওয়ালার স্ত্রী দিয়েছিল ওটা ওকে। পিল্লাই, তার স্ত্রী এবং স্যানসোনি বলে একজন লোক লাশ সনাক্ত করেছে।'

'সনাক্ত করুক আর না করুক কিচ্ছু এসে যায় না আমার,' বলল রিটা। 'গাড়িটার জন্যে বড় চিন্তা হচ্ছে। খেপে যাবে কুমার। হি উইল বি ফিউরিয়াস। ওটা কি একেবারে শেষ?'

'অত চিন্তা করছেন কেন?' বলল হুলুগাল। 'সব টাকা আদায় হয়ে যাবে ইনশিওরেন্সের কাছ থেকে, নতুন গাড়ি কেনা হবে আবার। কুমারস্বামী বরং খুব খুশিই হবেন।'

'মাসুদ রানার চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?' হঠাৎ প্রশ্ন করল ইন্সপেক্টর রানাকে। 'পিল্লাই, তার স্ত্রী এবং স্যানসোনির কাছ থেকে আলাদাভাবে বর্ণনা নেয়া হয়েছে। এবার আপনার বর্ণনা পেলেই মিলিয়ে দেখা যাবে সেই লোকটাই আপনাদের গাড়ি ছিনিয়ে নিয়েছিল কিনা।'

কথাটার মধ্যে একটা তির্যক ভঙ্গি খুঁজে পেল রানা। তবে-কি এরা সন্দেহ করছে যে ও-ই মাসুদ রানা? রানার অপ্রতিভ ভাব বুঝতে পেরে জবাবটা রিটাই দিল।

'মজা কি জানেন, লোকটা অনেকটা হিক্কার মতই ছিল দেখতে। একই সমান লম্বা, একহারা গড়ন। পরনে ছিল চকোলেট রঙের স্যুট, সাদা শার্ট, লাল টাই। মনে হচ্ছিল যেন কারও সাথে মারামারি করে এসেছিল লোকটা। কার্টসি লাইটে একনজর দেখেছিলাম মাত্র।'

'মিলে গেছে। একদম মিলে গেছে। আমি আর হুলুগাল তো তাই ভাবছিলাম মাসুদ রানার চেহারার বর্ণনা হিক্কার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কেন।'

'বললাম তো, দু'জনের চেহারায় মিল আছে অনেকটা। আমি হিক্কাকে বলেছিলাম কথাটা। ও বিশ্বাস করেনি। ওর ধারণা ও আসলে দেখতে দিলীপ কুমারের মত।'

হাসল ইন্সপেক্টর। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'যাক, বোঝা গেল। আমি চলি এখন, পরে দেখা করব। আপনাদের কাউকে আর জেরা করা হবে না। আমাদের তরফ থেকে বক্তব্য হচ্ছে পার্ক করা অবস্থায় চুরি করেছে মাসুদ রানা গাড়িটা; আমরা দেখিনি ওকে, ওর চেহারা কেমন জানি না। অলরাইট?'

'ঠিক আছে। যেমন ভ বোঝেন।'

'এইটাই ভাল হবে। খামোকা ঝামেলায় যাব কেন আমরা? আচ্ছা, চলি তাহলে। বাই।'

'বাহ্, একান্ত অনুগত ভৃত্য!' বলল রানা ইন্সপেক্টর বেরিয়ে যেতেই।

'আশ্চর্যের কি আছে? যথেষ্ট পয়সা খাওয়ানো হয় ওকে,' বলল হুলুগাল। 'যাক্, গোলমাল চুকল, এবার কাজের কথায় আসা যাক।'

'হ্যাঁ,' বলল রিটা সাথে সাথেই। 'আমাকে আর নটরাজকে অ্যাকাউন্টস্ চেক করতে পাঠিয়েছে কুমার।'

'আমাকে?' শান্ত দৃষ্টি মেলে চাইল হুলুগাল রিটার চোখের দিকে। 'আপনি আবার কবে থেকে ব্যবসার খোঁজখবর রাখতে আরম্ভ করলেন?'

দুই সেকেণ্ড চেয়ে রইল ওরা পরস্পরের দিকে। তারপর হাসল রিটা।

'কোনও না কোনও সময় আমাকে আরম্ভ করতেই হত। তাই না? ওর অবর্তমানে আমি দেখাশোনা করতে পারি কিনা তাই বোধহয় পরীক্ষা করছে কুমার।'

বাঁকা ঠোঁটে বিচিত্র এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল হুলুগালের। ব্লটিং পেপারের উপর একটা লাল বল-পেন দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছে সে। আবার চোখ তুলল।

'অর্থাৎ কুমারস্বামীর প্রতিনিধি আপনি? ভাল কথা। লিখিত কিছু আছে আপনার কাছে?'

কুঁচকে গেল রিটার ভ্রু জোড়া।

'লিখিত কিছু। ঠাট্টা করছ তুমি, হুলুগাল? চেন না তুমি আমাকে?'

'না। ঠাট্টা করছি না।' পিছনে হেলান দিয়ে বসল হুলুগাল। 'কুমারস্বামী বলেছেন আমাকে, মিস্টার হিক্কা অ্যাকাউন্টস্ চেক করবেন। ঠিক আছে, উনি চেক করতে পারেন। কিন্তু উনি আপনার কথা কিছুই বলেননি। ওঁর অনুমতি ছাড়া গোল্ডেন ক্যাসিনোর অ্যাকাউন্টস্ দেখবার অধিকার আপনার নেই।'

রানা বুঝল, অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। কাজেই তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাকে কিন্তু কুমারস্বামী বলে দিয়েছেন, মিসেস কুমারকে কাজ শেখাতে হবে। সব কিছু যেন শেখানো হয় এঁকে।'

চিন্তিত মুখে আরও অনেক দাগ কাটল হুলুগাল।

'আপনাকে কুমারস্বামী যা-ই বলে থাকুন না কেন, আমাকে তিনি এ ব্যাপারে

কিছুই বলেননি।'

'কিন্তু দেখুন...'

'তুমি থামো, হিক্কা। যা বলবার আমিই বলছি,' বলল রিটা উত্তেজিত কণ্ঠে। তীব্র দৃষ্টিতে হুলুগালের চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'কুমারের ধারণা ক্যাশ রিজার্ভ থেকে টাকা সরাচ্ছ তুমি। তাই পাঠিয়েছে ও আমাদের। এভাবে গড়িমসি করে দেরি করবার চেষ্টা করলে কি টাকাগুলো পূরণ হয়ে যাবে মনে করছ? যদি গলাধাক্কা খেতে না চাও তাহলে ভালয় ভালয় চাবি দিয়ে দাও আমাকে!'

হো-হো করে হেসে উঠল হুলুগাল। যেন সত্যি সত্যিই মজা পেয়েছে কথাগুলোতে।

'কে গলাধাক্কা দেবে আমাকে? আপনি? হোঃ হোঃ! কুমারস্বামী যদি আমাকে বেরিয়ে যেতে বলেন, আমি চলে যাব। কিন্তু তার আগে নয়। যদি আপনি এবং হিক্কা মনে করে থাকেন খুব সহজে চিৎ করে দেবেন আমাকে তাহলে মস্ত ভুল করবেন। আমি গল্-এর লোক, আপনারা এখানে বিদেশী—কথাটা মনে রাখবেন।'

'আশ্চর্য স্পর্ধা তো! আমার সঙ্গে কিভাবে কথা বলা উচিত সেটাও কি কুমারকে এখানে এসে শিখিয়ে দিতে হবে? সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ কিন্তু তুমি, হুলুগাল।'

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ভুরু জোড়া নাচাল হুলুগাল।

'দেখুন, চাপটা আপনিই সৃষ্টি করছেন। আমি হুকুমের চাকর মাত্র। আইন অমান্য করতে পারি না। মিস্টার হিক্কা ইচ্ছে করলেই অ্যাকাউন্টস্ চেক করতে পারেন। যখন ইচ্ছা। কিন্তু আপনার নাক যদি এর মধ্যে গলাতে হয় তাহলে কুমারস্বামীর লিখিত অর্ডার লাগবে। এ নিয়ে বৃথা তর্ক করে লাভ নেই।'

রানা ভাবল এক্ষুণি বুঝি মারামারি আরম্ভ করবে রিটা। কিন্তু তা না করে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে। দুই হাত মুঠি করে সামলাবার চেষ্টা করছে সে নিজেকে।

'দেখা যাবে!' সাপের মত হিস্-হিস্ করে উঠল রিটা। 'চলো হিক্কা, খাবার সময় হয়ে গেছে।'

ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল রিটা ঘর ছেড়ে। ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল রানাও। একটা সিগারেট ধরাল হুলুগাল।

'মেয়েমানুষ! চিড়িয়া এরা। যাক, আপনি যখন ইচ্ছা খাতা দেখতে পারেন, মিস্টার হিক্কা। আমাকে এখানে পাবেন সব সময়।'

'ভুল করলেন, মশাই। কাজটা ঠিক হলো না,' পরামর্শ দিল রানা। 'সত্যিই কিন্তু ক্ষতি করতে পারে ও আপনার।'

'ফুঃ!' উড়িয়ে দিল হুলুগাল কথাটা ফুঁ দিয়ে। তারপর পকেট থেকে একটা সোনার সিগারেট কেস বের করে আনল। 'এটা কেবিনে ফেলে গিয়েছিলেন ভুল করে। চাকরটা দিয়ে গেছে আমার কাছে।' টেবিলের উপর রাখল হুলুগাল সিগারেট কেসটা। দৃষ্টিটা গর্ত খুঁড়ছে যেন রানার চোখে।

সিগারেট কেসটার উপর চোখ পড়তেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানার মুখ। জিনিসটা কুমারের। প্যান্টের হিপ পকেটে পেয়েছিল রানা। ফেলে দেয়া উচিত ছিল

বিশ

পালানো দরকার।

রানা বুঝল, ক্রমেই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে সে। নিজের সম্পর্কে শুধু এইটুকু জানতে পেরেছে যে সত্যিই ওর নাম মাসুদ রানা এবং সে একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। বেড়াতে এসেছিল সিংহলে। কাণ্ডির ঘটনাগুলো আবছাভাবে মনে পড়ছে ওর, কিন্তু তার আগের কিছুই মনে নেই। অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারছে না আর কিছু। মাঝে মাঝে একজোড়া কাঁচা-পাকা ভুরু এবং তার নিচে তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ ভেসে উঠছে ওর মানসপটে। ব্যস, আর সবকিছু ধূসর।

হ্যাঁ, জটিল পরিস্থিতি। এর থেকে বেরোতে না পারলে মহা বিপদে পড়ে যাবে সে। কিন্তু বেরোবে কি করে? সব কথা জানাজানি হয়ে গেলে কুমারস্বামীকে খুন করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হবে ওকে। চারদিকে আঁটঘাট বেঁধে নিয়েছে রিটা, এখন পালাবার চেষ্টা করলে ধরিয়ে দেবে পুলিসের হাতে। অথচ এদিকে আবার সন্দেহ জন্মে গেছে হুলুগালের মনে, সত্যিকার নটরাজ হিক্কাকে যদি টেলিফোন করে তাহলেই ফাঁস হয়ে যাবে সবকিছু। অথচ বিপদের গুরুত্ব বোঝানো যাচ্ছে না রিটাকে কিছুতেই।

'সত্যিই, সময় থাকতে কেটে পড়া উচিত আমাদের, রিটা,' বলল রানা হতাশ কণ্ঠে।

পর্দাটা ঝোলানো রয়েছে, স্কাই লাইট থেকে মৃদু আলো আসছে ঘরে। যত্নের সঙ্গে কাপড় ছাড়ল রিটা। আধ-শোয়া হয়ে বসল ডিভানের উপর। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। সী-বীচ থেকে লোকজনের হৈ-হুল্লোড়, হাসি কানে আসছে। দুপুর তিনটে। সিলিং-এর দিকে ধোঁয়া ছাড়ল রিটা, তারপর চাইল রানার দিকে।

'ভয় লাগছে, রানা?'

'এখন ভয় না পাওয়াটা আমার কাছে বোকামি মনে হচ্ছে, রিটা। চেষ্টা করে তো দেখা গেল। অ্যাকাউন্টস্ দেখা যায় ইচ্ছে করলেই—কিন্তু চাবি হাতে পাওয়া অসম্ভব। এখন মানে মানে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

ছাই ঝাড়ল রিটা দামী কার্পেটের উপর। নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর দুই ঠোঁটে।

'কাজেই পালাতে চাইছ, এই তো?'

'আর কোনও পথ নেই, রিটা। বুঝতে পারছ না কেন? শুধু একটা টেলিফোন করলেই আমাদের ধোকাবাজি ধরে ফেলবে হুলুগাল। এখন আর এক সেকেণ্ডও সময় নষ্ট না করে…'

'এসব কথা অনেক আগেই ভেবে দেখেছি আমি, রানা। সেজন্যেই এত যত্নের সঙ্গে বড়শিতে গেঁথেছি আমি তোমাকে। আমার বরাবরই ভয় ছিল, ভেগে পড়ার

ওটা ওর অনেক আগেই।

'ওহ-হো, ফেলে রেখে এসেছিলাম ওটা।' হাত বাড়িয়ে নিতে গেল রানা কেসটা, কিন্তু বাম হাত রাখল হুলুগাল ওটার উপর।

'এটা আপনার?'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'আমার ধারণা এটা কুমারস্বামীর। ওঁর নাম লেখা আছে এর ওপর।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'আমি শুধু জানতে চাইছি এটা আপনার কাছে কেন?' স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে হুলুগাল।

'আমি চেয়ে নিয়েছি কেসটা ওঁর কাছ থেকে। এই ডিজাইনে আমিও একটা সিগারেট কেস বানাব বলে,' কথাটা নিজের কানেই অবিশ্বাস্য ঠেকল রানার।

'তাই নাকি?' হাতটা উঠিয়ে নিল হুলুগাল সিগারেট কেসটার উপর থেকে। 'এসব ব্যাপারে কুমারস্বামীকে এতখানি উদার বলে জানতাম না। নিজের ব্যবহারের কোন জিনিস কাউকে ছুঁতে দেয়াও তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।'

'আমার সঙ্গে উনি একটু অন্য রকম।' কথাটা কোনরকমে বলে কেসটা তুলে নিল রানা টেবিলের উপর থেকে। কানের পাশ থেকে টপ করে এক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল মেঝেতে।

'কথাটা বিশ্বাস করতাম, যদি না এর গোপন কম্পার্টমেন্ট থেকে কুমারস্বামীর উইলটা পাওয়া যেত।' একখানা হাফ-ফুলস্ক্যাপ সাইজের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প দেখাল হুলুগাল রানাকে। দশ টাকার স্ট্যাম্প। 'এটা সুদ্ধই কি উনি দিয়েছিলেন কেসটা আপনাকে?'

অবাক হয়ে চাইল রানা কাগজটার দিকে। কেসটার মধ্যে গোপন কম্পার্টমেন্ট ছিল নাকি আবার! হাত বাড়াল সে।

'দিয়ে দিন ওটা।'

'উঁহুঁ। ক্যাশ-রিজার্ভের সঙ্গে রেখে দেয়া হবে এটাকে। কুমারস্বামী এসে যেদিন চাইবেন, সেদিন বের করে দেব। আপনার অজ্ঞান্তেই ওটা ছিল যখন, অজানাই থাকুক।'

ড্রয়ার টান দিল হুলুগাল। একটা রিভলভারের বাঁট দেখতে পেল রানা। বুঝল এখন গোলমাল করে লাভ নেই। কাজেই রওনা হলো সে দরজার দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে ডাকল হুলুগাল আবার।

'আচ্ছা মিস্টার হিক্কা, জাফনায় কার চার্জে ছেড়ে এসেছেন আপনি ক্যাসিনোটা?'

কি নাম যেন বলেছিল রিটা? এক সেকেণ্ড পর মনে পড়ল।

'শ্রীসেনা পিয়াদাসা। কেন?'

'কৌতূহল।' আবার আঁকিবুঁকি কাটতে আরম্ভ করল হুলুগাল ব্লটিং পেপারের উপর। 'আমি খুবই কৌতূহলী লোক, মিস্টার হিক্কা।'

চেষ্টা করবে তুমি। কিন্তু এখন আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এক পা-ও নড়তে পারবে না তুমি—একটু এদিক-ওদিক দেখলেই ধরিয়ে দেব পুলিসের হাতে। এবার ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করো। এসো, দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, কাছে এসো।'

সম্মোহিতের মত কাছে এগিয়ে গেল রানা। বসে পড়ল সোফায়।

'আমি জানি, হুলুগাল বোকা নয়। এতক্ষণে শ্রীসেনা পিয়াদাসার সঙ্গে টেলিফোনে কথা-বার্তাও হয়ে গেছে খুব সম্ভব। হয়তো জেনে ফেলেছে ও যে তুমি আসল হিক্কা নও। কিন্তু তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

'কেন?'

'কারণটা অত্যন্ত সহজ। আমাদের মত হুলুগালও চাইবে কুমারের মৃত্যু সংবাদ যেন চাপা থাকে। রাজা মারা গেলে রাজত্ব নিয়ে কামড়াকামড়ি হবেই, প্রত্যেকে চাইবে খাবলা বসাতে। রত্নপুরের ম্যানেজার, ইন্সপেক্টর, নটরাজ হিক্কা, ডি সিলভা, সবার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, এবং একথা হুলুগাল খুব ভালভাবেই জানে। কাজেই সবকিছু গুছিয়ে নেয়ার আগে যাতে অন্য কেউ ব্যাপারটা জানতে না পারে তার জন্যে চেষ্টা ওর আমাদের চেয়ে কম হবে না। সেনানায়েককে কিচ্ছু বলবে না ও। কাউকে কিচ্ছু বলবে না। ও চাইবে কুমারের মৃত্যু সংবাদ গোপন থাকতে থাকতে যতটা পারা যায় হাতিয়ে নিতে। বিশেষ করে নটরাজ হিক্কাকে ওর সবচেয়ে বেশি ভয়। কাজেই, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমাদের অত চিন্তিত হবার বা ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।'

সত্যিই তো! যুক্তি আছে ওর কথায়। একথা ভাবেনি সে!

'কিন্তু মুখ বন্ধ রাখলেই যে হাত বন্ধ রাখবে, এমন গ্যারান্টি তোমাকে কে দিল? অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লোক এই হুলুগাল। মুখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকবে না সে,' বলল রানা।

পা দুটো ডিভানের উপর তুলে নিল রিটা। বলল, 'হ্যাঁ, ওর পক্ষে দুটো বুলেট খরচ করে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু তার আগে কুমারের সঠিক খবরটা বের করবার চেষ্টা করবে ও। খবরটা জানা হয়ে গেলেই কোনও একটা দুর্ঘটনায় মারা যাব আমরা। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেয়ে চাপা দিয়ে দেবে ইন্সপেক্টর সবকিছু। কিন্তু আমিও সুযোগের অপেক্ষায় আছি, রানা। সময় মত ছোবল দিতে এক সেকেণ্ড দেরি করব না আমি।'

'টাকার জন্যে খুন পর্যন্ত ঢাকা দেবে, ইন্সপেক্টর?' জিজ্ঞেস করল রানা বোকার মত।

'খুনের কথা বলিনি তো। দুর্ঘটনা ঢাকা দেয়া সহজ ব্যাপার।'

উঠে দাঁড়াল রানা। অস্থির পায়ে ঘরময় পায়চারি করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ দাঁড়াল রিটার সামনে এসে।

'কি করতে চাও তুমি? তোমার মতলবটা খুলে বলবে আমাকে?'

'এখনও বুঝতে পারোনি যে এই রাজত্বের উত্তরাধিকারী হতে পারো তুমি ইচ্ছে করলে? এখনও টের পাওনি যে অতি সহজে গল্ এবং রত্নপুর অধিকার করতে পারি

আমরা। সমস্ত টাকা আমাদের।'

'না। এখনও কিছু বুঝতে পারিনি।'

হাত ধরে টেনে বসাল রিটা রানাকে।

'শোনো, মাসুদ রানা। আমি যদি তোমার পেছনে থাকি, তাহলে তুমি অনায়াসে চালাতে পারবে গোল্ডেন ক্যাসিনো আর রত্নপুর মার্কেট। অজস্র টাকার মালিক হব আমরা। ভুলেও মনে কোরো না এই ক'টা টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছি আমি এখানে।'

'অথচ তুমি বলেছিলে...'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। সব কথা অত অল্প সময়ে বলা সম্ভব ছিল না বলে কেবল ওইটুকু বলেছিলাম। সকালে সবটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছি তোমাকে। এই রাজত্ব দখল করবার ইচ্ছে হচ্ছে না তোমার মধ্যে? খুবই সহজ।'

'কতটা সহজ?'

'হঠাৎ হুলুগাল কোনও একটা দুর্ঘটনায় পড়লেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

'অর্থাৎ ওকে খুন করতে হবে আমার?' বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ধরল রানা রিটার মুখের উপর। না, ঠাট্টা করছে না। জ্বলজ্বল করছে দুটো উজ্জ্বল চোখ। বলল, 'অসম্ভব। চুরি পর্যন্তই যথেষ্ট ছিল, খুন আমি কিছুতেই করতে পারব না।'

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই, রানা। হুলুগালকে সরাতে পারলেই গোল্ডেন ক্যাসিনো আর রত্নপুর মার্কেট আমার! কোটি কোটি টাকার কারবার। নটরাজ হিক্কা পৌঁছবার আগেই সব ব্যবস্থা করে ফেলব। ও এসে আর কিছুই করতে পারবে না। সারা জীবনের জন্যে টাকা-পয়সার চিন্তা দূর হয়ে যাচ্ছে আমাদের।'

উঠে বসে রানার বুকে মাথা রাখল রিটা। দামী ক্রীমের সুবাস এল রানার নাকে। দুই হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরল রিটা। আহ্লাদী ভঙ্গিতে বলল, 'আমার জন্যে এইটুকু কাজ করতে পারবে না তুমি? ঢলে পড়তে চাইল রিটা রানার গায়ে।

হঠাৎ কি হলো, একটানে ছাড়িয়ে দিল রানা গলা থেকে রিটার হাত। তারপর উঠে দাঁড়াল ডিভান ছেড়ে। অদ্ভুত একটা ঘৃণায় রি-রি করে উঠেছে রানার সর্বশরীর। দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল সে রিটার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে।

'রানা! থামো! বোকামি কোরো না, কাছে এসো। আমাকে ভালবাসো তুমি, বাসো না?'

নড়ল না রানা।

'ভালবাসা-বাসি টেনে এনো না রিটা এর মধ্যে। পিস্তল দেখিয়ে আর যাই হোক ভালবাসা পাওয়া যায় না। তুমি মানুষ, না কি! যে-মুহূর্তে স্বামী মারা গেল সেই মুহূর্ত থেকে ভূতে ভর করেছে তোমার ওপর। আমাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিয়েছ তুমি, লোভ দেখিয়ে মনে করছ খুনও করাতে পারবে। ঠিক অতখানি বোকা আমাকে কেন মনে করছ জানি না। অ্যাক্সিডেন্টের পর অনেক কিছু ভুলে গিয়েছি আমি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে মাথাটা তো আর খারাপ হয়ে যায়নি। লোভের বশে

অনেক কিছু ফস্কে যাচ্ছে তোমার দৃষ্টি থেকে। একটা মানুষকে খুন করে নিষ্কৃতি পাওয়া কি এতই সহজ? সেনানায়েককে টাকা দিয়ে বশ করা যাবে, কিন্তু নিজের মনকে বশ করবে কি দিয়ে? সারাজীবন বইতে হবে এই খুনের বোঝা, সমস্ত হাসি আনন্দের মধ্যে কাঁটার মত খচ্-খচ্ করবে—আমরা খুনী। সেনানায়কের লোভ বেড়ে যাবে, আরও টাকা চাইবে সে, আরও ক্ষমতা চাইবে। শেষ পর্যন্ত এ-সবকিছুর মালিক হতে চাওয়াও বিচিত্র নয়। এসব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দাও, রিটা। অন্যায় কোনদিন মঙ্গল আনে না। টাকা, ক্ষমতা এমন কি তোমার বিনিময়েও খুন করতে পারব না আমি।'

একটানা এতগুলো কথা বলে থামল রানা। একটি কথাও বলেনি রিটা এতক্ষণ। এবার উঠে এসে দাঁড়াল রানার সামনে।

'একটা কথা বুঝতে পারছ না কেন, রানা। এটা হত্যা নয়, আত্মরক্ষা। তুমি যদি ছেড়ে দাও, হুলুগাল ছাড়বে না তোমাকে। আত্মরক্ষার অধিকার সব মানুষেরই আছে। আর ভালবাসার কথা বাদ দিতে বলছ, কেন, ভালবাসি না আমি তোমাকে? প্রাণ-মন সঁপে দিইনি আমি তোমার হাতে?' আবার জড়িয়ে ধরল সে রানার কণ্ঠ। 'আমাকে ভুল বুঝছ কেন তুমি, রানা? এত প্ল্যান আমার কিসের জন্যে? তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধব···' জোর করে নিচু করল রিটা রানার মুখ। প্রায় ঝুলে আছে সে রানার গলা ধরে। 'আমাকে বিশ্বাস করো, রানা। ছি, পাগলামি কোরো না। হয় হুলুগাল মারা যাবে, নয় আমরা মারা যাব। আর কোনও পথ নেই!'

'বাহ্, চমৎকার নাটক জমেছে!' হুলুগালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল দরজার কাছ থেকে। 'তোমাদের দেখে মনে হত ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না, এখন দেখছি কাঁটা গিলে ফেলো!'

কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল রিটা রানার বুকের উপর। তারপর এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ। পিছন ফিরল রানা।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে হুলুগাল। হাতে সাইলেন্সার লাগানো একটা পিস্তল। মুখের হাসিতে বিদ্রূপ।

'কেউ কোনও কৌশল করবার চেষ্টা কোরো না,' পিস্তল ঝাঁকিয়ে একটা চেয়ারের দিকে দেখাল হুলুগাল। 'ওই চেয়ারে বসে পড়ো, মাসুদ রানা। আর তুমি বসো ওই ডিভানের ওপর। সাবধান, গুলি ছুঁড়তে একটুও দ্বিধা করব না আমি।'

ডিভানের উপর বসে পড়ল রিটা ক্লান্তভঙ্গিতে। মনে হলো এক্ষুণি জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়বে। নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসে পড়ল রানা বিনা বাক্য-ব্যয়ে। স্পষ্ট বুঝতে পারল হার্টবিট দ্বিগুণ হয়ে গেছে ওর।

'বেশ! চমৎকার!' মাতব্বরির চালে কথাটা বলে আরও একটু ঢুকে এল হুলুগাল ঘরের মধ্যে। বাম পায়ের ধাক্কায় বন্ধ করে দিল কপাট। 'তোমাদের ডিসটার্ব করতে হলো বলে আমি খুবই দুঃখিত।' পিস্তলটা দুইজনের মাঝখানটায় লক্ষ্য করে ধরে আছে হুলুগাল। 'চমৎকার নাটক চলছিল, আমি বেরসিক মানুষ, তাও দিলাম ভেঙে। কিন্তু তোমাদের কি একবারও মনে হয়নি কাল রাতে তোমরা কি করছ

দেখার জন্যে ফিরে আসতে পারি আমি?' এবার চাইল হুলুগাল রানার দিকে। জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ দুটো। 'কুমারস্বামীকে কি করেছ?'

কেউ কোনও উত্তর দিল না।

'মারা গেছে?' একটা চেয়ারে বসে পড়ল হুলুগাল। 'কি? খুন করেছ ওকে?'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার?' কোনমতে বলল রিটা অস্বাভাবিক কণ্ঠে। 'কলকাতার পথে রওনা হয়ে গেছে সে গতকালকেই।'

'নরকের পথে রওনা হয়ে গেছে, তাই বলতে চাইছ বোধহয়?' বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলল হুলুগাল। 'তুমি কি মনে করেছ গতরাতে তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করেছিলাম আমি? নটরাজ হিক্কার সাথে তোমাকে একা ছেড়ে দেবে এমন উদার লোক কুমারস্বামী নয়। তোমার চরিত্র সম্পর্কে আমি যেমন জানি কুমারও জানত পরিষ্কার।'

'আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলছ তুমি, হুলুগাল! চাকর হয়ে এত বড় স্পর্ধা তোমার!' ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল রিটা হঠাৎ।

রানার দিকে ইঙ্গিত করে বলল হুলুগাল, 'এক চাকরের স্পর্ধা দেখে আরেক চাকরের স্পর্ধা বাড়ে। যাক, যতক্ষণ পিস্তলটা হাতে আছে ততক্ষণ তোমরা দু'জনেই আমার চাকর। তিনজন ছিল গাড়িতে: তুমি, মাসুদ রানা আর কুমারস্বামী। তোমাদের মধ্যে একজন মারা গেছে। এই লোকটা হিক্কা নয়, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে—কাজেই এ হচ্ছে মাসুদ রানা। অতএব মৃত ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, রত্নসূর্য কুমারস্বামী। বুঝতেই পারছ, তোমাদের বানানো গল্প কেঁচে গেছে, স্বীকার করে নেয়াই ভাল।'

'শোনো, হুলুগাল,' রিটার দুই চোখে বশ্যতা স্বীকারের ভাব ফুটে উঠল। দুই হাতে হাঁটু জোড়া চেপে ধরেছে সে শক্ত করে। কথার গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে একটু। 'শোনো। তুমি, আমি আর রানা একটা চুক্তিতে আসতে পারি। আমরা তিনজন ছাড়া কেউ জানে না যে কুমার মারা গেছে। অর্ধেক শেয়ার যদি দাও তাহলে তোমার পক্ষে কাজ করতে পারি আমরা। আমাদের সাহায্যে কাজ উদ্ধার করতে পারবে তুমি সহজেই। অনেক তথ্য তুমি জানো না, যা আমি জানি। অনেক সুবিধা পেতে পারো তুমি আমাকে সাথে রাখলে।'

অবাক হলো হুলুগাল একটু। রানার দিকে চাইল সে একবার।

'কিন্তু এই লোকটাকে টানছ কেন? একে শেয়ার দেব কেন আমি?'

'ওর চেহারার দিকে চেয়ে দেখো একবার, তাহলেই বুঝতে পারবে। একনজরে দেখলে কে না বুঝবে যে লোকটা খুন করতে দ্বিধা করবে না? দুর্দান্ত ফাইটার ও। ওর মত একজন লোক সাথে থাকলে নটরাজ হিক্কা কাছে ভিড়তে সাহস পাবে না। ভেবে দেখো, খবরটা প্রকাশ পেলেই বাজপাখির মত উড়ে আসবে হিক্কা।'

অবাক হয়ে নিজের প্রয়োজনীয়তার বিবরণ শুনল রানা রিটার মুখে।

'যদি তোমার প্রস্তাবে রাজি না হই? শেয়ার দেবার ইচ্ছে যদি না থাকে

আমার, তাহলে?' জিজ্ঞেস করল হুলুগাল শান্ত কণ্ঠে। বোঝা গেল রিটার প্রস্তাবটা মনে মনে বিচার করছে সে।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজাল রিটা। মুখটা এখনও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, কিন্তু বোঝা গেল সামলে নিয়েছে অনেকখানি। সর্বস্ব বাজি ধরেছে যেন সে জুয়ার টেবিলে এমনি ভাবে বলল রিটা, 'তাহলে আমরা সব কথা প্রকাশ করে দেব। সেনানায়েক, নটরাজ, ডি সিলভা, সবাইকে বলে দেব আমরা আসল ব্যাপার। একা এদের সবাইকে ঠেকানোর সাধ্য নেই তোমার।'

হাসল হুলুগাল।

'তাহলে মারা গেছে কুমারস্বামী। বাহ্, গত বারো বছরে এত ভাল খবর আর পাইনি আমি। কুমার নেই! অ্যাঁ? আশ্চর্য, শুধুমাত্র এই খবরটার আশায় বারোটা বছর সময় নষ্ট করেছি আমি, অথচ কত সহজ ব্যাপার! বিশ্বাসই হতে চাইছে না!'

ডিভানের উপর থেকে একটা কুশন তুলে নিয়ে হাঁটুর উপর রাখল রিটা। এক টুকরো হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটের কোণে।

'অ্যাক্সিডেন্টটা সত্যিই ভয়ঙ্কর হয়েছিল। ঘাড় মটকে গিয়েছিল কুমারের। ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল গাড়ি থেকে,' বলল রিটা।

'ওটা তো তোমাদের বানানো গল্প হিসেবেও ধরতে পারে পুলিস,' বলল হুলুগাল। 'এমনও তো হতে পারে যে তোমরা দু'জন খুন করেছ ওকে? আমি ইচ্ছে করলেই খুনের দায় চাপাতে পারি তোমাদের কাঁধে, সেটা হয়তো খেয়াল করোনি এতক্ষণ। হাজার দশেক দিলেই সেনানায়েক চার্জ খাড়া করে ফেলবে তোমাদের বিরুদ্ধে। বেচারার টাকার টানাটানি যাচ্ছে।'

রানা বুঝতে পারল, রিটা যদি ডালে ডালে থাকে, এ ব্যাটা থাকে পাতায় পাতায়।

'কিন্তু তাহলে কুমারের মৃত্যুসংবাদটা বন্ধ হচ্ছে না,' বলল রিটা গম্ভীর কণ্ঠে।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল হুলুগাল। 'তবে বোধহয় এ খবর ঠেকানোর আর উপায়ও নেই। আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা এবার একটু বুঝবার চেষ্টা করে দেখো। তোমাদের দুই-একটা টুকরো কথাবার্তা হঠাৎ কানে গেল আমার। আমার মনে হলো কুমারকে খুন করেছ তোমরা। হঠাৎ দেখে ফেললে তোমরা আমাকে। মাসুদ রানা ঝট্ করে পিস্তল বের করল। কিন্তু তার আগেই আমি পিস্তল বের করে গুলি করে বসলাম। গেল এক নম্বর। এবার তুমিও পিস্তল বের করলে একটা। তোমাকেও শেষ করে দিলাম। গেল দুই। তারপর সেনানায়েককে বললাম কিছু টাকার বিনিময়ে সব ঠিকঠাক করে দিতে। প্রয়োজন বোধ করলে একটা ছোট-খাট শেয়ারও না হয় দেয়া যাবে সেনানায়েককে। খবরটাও চাপা থাকল। হিক্কা পৌঁছবার আগেই গুছিয়ে নেয়া গেল সবকিছু।'

'সেনানায়েককে এর ভিতর টানলেই মরেছ, হুলুগাল,' বলল রিটা পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে। 'সবটাই গ্রাস করবে ও ক্রমে ক্রমে। ওকে ঠেকানোর সাধ্য তোমার হবে না।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল হুলুগাল চিন্তান্বিত ভঙ্গিতে।

'খুব সম্ভব ঠিকই বলছ। কিন্তু এছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না।'

'আরেকটা উপায় আছে,' বলল রিটা নরম গলায়।

'কি উপায়?'

রানার দিকে চাইল রিটা। রানা চাইতেই আবছা ইঙ্গিত করল সে তার তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে। ধড়াস করে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড।

'আমার মনে হচ্ছে আমাদের পক্ষে এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে তোমাকে খুন করে ফেলা। তুমি ঘরে ঢুকবার একটু আগে পর্যন্ত এই নিয়েই আলাপ করছিলাম আমরা।'

মুখের হাসি একটুও পরিবর্তন হলো না, কিন্তু দৃষ্টিটা কঠোর হয়ে গেল হুলুগালের।

'আমি শুনেছি তোমাদের আলাপ। সেইজন্যেই তো আমার পথটাই আমার কাছে বেশি পছন্দ হচ্ছে। আমার ইচ্ছেটাই চরিতার্থ করবার জন্যে ঢুকেছি আমি এই ঘরে। প্রস্তুত হয়ে নাও—এক্ষুণি গুলি করব আমি।'

'তাহলে সেফটি-ক্যাচটা অফ করে নিতে হবে।'

এমন সহজভাবে কথাটা বলল রিটা যে রানাও চাইল পিস্তলটার দিকে। হুলুগালের দৃষ্টিটাও ওদের ওপর থেকে সরে পিস্তলের উপর পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে ছুঁড়ল রিটা কুশনটা। সোজা গিয়ে হুলুগালের মুখে লাগল কুশন। সাথে সাথেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রিটা ওর ওপর ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মত। পিস্তল ধরা হাতটা চেপে ধরল সে দুই হাতে, একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে ট্রিগারের পিছন দিকে, যেন গুলি ছোঁড়া না যায়।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা চেয়ার ছেড়ে। ধস্তাধস্তি করছে হুলুগাল রিটার হাত ছাড়াবার জন্যে। বামহাতে কিল মারছে রিটার পিঠে। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে রিটা ওর পিস্তল ধরা হাতটা, ছাড়াতে পারল না হুলুগাল রানা পৌঁছে যাবার আগে।

দড়াম করে মারল রানা লোকটার নাকের ব্রিজের উপর। তারপরই মারল গলার একপাশে কারাতের দা চালানো কোপ। হুড়মুড় করে পড়ল হুলুগাল কার্পেটের উপর। পিস্তলটা রয়ে গেল রিটার হাতে। তলপেটে সই করে একটা লাথি মারতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ফট করে একটা শব্দ হলো কানের পাশে। রানা চেয়ে দেখল একটা চোখ অদৃশ্য হয়ে গেছে হুলুগালের। রিটার হাতে ধরা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের মুখে সরু একফালি ধোঁয়া। একবার কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল হুলুগালের দেহটা।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল দু'জন কার্পেটের ওপর পড়ে থাকা দেহটার দিকে। জুলফিটা লাল হয়ে গেছে রক্তে ভিজে। ঠোঁটের কাছে নেমেছে রক্তের ধারা, নাক বেয়ে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে রানা ও রিটা।

কেউ নড়ল না এক পা-ও। দু'জনেই চেয়ে রয়েছে কার্পেটের উপর পড়ে থাকা দেহটার দিকে।

মারা গেছে হুলুগাল।

একুশ

'মারা গেছে!' বলল রানা ফিসফিস করে।

এক পা পিছিয়ে গেল রিটা। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একটা। তারপর বাথরুম থেকে একটা তোয়ালে নিয়ে এল। চুল ধরে হুলুগালের মাথাটা তুলে ভাঁজ করা তোয়ালে রাখল নিচে। আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতেই রানা দেখল লাল হয়ে গেছে রিটার বাম হাত রক্ত লেগে। জ্বলজ্বল করছে অনামিকার রক্তমুখী নীলাটা রক্ত পান করে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সে রক্তমাখা হাতটার দিকে।

'কি হলো, রানা? এমন করে চেয়ে রয়েছ কেন?'

'খুন করলে তুমি ওকে!'

'বাহ্, খুন করব না? নইলে ও আমাদের খুন করত। শোনো, রানা, বোকার মত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না—অনেক কাজ বাকি আছে আমাদের। এখন বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচতে হবে আমাদেরকে। নিজেকে শক্ত রাখবার চেষ্টা করো।'

'খুনের দায়ে ধরবে আমাদের পুলিস!'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল রিটা।

'বোকার মত কথা বোলো না, রানা। পথের কাঁটা সরানো গেছে, এখন পিছিয়ে যাবার কোন মানে হয়? হুলুগাল নেই, কাজেই ক্যাসিনো এখন আমার। কেউ ঠেকাতে পারবে মনে করেছ আমাদের আর?'

জ্বলজ্বল করছে রিটার চোখ, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে অল্প একটু। উত্তেজনায় সমস্ত রক্ত এসে জমা হয়েছে যেন ওর মুখে। কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিল ওকে রিটা।

'বসো, রানা, একটু শান্ত হওয়ার চেষ্টা করো। পুল ইয়োরসেলফ টুগেদার। সব ঠিক হয়ে যাবে। মনের জোর দরকার শুধু। আমি ঠিক করে দিচ্ছি সবকিছু। কিচ্ছু চিন্তা কোরো না তুমি।'

'কি করে ঠিক করবে? সারাজীবন এই খুনের বোঝা বইবে কি করে তুমি? তোমার কি হৃদয় বলতে কিছু নেই?'

'না। আমি ভ্যাম্পায়ার। মানুষের জীবনে আমি অভিশাপ। যার ওপর ভর করি তার আর নিস্তার নেই আমার হাত থেকে। আমার সম্বন্ধে এই তো ভাবছ? যা ইচ্ছে ভাবতে পারো। কিন্তু এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে আমাদের। যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এর সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। এমন সুযোগ জীবনে আসবে না আর। বাঘের গর্তে ফেলে দেব আমরা এই লাশটা। সবাই জানবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটা।'

'বাঘের খাঁচায় ফেলে দেবে, আর সবাই চোখ বন্ধ করে থাকবে? দেখবে না কেউ?' বলল রানা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে।

'মাথা ঠিক রাখো, রানা। কেন মিছেমিছি আজেবাজে বকছ? রাতের বেলা

ফেলব আমরা ওটা বাঘের গর্তে। কেউ কোনকিছু সন্দেহ করবে না। নিজহাতে খাবার দেয় হুলুগাল বাঘগুলোকে, মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক হাণ্টার নিয়ে সে ভেতরেও নামে। সবাই জানে যে-কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে একটা কিছু। সেনানায়েকও জানে। কাজেই কারও মনে কোন সন্দেহ জাগবে না। আমরা যদি এখন ভুল করে না বসি সবাই জানবে, যেটা একদিন না একদিন ঘটতই, সেই দুর্ঘটনাটাই ঘটেছে। ইটস ফুলপ্রুফ। কোন ঝুঁকি নেই আমাদের। বুঝেছ?'

কয়েকটা মাকড়সা যেন শিরশির করে উঠে এল রানার শিরদাঁড়া বেয়ে। মেয়েলোকটা মানুষ না পিশাচ? স্বার্থসিদ্ধির জন্যে করতে পারে না এমন কাজ নেই। যে-কোন বিপদ আসুক না কেন একটা না একটা পথ বের করে ফেলছে সঙ্গে সঙ্গে। কুমারস্বামীর মৃতদেহটা ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছে সে ক্যাসিনো দখলের। হুলুগালের রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি এখনও, প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছে বিপদমুক্তির।

'বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই? কাজেই এখন বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে না থেকে লাশটা বাথরুমের মধ্যে টেনে দিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

'বেরিয়ে যাব? কেন? তুমি কি করবে?'

'আমি মড়াটাকে খাব! গর্দভ কোথাকার!' ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল রিটা। 'দেখো, এই খুনের ব্যাপারে তুমিও জড়িয়ে আছ আমার সঙ্গে। কাজেই যা বলছি তাই করতে হবে তোমাকে। এখান থেকে বেরিয়ে ক্যাসিনোর আশপাশে এদিক-ওদিকে ঘুরঘুর করো গিয়ে। ইচ্ছে হয় মদ খাও, ইচ্ছে হয় সমুদ্রে সাঁতার কাটো, সন্ধ্যার পর দু'দশ দান জুয়া খেলতে পারো, রাত দশটার আগে কিছুতেই আসবে না এখানে। কেউ যদি হুলুগালের কথা জিজ্ঞেস করে, বলবে আমার ঘরে আছে ও, কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

'খেলাধুলো করে বেড়াব! পাগল নাকি তুমি?'

'পাগল তুমি। খেলাধুলো না করতে পারো, যা খুশি তাই করো গিয়ে। লোকজনের মধ্যে ঘোরাফেরা করো, যেন সবাই দেখতে পায় তোমাকে। এই কেবিন থেকে লোকদের দূরে সরিয়ে রাখাই তোমার কাজ। ওদেরকে বুঝিয়ে বলবে যে আমরা দু'জন এত ব্যস্ত আছি যে কেউ বিরক্ত করলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব। বুঝেছ? নাউ, গেট আউট। আপাতত এই তোমার কাজ।'

'আর তোমার?'

'আমার কাজ হচ্ছে দশটা পর্যন্ত মড়া আগলে বসে থাকা। যেন কেউ হুলুগালকে খুঁজে না পায়, অথচ জানতে পারে যে সে এই কেবিনেই আছে, উধাও হয়ে যায়নি—এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাই আমি। বাকি কাজ সহজ। যাও এবার। এটাকে বাথরুমে টেনে দিয়ে বেরিয়ে যাও।'

হুলুগালের মৃতদেহটা বাথরুমের ভিতর টেনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা, পিছু ডাকল রিটা।

'শোনো। আরেকটা কথা।'

দাঁড়াল রানা।

'বিশ্বাসভঙ্গ কোরো না, রানা? ভয় পেয়ে পালিয়ে যেয়ো না। ইচ্ছে করবে, কিন্তু যেয়ো না। তোমাকে ছাড়া ঢাকা দিতে পারব না আমি এই হত্যাকাণ্ড। তোমার সাহায্য আমার দরকার। কাজেই পালিয়ে যেয়ো না।'

'আমি পালাব না।'

'হয়তো ইচ্ছে করবে। সাত ঘণ্টার ছুটি পেয়ে পালাবার ইচ্ছে দমন করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে তোমার পক্ষে। যদি পালাও আমি সেনানায়েককে বলব তুমি খুন করেছ একে। সেনানায়েকের বিশ্বাস জন্মানো আমার পক্ষে কঠিন কিছুই নয়।'

'বললাম তো, পালাব না আমি,' বলল রানা ভাঙা গলায়। কাছে এসে রানার গলা জড়িয়ে ধরল রিটা। শিউরে উঠল রানার শরীর।

'আমাকে ভালবাসো তুমি, বাসো না, রানা? দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে, পায়ের ওপর পা তুলে কাটবে আমাদের বাকি জীবন। তুমি আর আমি।'

কোন উত্তর বেরোল না রানার মুখ থেকে। ঘাড়ের পিছনে রিটার রক্তমাখা হাত। আরেকবার শিউরে উঠল সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও। এক ঝটকায় সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করল ওর হাতটা। কিন্তু সাহস হলো না। গোক্ষুরের মত ভয়ঙ্কর এই স্ত্রীলোক। একটু এদিক-ওদিক হলেই খুনের দায় চাপিয়ে দেবে কাঁধের উপর। কাজেই দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিল, ভিতর ভিতর ঘৃণায় ভরে গেল ওর অন্তর।

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি,' বলল রিটা রানার গালে গাল ঘষে। 'মাথাটা ঠিক রেখো, রানা, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বেরিয়ে এল রানা ঠাণ্ডা কেবিন থেকে। বাইরে বেরোতেই গরম হাওয়ার ঝাপটা লাগল ওর চোখেমুখে। প্রাণপণে দৌড় দিতে ইচ্ছে করল। এই কেবিন থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারল, ফিরে তাকে আসতে হবেই।

বাইশ

সোজা বারে গিয়ে ঢুকল রানা। ঘোড়ার খুরের মত টেবিল, সামনে চেয়ার সাজানো। অনেকগুলো ঝকঝকে আয়না লাগানো আছে চারদিকে। একটিও লোক নেই।

দেয়াল ঘড়িতে বাজছে সোয়া তিনটে। মদ্যপানের জন্যে অসময় এটা। কিন্তু তবু কিছু খেতেই হবে রানাকে। নইলে নিজের দেহটাই নিজের বশে থাকতে চাইছে না।

একটা পর্দা সরিয়ে বারম্যান ভদ্র অথচ প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে। হালকা-পাতলা লম্বা লোক। মাথার মাঝখানে টাকটা গম্বুজের মত উঁচু হয়ে আছে। গিন্নীর মেজাজের মত কড়া ইস্তিরি করা ধবধবে সাদা কোট পরনে।

'বলুন, মিস্টার হিক্কা?'

'স্কচ। একটা বোতল নিয়ে এসো।' কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরোল রানার

কণ্ঠ থেকে।

'আনছি, স্যার, এক্ষুণি।'

একটা আনকোরা বোতল নিয়ে এল বারম্যান, সাথে একটা গ্লাস। রানা তুলে নিল বোতলটা টেবিলের উপর থেকে। ত্রস্ত হাতে গ্লাসে ঢালতে গিয়ে টেবিলের উপর ছলকে পড়ল খানিকটা। হাত কাঁপছে রানার। লক্ষ করছে সেটা বারম্যান।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? যাও এখান থেকে!' ধমকে উঠল রানা।

'যাচ্ছি, স্যার।' পর্দার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

কাঁপা হাতে মুখে তুলল রানা গ্লাসটা। অর্ধেক নামল গলা দিয়ে, বাকিটুকু পড়ে গেল মাটিতে। জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল তরল পদার্থটুকু কণ্ঠনালী দিয়ে। এবার আরও আধ গ্লাস ঢালল রানা। কাঁপুনি কমে গেছে অনেকটা। গ্লাসটা শেষ হতেই অনুভব করতে পারল সে, বিভীষিকাটা সরে যাচ্ছে ওর মন থেকে।

বারম্যানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যে খারাপ লাগল ওর। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল কেউ লক্ষ করছে না ওকে। সাতটি ঘণ্টা! কি করবে সে এই সাত ঘণ্টা?

ক্যাসিনোর বাইরে রাখা সাদা বুইকটার কথা মনে পড়ল ওর। চাবিটা সরিয়ে ফেলেছে সে হুলুগালের পকেট থেকে লাশটা বাথরুমে টেনে নেবার সময়। ওটা বের করে রাখল বোতলের পাশে। সাত ঘণ্টার মধ্যে সাত সমুদ্দুর পার হয়ে যেতে পারবে সে ওই গাড়িতে করে। যাবে নাকি?

কথাটা মনে আসতেই আতঙ্কিত রানা আরও কিছুটা হুইস্কি ঢালল বোতল থেকে। ঠিক যখন ঢালা শেষ হয়েছে এমনি সময় পর্দার ওপাশে টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনের তীক্ষ্ণ শব্দে চমকে উঠল রানা। আর একটু হলে বোতল ছুটে যেত হাত থেকে।

বারম্যানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'এখানে তো নেই, ম্যাডাম।···লাঞ্চের পর আর আমার সঙ্গে দেখা হয়নি···ঠিক আছে, দেখা হলেই বলব।'

উৎকর্ণ হয়ে শুনল রানা কথাগুলো। হার্টবিট বেড়ে গেল ওর। এক্ষুণি খোঁজ পড়ে গেল হুলুগালের! কিছু একটা করা দরকার।

'এই যে। শোনো তো এদিকে,' হাঁক ছাড়ল রানা।

পর্দার ফাঁক থেকে মুখ বের করল বারম্যান।

'বলুন, মিস্টার হিক্কা।'

'কে ফোন করেছিল?'

'মিস অনুরাধা। মিস্টার হুলুগালের সেক্রেটারি। আর্জেন্ট কল এসেছে একটা বাইরে থেকে, মিস্টার হুলুগালকে খুঁজছে। আপনি দেখেছেন নাকি ওনাকে, স্যার?'

কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পেল রানা হুলুগালের মৃত চেহারাটা। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে এখন রিটার বাথরুমে। চোখটা সরিয়ে নিল রানা অন্যদিকে, পাছে বারম্যান বুঝে ফেলে কিছু। তারপর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'মিসেস কুমারস্বামীর ঘরে আছে হুলুগাল। কিন্তু ব্যস্ত আছে ওরা। আমাকে বলে দিয়েছে

যেন কোনও অবস্থাতেই বিরক্ত না করা হয় ওদের।'

রানার ইঙ্গিত বুঝতে পারল বারম্যান। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'মিস অনুরাধাকে বলে দাও, ওরা যে কাজে ব্যস্ত আছে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে এখন বিরক্ত করলে।'

'বলে দিচ্ছি, মিস্টার হিক্কা।'

কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে পারল রানা ভয়ানক ব্যথিত হয়েছে বারম্যান। একটু বেশিই বলেছে সে। কুমারস্বামীর স্ত্রীর এই পরিচয় জেনে আঘাত পেয়েছে পুরাতন ভৃত্য। পর্দার আড়ালে গিয়েই টেলিফোন তুলল সে। রানা শুনতে পেল লোকটা বলছে, 'মিস্টার হিক্কা রয়েছেন বারে। উনি বলছেন ম্যানেজার সাহেব মিসেস কুমারস্বামীর ঘরে আছেন, যেন বিরক্ত না করা হয়।···হ্যাঁ! যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই থাকুক না কেন বিরক্ত করা চলবে না।'

কপালের ঘাম মুছল রানা। হুইস্কির প্রভাব পড়তে আরম্ভ করেছে ওর উপর। দুনিয়াটা সমস্যাশূন্য হয়ে আসছে। গ্লাসটা শেষ করে ছিপি লাগিয়ে দিল সে বোতলে। আর নয়। মাথা ঠিক রাখতে হবে এখন। উঠে পড়া দরকার।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এল সে ক্যাসিনোর সামনে। দাঁড়িয়ে রয়েছে বুইকটা। ঝট্ করে যদি ওটাতে উঠে পড়ে···চোখ সরিয়ে নিল রানা গাড়ির উপর থেকে। নিজের ইচ্ছাকে দমন করতে হবে নিষ্ঠুর হাতে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ একটা শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গর্‌র্ গর্‌র্ শব্দে কেঁপে উঠল যেন মাটি। প্রাণ খুলে ডাক ছাড়ল একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। নিজের অজান্তেই এগোচ্ছিল রানা চিড়িয়াখানার দিকে। ওই গর্তের মধ্যেই ফেলতে হবে তাকে হুলুগালের দেহটা। আজই রাত দশটার সময়। হাঁটু দুটো দুর্বল হয়ে গেছে যেন, শক্তি পাচ্ছে না রানা আর।

আবার চাইল রানা বুইকটার দিকে। আর মন মানল না কিছুতেই। এক লাফে উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। মৃদু গর্জন তুলে স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে চাইল রানা একবার। কেউ চিৎকার করে ডাকছে না, কেউ থামাবার চেষ্টা করছে না ওকে। দুই মিনিটেই পঞ্চাশে উঠে গেল গাড়ির গতি। আর দুই মিনিটেই বড় রাস্তায় পড়ে সোজা ছুটবে সে কলম্বোর পথে। পেট্রল নিতে হবে কিনা দেখল রানা। না, মিটারের কাঁটা ফুল-ট্যাঙ্ক শো করছে।

সামনেই দেখতে পেল রানা প্রকাণ্ড লোহার গেট, দু'পাট খোলা। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল গেটটা। কালো ইউনিফরম পরা দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। কি ব্যাপার? হর্ন দিল রানা। স্পীড কমাল একটু। আশা করল ব্যস্তসমস্ত হয়ে খুলে দেবে প্রহরী গেটটা। কিন্তু কেউ নড়ল না ওরা। গেট খোলার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না ওদের ব্যবহারে। চেয়ে রয়েছে ওরা রানার মুখের দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে।

গাড়ি থামাল রানা।

'কি হে, গেটটা কি টপকে পেরোতে হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা কর্কশ কণ্ঠে।

এগিয়ে এল একজন গার্ড। দুর্ধর্ষ চেহারা, কুঁতকুঁতে দুই চোখ কাছাকাছি

বসানো, নাকটা ছড়িয়ে আছে সারা মুখময়।

'আপনার জন্যে একটা সংবাদ আছে, স্যার।'

'কি সংবাদ?' স্টিয়ারিং হুইলটা চেপে ধরল রানা শক্ত করে।

'মিসেস কুমারস্বামী খবর দিয়েছেন আপনি যদি এদিকে আসেন তাহলে যেন আপনাকে ফেরত পাঠানো হয়। ম্যানেজার সাহেব আর উনি দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।'

নাগালের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটু সামনে ঝুঁকে কথা বলছে গার্ডটা। রানা বুঝল এক সেকেণ্ডে চিৎ করে দেয়া যায় একে। আড়চোখে চাইল সে দ্বিতীয় প্রহরীটার দিকে। রিভলভারের বাঁটের ওপর আলগোছে হাত রেখে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে সে রানার উপর। প্রস্তুত আছে সে যে-কোনও ঘটনার জন্যে। সুবিধে হবে না এখন আক্রমণ করে।

'ঠিক আছে,' বলল রানা কাষ্ঠ হাসি হেসে। 'ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। গেট খুলে দাও, তাড়া আছে।'

জুলজুলে চোখে চেয়ে রইল গার্ডটা রানার দিকে।

'তাহলে, স্যার, মনে হচ্ছে ওঁরা আবার দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে। এইমাত্র টেলিফোন পেলাম। আমি দুঃখিত, আমাদের কিছুই করবার নেই, স্যার, হুকুম তামিল করতেই রাখা হয়েছে আমাদের।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলল রানা রাগতস্বরে। 'দেখছি আমি কি চায় ওরা।'

ব্যাক গিয়ার দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা। ক্যাসিনোর সামনে গাড়িটা ছেড়ে নেমে গেল সে। চাবিটা গাড়িতেই রয়ে গেল। রিটাকে ফাঁকি দেয়া অত সহজ নয়। সবদিকে লক্ষ রেখেছে। বোকামি রানারই হয়েছে, আগেই বোঝা উচিত ছিল ওর।

সী-বীচের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল সে এবার। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। চমকে উঠল একটি নারীকণ্ঠ শুনে। একটা হুড খোলা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে রানার পাশে।

'চলে আসুন, আমিও এইদিকেই যাচ্ছি। একসাথেই যাওয়া যাক।'

রানা চেয়ে দেখল আহ্বান করছে ওকে সুইমিং কস্টিউম পরা এক ধনীর দুলালী। চাহনিতে বিজলী হেনে ইঙ্গিত করল সে রানাকে গাড়িতে উঠবার জন্যে। এত বেহায়া আহ্বান বোধহয় রিটার রুচিতেও বাধবে।

দরজা খুলে উঠে বসল রানা মেয়েটির পাশে। ভুলে থাকতে চায় সে কিছুক্ষণ।

দক্ষ হাতে গাড়ি চালাচ্ছে মেয়েটি, মোড় ঘুরতে গিয়ে ইচ্ছে করেই ঢলে পড়ছে রানার গায়ে। আড়চোখে দেখছে রানার প্রতিক্রিয়া।

'তোমাকে আজ সকালে একনজর দেখেই বুঝতে পেরেছি তোমার সাথে পরিচিত হতেই হবে আমাকে,' বলল মেয়েটি। 'অদ্ভুত এক পৌরুষ আছে তোমার মধ্যে। চুম্বকের মত টানছে সে-পৌরুষ আমাকে।'

রানা ভাবল লঙ্কা দ্বীপ কি আমেরিকা হতে চলল? পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়ে কি এরা রাতারাতি পশ্চিমা হয়ে গেল সবাই? লাজলজ্জা, রাখঢাকের বালাই নেই

কেন? নাকি বড় লোকের নষ্ট হয়ে যাওয়া মেয়ে এটা? কিংবা পাগল? কোনও জবাব দিল না রানা মেয়েটির কথার।

'সাঁতার কাটতে চলেছিলে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি আবার।

'না। এমনি বেড়াতে যাচ্ছিলাম সাগর তীরে।'

'চলো, তোমাকে চমৎকার নির্জন একটা জায়গা থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। তোমার নাম নটরাজ হিক্কা, তাই না?'

'তুমি জানলে কি করে?'

'সবাই বলাবলি করছে তোমার কথা। জাফনার বিখ্যাত গ্যাঙস্টার তুমি—আমার তো মনে হয় সিংহলের প্রত্যেকটা লোক তোমার নাম জানে। গ্যাঙস্টারদের আমার খুব ভাল লাগে।'

'ভাল, সুখবর। কিন্তু তুমি কে?'

'আমি অণিমা দেওয়ার। কোটিপতি হনুমান দেওয়ারের একমাত্র কন্যা। সবাই চেনে আমাকে। আমার বাবা তিনটে টী-এস্টেটের মালিক।'

'উনিও কি গ্যাঙস্টার ভালবাসেন?'

খিলখিল করে হেসে রানার গায়ে গড়িয়ে পড়ল অণিমা দেওয়ার।

'জিজ্ঞেস করিনি কখনও।'

মাইল তিনেক সমুদ্রের তীর ধরে এগিয়ে কয়েকটা নারকেল গাছের ছায়ায় থামাল অণিমা গাড়িটা। নেমে পড়ল দু'জন গাড়ি থেকে।

'যাকেই পছন্দ হয় তাকে নিয়ে চলে আসি আমি এইখানে। কাটিয়ে যাই এক-দু'ঘণ্টা। নিশ্চিন্তে জামা-কাপড় ছাড়তে পারো। কেউ দেখবে না। চলো, আগে সাঁতার কেটে আসি খানিকটা...'

রানা বুঝল এর সঙ্গে এখানে আসা ভুল হয়ে গেছে। ক্যাসিনো কম্পাউণ্ডে লোকজনের মধ্যে থাকা দরকার ছিল ওর, যাতে কেউ হুলুগালের কথা জিজ্ঞেস করলেই সদুত্তর দেয়া যায়। পালাতে যখন পারলই না, তখন ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করাই উচিত। এই নষ্ট-চরিত্রা মূর্খ ধনীর দুলালীকে অখুশি করে হলেও ফিরে যেতে হবে ওকে এক্ষুণি। এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

'না, অণিমা, আমি সাঁতার কাটব না।'

'কেন? সাঁতার জানো না?' অবাক হলো অণিমা।

'জানি। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত, একটা কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। এক্ষুণি ফিরতে হবে আমাকে। গাড়িতে করে আমাকে পৌঁছে দেয়া বোধহয় তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না?'

হাসিটা মুছে গেল অণিমার মুখ থেকে। অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে ওর। রানাকে সাথে নিয়ে এসে ওকে ধন্য করে দিয়েছে, এই ধারণাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতেই কালো হয়ে গেছে ওর মুখ। অপমানিত বোধ করছে সে।

'বুঝলাম না কি বলতে চাইছ!' জিজ্ঞেস করল সে ভ্রূ কুঁচকে।

'ঠিক আছে, আমি হেঁটেই চলে যাব। কিছু মনে কোরো না। তুমি সাঁতার কাটো, আমি চলি।'

ঠাস্ করে চড় পড়ল রানার গালে। দ্বিরুক্তি না করে ঘুরেই হাঁটতে আরম্ভ করল রানা—পিছন ফিরে চাইল না একবারও। মেয়েটিও আর গোলমাল করল না। পাঁচ মিনিট হাঁটার পর পিছনে গাড়ির শব্দে সরে দাঁড়াল রানা রাস্তা ছেড়ে। একরাশ বালি উড়িয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা পাশ দিয়ে।

সমুদ্রের পারে সারি সারি নারকেল গাছ। একটু ওপাশেই ঝোপ-ঝাড় আর জঙ্গল। রাস্তা ছেড়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কোণাকুণি ক্যাসিনোর দিকে রওনা হলো রানা তাড়াতাড়ি হবে বলে। আপন মনে হাঁটছিল সে, কখন যে দিক হারিয়ে ফেলেছে বুঝতে পারেনি। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর হঠাৎ খেয়াল করল ক্যাসিনোর চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। থেমে দাঁড়িয়ে চারদিকে চাইল রানা।

ডানদিকে সমুদ্র দেখা গেল গাছের ফাঁক দিয়ে। আরে! সমুদ্রটা বামধার থেকে ডানধারে চলে এল কি করে? নিশ্চয়ই পথ ভুল করেছে সে। বামধারে একটা পাহাড় থেকে ছোট্ট একটা ঝর্না নেমে নাচতে নাচতে চলেছে দেড়শো গজ দূরের সমুদ্রের দিকে। চারদিকে শান্ত সমাহিত ভাব। সত্যিই পথ হারিয়ে ফেলেছে রানা।

অথচ এক্ষুণি ক্যাসিনোতে ফিরে যাওয়া দরকার। সমুদ্রকে বাঁয়ে রেখে এগোতে যাবে সে, এমনি সময় মিষ্টি একটা সুর ভেসে এল ওর কানে। কাছেই কোথাও গান গাইছে একটি মেয়ে। হিন্দী দেহাতী কোনও গান, পরিচিত ঠেকল সুরটা রানার কানে। এই বিজন বনে এমন মিষ্টি সুরে কে গান গায়? এত মধু মানুষের কণ্ঠে থাকতে পারে!

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে পড়ল মন্ত্রমুগ্ধ রানা। কানখাড়া করে শুনছে সে মধুঝরা কণ্ঠের সুরেলা সুর। বোঝা গেল আনমনে গান গাইছে মেয়েটি, আসলে অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত সে। সমুদ্র তীরের এই নির্জন জঙ্গলে কি করছে মেয়েটি? নিজের অজান্তেই পায়ে পায়ে এগোল রানা।

ঝর্নার ধারে একটা বড় পাথরের চাঁই-এর কাছে এসেই দেখতে পেল রানা মেয়েটিকে। একটা ছোট্ট ফ্লেকসিবল চেয়ারে বসে আছে, সামনে ছবি আঁকবার ইজেল। ওয়াটার কালার দিয়ে ছবি আঁকছে আর আনমনে গান গাইছে সে। কি আঁকছে দেখতে পেল না রানা, কারণ প্রায় রানার দিকেই মুখ করে বসেছে মেয়েটি। কিন্তু ছবি দেখবার কৌতূহল জাগল না রানার মনে একটিবারও। অবাক চোখে চেয়ে রইল সে মেয়েটির মুখের দিকে।

কমলা রঙের একটা সুতির শাড়ি আর কালো ব্লাউজে অপূর্ব লাগছে মেয়েটিকে দেখতে। আঁচলটা পেঁচিয়ে এনে কোমরে গোঁজা। এলোখোঁপায় একটা শুভ্র রজনীগন্ধার গুচ্ছ। একবিন্দু প্রসাধন নেই। আয়ত দুই চোখ স্থির হয়ে আছে ছবির উপর। হাতে তুলি। এমন শান্ত, সৌম্য, পবিত্র নারীমূর্তি দেখেনি জীবনে রানা। বহু অণিমা দেখেছে বহু রিটা দেখেছে, কিন্তু সত্যিকার নারী যেন এই প্রথম দেখল। সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময় এসে বাসা বাঁধল রানার দুই মুগ্ধ চোখে।

চোখ ফেরাতে পারল না রানা। দাঁড়িয়ে রইল সে কাঠ-পুতুল হয়ে। অণিমা, রিটা, হলুগাল আর বাঘের গর্তের বিভীষিকা দূর হয়ে গেল ওর মন থেকে। অন্ধকার ছেড়ে আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে যেন সে।

তেইশ

প্রায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল রানা। আপন মনে গান গাইছে মেয়েটি, ফর্সা একটা হাত ব্যস্ত হয়ে আছে রঙ-তুলি নিয়ে। মাঝে মাঝে একটু পিছনে হেলে দেখছে সে ছবিটা। আবার সামনে এগিয়ে শুধরে নিচ্ছে ত্রুটিগুলো। হঠাৎ মাথা তুলল মেয়েটি। হয়তো অনুভব করতে পেরেছিল কেউ লক্ষ করছে ওকে। চমকে উঠল সে রানাকে দেখে। হাত থেকে পড়ে গেল তুলি।

পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল রানা।

'মাফ করবেন। আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটল। আপনার গান শুনে কৌতূহল চাপতে না পেরে চলে এসেছি।'

এছাড়া আর কিছু বক্তব্য খুঁজে পেল না রানা। ব্যাখ্যাটা বিশেষ সুবিধের হলো না, কিন্তু রানা অনুভব করল রিটার কেবিন ছেড়ে বেরোবার পর এই প্রথম ওর গলা থেকে কোলা ব্যাঙের আওয়াজ না বেরিয়ে স্বাভাবিক স্বর বেরুল।

নিচু হয়ে ব্রাশটা তুলে নিল মেয়েটি। একটি কথাও বলল না।

'পথ হারিয়ে ফেলেছি। খুব সম্ভব হারিয়ে গেছি আমি,' বলল রানা। 'গোল্ডেন ক্যাসিনোটা কোন্ দিকে বলতে পারবেন?'

এইবার কিছুটা আশ্বস্ত হলো মেয়েটি।

'পথ হারিয়ে এতদূর চলে এলেন কি করে?'

'একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে গাড়িতে এসেছিলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় হেঁটে ফিরছিলাম ক্যাসিনোতে।'

'ও, বুঝেছি। কোনাকুনি শর্টকাট করতে চেয়েছিলেন বুঝি?'

হাসল মেয়েটি।

'হ্যাঁ।' আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রানা যাতে ছবিটা দেখা যায়। নীল আকাশ, পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে চঞ্চল একটা ঝর্না ছোট-বড় পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। 'বাহ্, চমৎকার!' বলল রানা। 'একদম জ্যান্ত মনে হচ্ছে ঝর্নাটাকে।'

মজা পেল মেয়েটি এই আনাড়ী প্রশংসা শুনে। ঝিক করে হেসে উঠল সে।

'বা রে, মনে হবে না? ওটাই তো এঁকেছি।'

'আমি আঁকলে মনে হবে না,' বলল রানা। হাসল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বলুন তো, ক্যাসিনো থেকে কতদূরে আছি আমি এখন?'

'মাইল পাঁচেক। আপনি উল্টোদিকে চলেছেন।'

ধুলো লেগে যাওয়া তুলিটা পানিতে ডুবিয়ে পরিষ্কার করে নিল মেয়েটি।

'অর্থাৎ ক্যাসিনোর এলাকা ছাড়িয়ে চলে এসেছি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। আপনি আমার এলাকায় দাঁড়িয়ে আছেন।'

'আমি দুঃখিত। অনধিকার প্রবেশ করতে চাইনি আমি আসলে।'

'সেকথা বলিনি আমি,' মিষ্টি হাসল মেয়েটি। 'পথ হারিয়ে চলে এসেছেন, কি আছে তাতে? গোল্ডেন ক্যাসিনোতে বুঝি থাকেন আপনি?'

অর্থাৎ রানার পরিচয় জানতে চাইছে মেয়েটি। এড়িয়ে যেতে হবে, ভাবল রানা। নিজেকে জুয়াড়ী আর গ্যাঙস্টার নটরাজ হিক্কা হিসেবে পরিচিত করতে চায় না সে এই মেয়েটির কাছে। এর কাছে একটিও মিথ্যা কথা বলতে পারবে না সে।

'না, মানে এই গতরাতেই এসেছি। খুব সম্ভব চলে যাব দুই-একদিনের মধ্যেই।' কোনমতে দায়সারা উত্তর দিয়েই জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনি কাছাকাছিই কোথাও থাকেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমার একটা বাংলো আছে কাছেই। ডিস্‌প্লের জন্যে ব্যাকগ্রাউণ্ড আঁকছি আমি।'

'তার মানে?'

মেয়েটির কাছ থেকে ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে মাটিতে বসে পড়ল রানা। মেয়েটি অপছন্দ করছে কিনা লক্ষ করল। মুখ দেখে বোঝা গেল না কিছুই, কোন পরিবর্তন হলো না অপূর্ব সুন্দর মুখটিতে।

'কলম্বোর একটা মস্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কিছু অর্ডার পেয়েছি। ওদেরই স্পেশাল ডিসপ্লের জন্যে ওয়াটার কালারে পেইন্টিং করছি কয়েকটা। অনেক টাকা দেয়।'

'কাজটা খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে?'

'খুব মজার কাজ,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ। 'গত বছর ওদের একটা ডিপার্টমেন্টকে কাশ্মীর বানিয়ে দিয়েছিলাম। কাশ্মীরের অনেক জায়গা ঘুরে ছবি এঁকে এনেছিলাম আমি। ডিপার্টমেন্টটা এতই সুন্দর হয়েছিল যে প্রায় সমস্ত শাল, কম্বল আর কার্পেট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তাই তো এবার আবার একটা কাজ দিয়েছে।'

'ছবিটা কিন্তু সত্যিই সুন্দর হয়েছে,' বলল রানা। 'কিন্তু বোধহয় আপনার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছি। আমি বরং উঠি।'

'না না, শেষ হয়ে গেছে, কোন অসুবিধে নেই আমার,' মাথা নেড়ে বলল মেয়েটি। তুলিগুলো গুছিয়ে রাখতে আরম্ভ করল সে। 'সকাল দশটা থেকে কাজ করছি, খিদেতে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে। উঠব আমিও।'

'এত বেলা পর্যন্ত খাননি?'

'টিফিন নিয়ে এসেছিলাম সঙ্গে করে, একটার দিকে খেয়ে নিয়েছি। একা থাকি তো, কারও কোনও অসুবিধে হয় না আমার জন্যে। যখন যা ইচ্ছে খেয়ে কাটিয়ে দিই।'

ছবিটা দেখল কিছুক্ষণ মেয়েটি সমালোচকের ভঙ্গিতে। রানা দেখল মেয়েটিকে। ওর মনে হলো এত ভাল মেয়ে দেখেনি সে আর।

'চলবে,' বলল মেয়েটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানেজারের ভঙ্গি নকল করে। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'ক্যাসিনোতে ফিরতে হলে আপনার সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে সমুদ্রকে বামে রেখে সোজা বীচ ধরে হেঁটে যাওয়া। আপনার নামটা তো

বললেন না?'

'আমার নাম মাসুদ রানা। আপনার সঙ্গে তো অনেক জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছি, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেব?'

'মনে হচ্ছে এর পরই চায়ের দাওয়াত চেয়ে বসবেন?' মৃদু হেসে বলল মেয়েটি। 'আমার নাম সবিতা। আপনার যদি আর কোনও কাজ না থাকে তাহলে...'

এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা।

'কিচ্ছু কাজ নেই আমার। আমার নিজের সঙ্গই নিজের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। আপনার সঙ্গে এই অল্পক্ষণের পরিচয়েই...'

নিজেকে ধন্য মনে করল রানা। ইজেলটা ভাঁজ করে কাঁধে তুলে নিল, ব্যাগটা বন্ধ করে সেটাও তুলে নিল কাঁধের উপর। হাঁটতে আরম্ভ করল ওরা তপ্ত বালির উপর দিয়ে। সূর্য খানিকটা ঢলে গেছে পশ্চিম দিকে। সাড়ে চারটা বাজছে সবিতার রিস্টওয়াচে। সাগরের ঢেউগুলো আকুল মিনতি নিয়ে লুটিয়ে পড়ছে তীরে এসে।

'আপনাকে বসতে বলতে পারব না কিন্তু,' বলল সবিতা। 'আমি একা থাকি।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। পাশাপাশি হাঁটবার সুযোগ পেয়েই ধন্য হয়ে গেছে ও। 'বসতে চাইব না আমি। আমাকে দেখতে ঠিক একটা গুণ্ডার মত। কিন্তু আসলে লোকটা আমি খুব সম্ভব অত খারাপ না। আপনাকে সামান্য সাহায্য করতে পেরেই আমি খুশি—বসতে চাইব না।'

অল্প কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল ওরা।

'আপনাকে ক্যাসিনো থেকে গাড়িতে করে এতদূরে এনে ছেড়ে দিলেন কেন ভদ্রমহিলা?'

'তাকে কোনও একটি ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করেছিলাম, তাই তিনি রাগ করে একাই...'

'কে, অণিমা দেওয়ার?'

'হ্যাঁ। আপনি চেনেন ওকে?'

'খুব চিনি। আমাকে অবশ্যি ও চেনে না, কিন্তু আমি ওকে ভাল করেই চিনি। ওর কোন একটা প্রস্তাবে রাজি হননি বোধহয়? কিন্তু ও তো সহজে ছেড়ে দেয়ার পাত্রী নয়, এমনিই ছেড়ে দিল আপনাকে?'

'না। এমনি ছাড়েনি। চড় দিয়ে ছেড়েছে।'

হেসে ফেলল সবিতা।

'চড় খেয়ে স্বীকার করতে লজ্জা করল না আপনার?'

'না। আপনার কাছে কোনকিছু স্বীকার করতেই লজ্জা নেই আমার।'

একটা ফুটফুটে বাংলো দেখতে পেল রানা। সাগরের দিকে মুখ করা। সেই দিকেই এগোল ওরা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে জিজ্ঞেস করল সবিতা, 'আপনি বাঙালী?'

'খুব সম্ভব,' একটু ভেবে উত্তর দিল রানা।

'তার মানে?'

'ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হবে আপনার কাছে। আসলে গত রাতে একটা মারাত্মক মোটর অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলাম আমি। মাথায় বোধহয় খুব জোর আঘাত লেগেছিল। স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। সামান্য কয়েকটা কথা কেবল মনে আছে, আর সবকিছু ভুলে গিয়েছি বেমালুম। আমার সত্যিকার পরিচয় আমি জানি না। কেবল জানতে পেরেছি আমার আসল নাম মাসুদ রানা। আমার মনে হচ্ছে খুব সম্ভব আমি বাঙালী।'

'আশ্চর্য তো! গোল্ডেন ক্যাসিনোতে এলেন কি করে?'

'অপরিচিত দু'জন মানুষ নিয়ে এসেছে আমাকে এখানে। এখানে নিয়ে এসে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আমাকে অন্য নামে চালাবার চেষ্টা করছে। বিশ্রী একটা জটিল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছি আমি ক্রমে।'

'চলে গেলেই পারেন,' বলল সবিতা সহজ কণ্ঠে।

'যাব কোথায়? কোথাও তো যাওয়ার জায়গা নেই আমার। আমি অপেক্ষা করছি, হয়তো আর কয়েকটা দিন গেলে সব কথা মনে পড়ে যাবে আমার—তখন চলে যাব।'

বাংলোটার কাঠের বারান্দায় বেতের তিনটে চেয়ার, আর একটা টেবিল পাতা। বারান্দার দুটো থাম বেয়ে মানি-প্ল্যান্ট উঠে এসেছে লতিয়ে। কাঁধের, সেইসাথে মনের বোঝা নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল রানা, ডাকল সবিতা।

'বসবেন কিছুক্ষণ? আমি চারটে খেয়ে আসছি, গল্প করা যাবে তারপর। চা খাওয়াব।'

'চায়ের লোভ দেখাতে হবে না,' বলল রানা মৃদু হেসে। 'নিশ্চিন্তে খেয়ে আসুন, আমি বসছি।'

দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল সবিতা। বসে বসে সাগরের ঢেউ গুনছিল রানা, পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একটা প্লেটে কিছু কেক আর ধূমায়িত দুই কাপ চা নিয়ে আসছে সবিতা ট্রে-তে করে। চোখেমুখে পানির ছিটে দিয়ে এসেছে সবিতা। শিশির ভেজা শিউলীর মত পবিত্র, সুন্দর লাগল মুখটা রানার কাছে।

'কি দেখছেন অমন করে?' জিজ্ঞেস করল সবিতা। একবিন্দু আড়ষ্টতা নেই ওর কণ্ঠে। টেবিলের উপর ট্রে-টা নামিয়ে রেখে বসে পড়ল সে একটা চেয়ারে। 'নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে চা।'

রানা কি দেখছে অমন করে ঠিকই বুঝতে পেরেছে সবিতা। পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি বুঝে নিতে আসলে কোন নারীরই ভুল হয় না। অনায়াসে বুঝতে পেরেছে সে রানার মন।

চায়ে চুমুক দিল রানা। কেকে একটা কামড় দিয়েই চোখ তুলে দেখল ওর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে সবিতা।

'কই, বললেন না? কি দেখছিলেন?'

'সত্যিকথা বললে আপনি রাগ করবেন, অথচ মিথ্যে কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না আপনার কাছে—কি করি বলুন তো?'

'সত্যি কথাটাই বলে ফেলুন।'

‘এমন সুন্দর মুখ আমি আর দেখিনি জীবনে।’

খিল খিল করে হেসে উঠল সবিতা।

‘এই তো মিথ্যে কথা বললেন। গোল্ডেন ক্যাসিনোতে রূপসীর অভাব আছে নাকি?’

‘হয়তো নেই। কিন্তু ওরা আমার মনের মত নয়।’

‘কি রকম মেয়ে আপনার মনের মত?’

অতি সহজ, অনাড়ম্বরভাবে বলে ফেলল রানা কথাটা। চোখ দুটো চায়ের কাপের উপর নিবদ্ধ।

‘আপনার মত মেয়ে। যাকে দেখলে শান্তিতে ভরে যায় মানুষের হৃদয়, কোনও কলুষ যার এক মাইলের মধ্যে আসতে পারে না, ফুলের মত শুভ্র, সুন্দর, নিষ্পাপ যে মেয়ে।’ সবিতার ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখের দিকে চাইল রানা। একটু থেমে বলল, ‘থাক, এ নিয়ে আর আলাপ না করাই ভাল। আপনি জিজ্ঞেস করলেন বলেই বললাম, আপনার লজ্জা বা ভয় পাওয়ার জন্যে বলিনি। কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই আমার। আপনার খারাপ লাগলে আমি বরং চলে যাই।’

‘আপনাকে খারাপ লোক মনে করলে এখানে আনতাম না,’ বলল সবিতা স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে।

‘অনেক ধন্যবাদ। আসলে জানেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পেরে আশ্চর্য রকম হালকা লাগছে মনটা। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না দুপুর থেকে কি ভার চেপেছিল আমার মনের ওপর। যাক, আমার কথা থাক। আপনি আপনার ছবির গল্প শোনান।’

অনেক গল্প শোনাল সবিতা। শান্তিনিকেতনে ছবি আঁকা শিখেছে সে, ভারতের প্রায় সব জায়গাই ঘুরেছে সে ছবি আঁকার জন্যে। বেশ ভাল রোজগার হয় মাঝে মাঝে। তাতেই মোটামুটি ভরণপোষণ চলে যায়। বাবা মস্ত বড়লোক। কিন্তু শুধু এই বাড়িটা ছাড়া কিছুই নেয়নি সে বাবার কাছ থেকে।

গল্প করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে এল। রানার মনের মধ্যে বাঘের গর্তের বিভীষিকা উঁকি দিতে আরম্ভ করল থেকে থেকে। উসখুস করতে আরম্ভ করল সে উঠবার জন্যে, কিন্তু কিছুতেই উঠতে দিল না সবিতা। রেডিওতে দিল্লী স্টেশন ধরল সে। কপালগুণে মিলে গেল রবিশঙ্করের সেতারের প্রোগ্রাম।

‘অ্যাক্সিডেন্টের আগে কি ধরনের কাজ করতেন একটুও মনে নেই আপনার?’ জিজ্ঞেস করল সবিতা রানাকে।

‘নাহ্,’ বলল রানা। ‘এরা বলছে, আমি নাকি ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশনের ম্যানেজার ছিলাম, বেড়াতে এসেছিলাম সিংহলে। কাণ্ডিতে বেড়াতে গিয়ে রঘুনাথ বলে এক সর্দারের চক্রান্তে পড়ে বাধ্য হয়েছিলাম স্টেডিয়ামে কুস্তি করতে—এটা আমার মনে আছে। থার্ড রাউণ্ডে ইচ্ছে করেই হেরে যাওয়ার হুকুম ছিল আমার ওপর, কিন্তু আমি সেই আদেশ অমান্য করে জিতেছিলাম। তারপর পালিয়ে যাচ্ছিলাম একটা ক্যাডিলাকে করে—এমনি সময় ধাক্কা খেলো গাড়িটা আরেকটা গাড়ির সঙ্গে। আগের সব কথা ভুলে গিয়েছি। কিছুতেই মনে

আসছে না ঠিক কি ধরনের কাজ করতাম। তবে মনে হচ্ছে খুব বিপদজনক কোন কাজ করতাম আমি। এমন কোন কাজ যাতে পাঁচ-ছয়টা ভাষায় কথা বলবার ক্ষমতা থাকতে হয়, গাড়ি চালাতে জানতে হয়, ফ্রী হ্যাণ্ড মারামারি শিখতে হয়, পিস্তল ব্যবহার করতে জানতে হয়।'

'বাব্বা! থাক, থাক। বেশি বললে ভয় ধরে যাবে আবার।'

গল্পের ফাঁকে ফাঁকে রবিশঙ্করের সেতার মিষ্টি একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল। রানার মনে হলো মায়াবী এক স্বপ্নের দেশে চলে এসেছে সে। ভারত মহাসাগরকে টুকটুকে লালে রাঙিয়ে দিয়ে ডুবে গেছে সূর্য বেশ অনেকক্ষণ হয়। এবার মেঘের রঙ-ও আবছা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

'আপনি বরাবর এই বাংলোতেই থাকেন?'

'না। আপাতত সপ্তাহ তিনেকের জন্যে আছি। আমার থাকার ঠিক আছে নাকি—কখন কোথায় থাকি কিচ্ছু ঠিক নেই। এখানে আসলে আমার এক লেখিকা বান্ধবী ভাড়া থাকে—মাস খানেকের জন্যে হাওয়াই গেছে ও। চলুন না বাংলোটা ঘুরিয়ে দেখাই আপনাকে।'

চারটে ঘর। প্রতিটা ঘরে বাতি জ্বেলে জ্বেলে দেখাল সবিতা। গ্যারেজে একটা ফিয়াট সিক্স হানড্রেড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সবিতার লেখিকা বান্ধবীর। ওটাতে করে শহর থেকে খাবার-দাবার কিনে নিয়ে আসে সবিতা দরকার পড়লেই।

রাত হয়ে আসছে। দু'জনের কাছেই দু'জনের সঙ্গ এত ভাল লাগছে যে ছাড়তে পারছে না কিছুতেই একে অপরকে। কিন্তু ক্যাসিনোতে ফিরে যাওয়া দরকার, বুঝতে পারল রানা। অন্তত কাছাকাছি থাকতে হবে।

'চলুন না, আজ ডিনার খাওয়া যাক একসাথে?' বলল রানা।

'আমি ক্যাসিনোতে যাব না,' বলল সবিতা।

'ক্যাসিনোতে নয়, শহরের কোনও ভাল রেস্তোরাঁ জানা নেই আপনার?'

'আছে একটা। সমুদ্রের ধারে। গেলে মন্দ হয় না কিন্তু। খুব মজা হবে। বৈদ্যনাথনের রেস্তোরাঁয় না খেলে নাকি মানুষের জন্মই বৃথা—দেখাই যাক লোকে এত প্রশংসা করে কেন।'

ফিয়াটে চড়ে বৈদ্যনাথনের রেস্তোরাঁয় চলে এল ওরা দু'জন। চমৎকার সাজানো-গুছানো রেস্তোরাঁ। দেয়ালের গায়ে বিরাট একটা আলোকিত অ্যাকুয়ারিয়াম। হরেক রকমের ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে।

বৈদ্যনাথন মোটাসোটা হাসিখুশি বৃদ্ধ, নিজে দেখাশোনা করে খাওয়াল ওদের। সমুদ্রের ওপর হাত দশেক চলে গেছে খোলা বারান্দা। রেলিং-এর ধারে বসেছে ওরা দুটো চেয়ারে—মনে হচ্ছে জাহাজের ডেকে বসে আছে যেন। খেতে খেতে অনর্গল গল্প করে চলল ওরা। কি যে গল্প করল তার মাথামুণ্ডু নেই। তবু কথা যেন ফুরোতেই চায় না। দেখে মনে হচ্ছে যেন কয়েক বছর ধরে চেনে ওরা পরস্পরকে। কখন কথায় কথায় আপনি থেকে তুমি হয়ে গেছে ওদের সম্পর্ক কেউ টের পায়নি। অথচ মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়!

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ বেড়াল ওরা সাগর পারে। কয়েকটা জেলে

নৌকো রওনা হয়ে গেল—রাতে মাছ ধরে ওরা।

'একদিন চলো রানা, আমরা দু'জন যাব এদের সঙ্গে। শুনেছি চাঁদনি রাতে অপূর্ব লাগে নৌকোয় শুয়ে শুয়ে সিঙ্গিং ফিশের শিস শুনতে। এদের মাছ ধরাও নাকি খুব মজার। যেতেই হবে একদিন। খুব ভাল লাগবে তোমার।'

'নিশ্চয়ই। সত্যিই, চলো একদিন যাওয়া যাক। তুমি হয়তো…' থেমে গেল রানা। ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ছে কাছেই একটা গির্জার ঘড়িতে। এক, দুই করে গুনছে রানা ঘণ্টাগুলো থমকে দাঁড়িয়ে। প্রতিটা ঘণ্টা যেন শেল হয়ে বিঁধেছে ওর কানের ভিতর।

আট…নয়—দশ।

'কি হলো, রানা?' জিজ্ঞেস করল সবিতা।

'কিচ্ছু না। আমাকে এক্ষুণি ফিরতে হবে, সবিতা। অত্যন্ত জরুরী দরকার…'

'গাড়িতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। আমি পৌঁছে দিচ্ছি এক্ষুণি। কিন্তু হঠাৎ কি এমন জরুরী দরকার হয়ে পড়ল, রানা?'

জিভটা শুকিয়ে গেছে রানার। ধক্ ধক্ করছে বুকের ভিতরটা।

'সব বলব তোমাকে, সবিতা। পরে।'

সবিতা বুঝতে পারল কিছু গোলমাল হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন করে বিব্রত করল না সে রানাকে। জোরে চালিয়ে দিল গাড়ি। ঠিক দশ মিনিটে ক্যাসিনোর গেটের সামনে চলে এল ওরা।

নেমে দাঁড়াল রানা গাড়ি থেকে। হুলুগাল, রিটা আর বাঘের গর্তের চিন্তায় ঘেমে উঠেছে সে।

'অনেক ধন্যবাদ, সবিতা,' বলল রানা কোনমতে। কর্কশ শোনাল ওর কণ্ঠস্বরটা। আরও অনেক কথা বলতে চাইল সে। বলতে চাইল আবার দেখা করবে সে, জীবনে এত সুন্দর সময় কাটেনি ওর, বোঝাতে চাইল কতখানি ভাল লেগেছে ওর সবিতাকে—কিন্তু একটি কথাও বেরোল না ওর মুখ থেকে আর।

'কি হয়েছে, রানা? কোনও বিপদে পড়েছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল সবিতা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

'না-না! কিচ্ছু জিজ্ঞেস কোরো না। তোমাকে এর মধ্যে টানতে চাই না আমি, সবিতা। চলি, আবার দেখা হবে।'

এগিয়ে গেল রানা গেটের দিকে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সবিতা ওর দিকে।

রানাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল গার্ড দু'জন। কিন্তু রানা ফিরেও চাইল না ওদের দিকে। মাথা নিচু করে ধীর পায়ে হেঁটে চলল সে কেবিনের দিকে, মড়া আগলে যেখানে বসে আছে রিটা।

চব্বিশ

ঠেলা দিতেই খুলে গেল কেবিনের দরজা।

উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ঘরে, পাশ্চাত্য সঙ্গীত হচ্ছে রেডিও সিলোনে, দুই হাত মাথার নিচে দিয়ে ডিভানের উপর শুয়ে আছে রিটা। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। মুখে কঠোর একটা অভিব্যক্তি।

চট্ করে বাথরুমের দিকে চাইল রানা। দরজাটা খোলা।

'হুলুগাল কোথায়?'

'ওর মধ্যে আছে। কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?'

'এই···সময় কাটাচ্ছিলাম এদিক-ওদিক ঘুরে। কেন, কেউ কি···?'

'তোমাকে কি বলেছিলাম? এখানে যাতে কেউ না আসে তার ব্যবস্থা করতে বলিনি?' চাপা উষ্মা রিটার কণ্ঠে।

'কেন, আমি তো ব্যবস্থা করেছিলাম,' বলল রানা ভয়ে ভয়ে।

'তিন-তিনবার টেলিফোন করেছে ওরা, জোসেফ গর্দভটা দমাদম দরজা পিটাতে আরম্ভ করেছিল—এর নাম ওদের দূরে সরিয়ে রাখা?'

'আমি তো বলে দিয়েছিলাম কেউ যেন ডিসটার্ব না করে তোমাদের।'

'সে তো সাড়ে তিনটের সময়। তারপর কোথায় গিয়েছিলে? ছয়টার সময় রীতিমত খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হয়েছিল, সেই সময়েই তোমার দরকার ছিল। কোথায় ছিলে?'

রানা বুঝল ভয়ানক খেপে গেছে রিটা। আর এ-ও বুঝল সবিতার কথা রিটার কাছে প্রকাশ করা চলবে না। কিছুতেই না।

'হারিয়ে গিয়েছিলাম,' বলল রানা অপরাধীর মত। 'সী-বীচে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। বহু কষ্টে পথ খুঁজে পেয়ে ফিরে এসেছি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার মুখটা পরীক্ষা করল রিটা। ওর চোখের দিকে চাইতে পারল না রানা।

'পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলে তুমি, রানা।'

কথা বলল না রানা। কিছুই বলবার নেই। মুখের দিকে চেয়ে থেকে কাষ্ঠহাসি হাসল রিটা। বলল, 'তোমার কপাল ভাল যে গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারোনি। নইলে এতক্ষণে গ্রেপ্তার করা হত তোমাকে খুনের দায়ে।'

'আমি পালাবার চেষ্টা করিনি—বেড়াতে যাচ্ছিলাম। দেখতেই তো পাচ্ছ ফিরে এসেছি।'

সোজা হয়ে বসল রিটা ডিভানের উপর। সিগারেটটা ফেলল টিপয়ের উপর রাখা অ্যাশট্রেতে।

'যাক, এখনও খোঁজাখুঁজি করছে ওরা হুলুগালকে। ওদের বলতে বাধ্য হয়েছি আমি যে ছ'টার সময় এখান থেকে চলে গেছে সে। বলেছি খুব সম্ভব সাঁতার কাটতে গেছে।'

'কে খুঁজছে ওকে?'

'জোসেফ আর অনুরাধা। আমার কাজ আমি করেছি, এবার তোমার কাজ তুমি করো। কি করতে হবে তা তো জানোই তুমি ভাল করে। কিন্তু সাবধান! এখনও খোঁজাখুঁজি করছে ওরা সী-বীচে।'

'কি করতে হবে আমাকে?'

'সহজ কাজ। লাশটা নিয়ে গিয়ে বাঘের গর্তে ফেলে দিয়ে আসবে। জাস্ট থ্রো ইট ইন দা পিট!'

'আর তুমি?'

'আমি এখানে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানব।'

'তুমি যাচ্ছ না আমার সঙ্গে? যদি কেউ দেখে ফেলে, কিংবা...'

নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি ফুটে উঠল রিটার লাল ঠোঁটে।

'সেটুকু ঝুঁকি তোমাকে নিতেই হবে, প্রিয়তম। হাতেনাতে ধরা পড়বার ঝুঁকি নিতে আমি রাজি নই কিছুতেই। তোমাকে একাই করতে হবে কাজটা।'

'দেখো রিটা, প্রথম কথা, তুমি খুন করেছ...'

'কে বলল?' অবাক হয়ে যাবার ভান করল রিটা। 'ভুলে গেলে নাকি? তুমিই তো গুলি করে চোখ কানা করে দিলে হুলুগালের। পিস্তলটাও লুকানো আছে তোমারই ঘরে। ওতে আমার হাতের ছাপ নেই।'

অপলক চোখে চেয়ে রইল রানা রিটার মুখের দিকে। পরিষ্কার বুঝতে পারল সে, কিছুতেই নিস্তার নেই ওর এই কুহকিনীর হাত থেকে। বিদ্রোহী হয়ে উঠল ওর মন। কিন্তু উপায় নেই। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে ওকে। আপাতত এর ইঙ্গিতেই উঠতে-বসতে হবে ওকে পোষা কুকুরের মত।

'বুঝলাম। ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি...' থেমে গেল রানা কথার মাঝখানে। আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর সর্বাঙ্গ। দরজায় জোরে জোরে টোকা পড়ল দুটো।

'মিসেস কুমারস্বামী আছেন নাকি? আমি ইন্সপেক্টর সেনানায়েক।' আবার টোকা। কণ্ঠস্বরটা অসহিষ্ণু মনে হচ্ছে।

তড়াক করে ডিভান ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রিটা।

'এক সেকেণ্ড, ইন্সপেক্টর। খুলছি!' বলল রিটা উঁচু গলায়। আঙুল দিয়ে বাথরুমের দিকে ইঙ্গিত করল রানাকে। চাপা কণ্ঠে বলল, 'ওর ভিতর ঢুকে পড়ো। খোলাই রেখো দরজাটা। আর টুঁ-শব্দও কোরো না।'

ত্রস্তপায়ে বাথরুমে ঢুকেই একপাশে সরে গেল রানা। কেবিনের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে বাথরুমের দরজা দিয়ে। সেই আলোয় দেখল রানা, যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি পড়ে রয়েছে লাশটা। বাথটাবের একপাশে বসে পড়ল সে। পাঁচ সেকেণ্ড পরেই সেনানায়েকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা।

'আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে আমি সত্যিই দুঃখিত। হুলুগালকে পাওয়া যাচ্ছে না। শুনেছেন?'

'ভেতরে আসুন,' বলল রিটা। 'এখনও পাওয়া যায়নি ওকে?'

'না।' কার্পেটের উপর বুটের মচ্ মচ্ শব্দ পাওয়া গেল। 'মিস অনুরাধা ভয় পেয়ে টেলিফোন করেছে আমার কাছে। আমি ভাবলাম একবার খোঁজ নেয়া দরকার।'

'কিন্তু এত উদ্বিগ্ন হবার কি আছে বুঝতে পারছি না আমি। সত্যিই। হয়তো রত্নপুর গেছে টাকা তুলে আনতে।'

'ক্যাসিনোর কম্পাউণ্ড ছেড়ে কোথাও যায়নি সে।'

'বসুন না। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? হুলুগাল যখন জানতে পারবে ওর বিরহে অস্থির হয়ে গিয়ে ওর সেক্রেটারি আপনাকে পর্যন্ত টেনে এনেছে এখানে, তখন খুবই পুলকিত হবে ও।' হেসে উঠল রিটা।

'ব্যাপারটা গুরুতরও হতে পারে,' বলল ইন্সপেক্টর গম্ভীর কণ্ঠে। চেয়ারে বসার মচ্ মচ্ শব্দ পাওয়া গেল। 'ছ'টা পর্যন্ত আপনার সঙ্গেই ছিল ও, তাই না?'

'হ্যাঁ। ঠিক ছ'টার সময়ই বেরিয়ে গেছে ও এই কেবিন থেকে। বলছিল বিকেল বেলাটা সাঁতার কাটবে ও আজ।'

'কিন্তু সী-বীচে কেউ ওকে দেখেনি।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল ইন্সপেক্টর, 'আপনারা ব্যবসা সংক্রান্ত আলাপ করছিলেন বোধহয়?'

'হ্যাঁ!' চিন্তিত কণ্ঠে বলল রিটা। 'আমার মনে হচ্ছে আপনাকে সব কথা জানিয়ে রাখা মন্দ নয়। আসলে কুমার আমাকে যে জন্যে পাঠিয়েছে সে ব্যাপারে আপনার সাহায্য আমার দরকার হতে পারে। ব্যাপারটা খুলে বলাই ভাল।'

'কি ব্যাপার?'

'বলছি। আপনি হয়তো একটু আশ্চর্য হয়েছেন—আমি আর হিক্কা এখানে কেন, তাই না? আসলে কুমার পাঠিয়েছে আমাদের। ক্যাশ রিজার্ভ থেকে টাকা সরাচ্ছিল হুলুগাল। ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়ার হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছে কুমার নটরাজ হিক্কাকে। আমার যতদূর বিশ্বাস, ভেগেছে হুলুগাল।'

অবাক হলো রানা রিটার উপস্থিত বুদ্ধি আর অভিনয় ক্ষমতা দেখে। এমনভাবে কথা ক'টা বলল সে যে কারও সাধ্য নেই অবিশ্বাস করে।

'বলেন কি!' চমকে উঠল যেন ইন্সপেক্টর। 'অনেক টাকা সরিয়েছে?'

'এখনও সঠিক করে বলা যাচ্ছে না—তবে হাজার পঞ্চাশেক তো হবেই। এখনও পুরোপুরি চেক-আপ করা সম্ভব হয়নি। চার্জ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেছে সে। অস্বীকার করেনি। গোলমাল করতে পারত, কিন্তু তা না করে যখন চাবি-টাবি সব তুলে দিল আমার হাতে, তখন বারো ঘণ্টার সময় দিয়েছি আমি ওকে কেটে পড়বার জন্যে। আমি ভাবতেও পারিনি ওর আহাম্মক সেক্রেটারিটা আবার আপনাকে এতদূর টেনে এনে কষ্ট দেবে।'

'না না, কষ্ট কিছুই না। এটা তো আমার ডিউটি। কিন্তু··· ছিছি, এই কাজ করল শেষ পর্যন্ত হুলুগাল!' একটু থেমে সামলে নিল ইন্সপেক্টর ধাক্কাটা। 'এই ব্যাপারে আমাকে কিছু করতে বলছেন?'

'না। আমাদের ভেতরের অনেক গোপন কথাই জানে সে। যদি বেফাঁস কিছু বলে দেয়···'

'আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম,' কথার মাঝখানেই বলে উঠল ইন্সপেক্টর। 'মানে মানে কেটে পড়লেই আমাদের সবার জন্যে মঙ্গল। কিন্তু গেল কোথায়?'

'তা ঠিক বলতে পারছি না। খুব সম্ভব সাগর-তীর ধরে চলে গেছে ও। নইলে গার্ডরা ওকে যেতে দেখল না কেন?'

'তাই হবে। কিন্তু আজব ব্যাপার, জিনিসপত্র কিচ্ছু নেয়নি সঙ্গে। ওর ঘরটা

পরীক্ষা করে দেখে এসেছি আমি।'

দম বন্ধ হয়ে এল রানার। এবার? এবার কি উত্তর দেবে রিটা?

'জিনিসপত্র আগেই সরিয়ে ফেলেছিল ও। এখানে মামুলি দুই-একটা জিনিস আছে কেবল। ও জানত বেশিদিন এইভাবে চলবে না, তাই পালাবার প্রস্তুতি ছিল ওর আগে থেকেই।' কিছুমাত্র দ্বিধা না করে গড়গড় করে বলে গেল রিটা।

'তা ঠিক। অন্তত বোকা ছিল না লোকটা। কিন্তু ওকে দেখতে না পেলে তো ভারি বেখাপ্পা ঠেকবে সবার চোখে।'

'ক'দিন? দু'দিনেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে সবাই হিক্কা আর আমাকে দেখতে দেখতে। আপনার ব্যাপারেও কোনও গোলমাল হবে না। বরং সুবিধে হবে। কুমার বলছিল, আপনার জন্যে আমাদের আরও কিছু করা দরকার।'

'তাই নাকি? শুভ সংবাদ! কি বলেছেন মিস্টার কুমারস্বামী?'

একটু থেমে গুছিয়ে নিল রিটা কথাগুলো।

'ব্যাপারটা কি জানেন, আমরা মনে করি আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করছেন আমাদের। হুলুগালকে একবার বলেও ছিল কুমার, কিন্তু ও উত্তর দিয়েছিল, অনেক দেয়া হচ্ছে আপনাকে। কুমার কিছু থোক টাকাও গ্র্যান্ট করেছিল আপনার নামে, আজ হুলুগাল স্বীকার করেছে সে-টাকা নিজেই নষ্ট করেছে—আপনাকে দেয়নি। যাক, হুলুগাল আর নেই। মাসে অন্তত আরও হাজার দুই আপনার ন্যায্য প্রাপ্য। কুমার বলে দিয়েছে যেন গত ছয় মাসেরটাও দিয়ে দিই। আমি তো মনে করেছিলাম আগামীকাল আপনার ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা দিয়ে হঠাৎ আপনাকে অবাক করে দেব।'

'বাহ্! এ যে দেখছি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ।' হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল ইন্সপেক্টর। 'বারো হাজার একসাথে? গুড! আপনাদের দু'জনের সাথে কাজ করতে ভালই লাগবে বুঝতে পারছি। হিক্কা কোথায়?'

'শহর দেখতে গেছে বোধহয়। ঠিক জানি না। হয়তো বৈদ্যনাথনের রেস্তোরাঁয় ডিনার খাচ্ছে (আঁৎকে উঠল রানা বাথরুমে বসে)। কাল সকালে এসে দেখা করবেন একবার। আমাদের তিনজনের মধ্যে কয়েকটা ব্যাপারে আলোচনা হওয়া দরকার।'

'নিশ্চয়ই আসব,' বলল ইন্সপেক্টর। 'উঠি এখন। অনেক বিরক্ত করলাম আপনাকে। আচ্ছা…মিস্ অনুরাধাকে কিছু বলব? খামোকা খুঁজছে এখনও ওরা হুলুগালকে।'

'তা বলতে পারেন। তবে সব কথা বলবেন না, এসব নিয়ে কানাঘুষা হোক তা চাই না আমরা। বলে দিতে পারেন যে খবর পেয়েছেন, শহরে গেছে হুলুগাল। আগামীকাল তো দেখতেই পাবে সবাই।'

'ঠিক আছে। চলি এখন। কাল তাহলে বিকেলের দিকে ব্যাঙ্কে গিয়ে টুঁ মারব একবার?'

'আপনার আগেই আমরা টুঁ মেরে আসব। চিন্তা নেই। গুড বাই।'

'গুড বাই।'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একটা জীপ স্টার্ট নেয়ার ক্ষীণ শব্দ এল রানার কানে। বেরিয়ে এল সে বাথরুম থেকে। যেন দিগ্বিজয় করেছে এমনিভাবে রানার দিকে চাইল রিটা।

'এবার তোমার কাজটা সেরে ফেলো, রানা,' বলল রিটা। 'আসল বিপদ পার হয়ে গেছে। ওরা মনে করবে যাবার আগে বাঘের কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিল হুলুগাল, পড়ে গেছে ভেতরে। যাও, রওনা হয়ে যাও। বুইকটা কেবিনের সামনে আনিয়ে রেখেছি আমি তোমার সুবিধার জন্যে।'

শক্ত হয়ে যাওয়া দেহটা তুলে নিল রানা কাঁধের উপর। অসম্ভব ভারি লাগছে মৃতদেহটা। ঘাম দেখা দিল ওর কপালে। বাথরুম থেকে বেরোতেই কেবিনের বাতি নিভিয়ে দিয়ে দরজা খুলে দিল রিটা। একটানে হুলুগালের মাথায় পেঁচানো তোয়ালেটা খুলে নিল সে অন্ধকারেই।

'ফেলেই সোজা চলে আসবে, কথা আছে,' বলল রিটা।

পিছনের সীটে লাশটা আড়াআড়িভাবে রেখে রওনা হয়ে গেল রানা। উজ্জ্বল আলো চারদিকে। কিছু কিছু লোকও চোখে পড়ল রানার। কেউ বাগানে বসে আছে, কেউ হাঁটছে, বারে বেশ ভিড়, ক্যাসিনোর জানালা দিয়ে জুয়াড়ীদের মাথা দেখা যাচ্ছে। রানার মনে হলো যেন সবাই জানে গাড়িতে করে কি নিয়ে চলেছে সে।

পার্কিং লাইটটা কেবল জ্বেলে রেখেছে রানা। হেড লাইট জ্বাললে লোকের চোখে পড়বে বেশি করে। চিড়িয়াখানার দিকটা অন্ধকার। কিছু দূর যেতেই বাঘের গায়ের দুর্গন্ধ নাকে এল ওর। পেটের ভিতরে পাকস্থলীতে অদ্ভুত এক ধরনের সুড়সুড়ি অনুভব করল সে। একটা বাঘ বোধহয় তার বাঘিনীকে ধমক দিল। গর্‌র্‌। পিলে চমকে উঠল রানার।

একেবারে কাছে গিয়ে পার্কিং লাইট নিভিয়ে দিয়ে গাড়ি থামাল রানা। চুপচাপ বসে রইল দুই মিনিট। চারদিকে শ্যেনদৃষ্টি ফেলে অন্ধকার ভেদ করে দেখবার চেষ্টা করল সে, কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। কিছু দেখতে পেল না সে। শুধু শুনতে পেল বাঘের পায়ের শব্দ। অশান্ত পায়ে হাঁটছে একটা বা দুটো বাঘ এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক। কোমল একটা থপ থপ শব্দ আসছে কেবল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে রেলিঙের ধারে চলে এল রানা। মাথা বাড়িয়ে নিচের দিকে চাইল। সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না, বোটকা একটা দুর্গন্ধ উঠে এল নাকে। থপ থপ পায়ের শব্দটা থেমে গেল হঠাৎ। চারপাশে চাইল রানা। কোথাও কোন লোকজনের চিহ্ন নেই।

গাড়ির পাশে চলে এল সে এবার। এদিক-ওদিক চেয়ে খুলে ফেলল দরজা। দ্রুত তুলে নিল সে লাশটাকে কাঁধের উপর। তারপর এলোপাতাড়ি পা ফেলে ছুটল রেলিঙের ধারে। বুকের ভেতর প্রচণ্ড ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছে। মরা মানুষের গন্ধ বোধহয় পেয়ে গেছে বাঘ। হঠাৎ ক্রুদ্ধ একটা গর্জন উঠল গর্তের ভিতর থেকে।

লাশটা কাঁধে নিয়েই সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। গড়িয়ে চলে যাচ্ছে সেটা

সামনের দিকে। হুলুগালের শক্ত আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া একটা হাত হঠাৎ জামায় বেধে গেল রানার। ভয় পেয়ে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিল রানা দেহটা কাঁধ থেকে। দড়াম করে আছড়ে পড়ল ওটা বিশ ফুট নিচে। জেগে গেছে সব ক'টা বাঘ। পায়ের শব্দে বুঝল রানা ছুটে আসছে ওরা মৃতদেহটার দিকে।

দৌড়ে চলে এল রানা গাড়ির কাছে। হাঁপাচ্ছে। বাতাসে অক্সিজেন যেন কমে গেছে হঠাৎ। একসাথে গর্জে উঠল ছয়টা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। কেঁপে উঠল সারাটা এলাকা। প্রবল ধস্তাধস্তির আওয়াজ আসছে গর্তের মধ্যে থেকে।

লাফিয়ে উঠে বসল রানা গাড়ির ড্রাইভিং সীটে। এই অস্বাভাবিক গর্জন শুনে এক্ষুণি হয়তো বেরিয়ে আসবে লোকজন ক্যাসিনো থেকে। জলদি পালাতে হবে ওকে এখান থেকে। এই পথে এগিয়ে গিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় উঠবে সে। সেখান থেকে সোজা চলে যাবে কেবিনের দিকে। পা দিয়ে চাপ দিল রানা স্টার্টারে। স্টার্ট নিল না গাড়ি।

একশো গজ দূরে আলোকোজ্জ্বল ক্যাসিনোর বারান্দা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। অনেক মেয়ে-পুরুষ বসে ছিল সেখানে। চেয়ার ছেড়ে উঠে এদিকের বারান্দায় রেলিঙের ধারে চলে আসছে সবাই। বাঘের গর্তের দিকে সবার চোখ। অন্ধকারে রানাকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা ঠিকই, কিন্তু···

আবার পায়ে চাপল রানা স্টার্টার। এবারও কোন সাড়া নেই। কোনও তার-টার ছিঁড়ে গেল নাকি? ঘেমে নেয়ে উঠল রানা। গাড়ি ছেড়ে দৌড় দেবে সে? না, তাহলে ভেস্তে যাবে সবকিছু। স্টার্ট নেয়াতেই হবে গাড়িকে। ছয়-ছয়টা বাঘের প্রচণ্ড হুঙ্কারে চিন্তা করতে পারছে না রানা কিছু। তিন-চারজন লোক দৌড়ে আসছে এদিকে।

হঠাৎ খেয়াল হলো রানার ইগনিশন সুইচ অন করা হয়নি। কাঁপা হাতে চাবিটা ঘুরিয়ে আবার চাপল সে স্টার্টার। নিমেষে স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। সেকেণ্ড গিয়ারে দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল রানা অন্ধকার রাস্তা ধরে সোজা। বাঁশপাতার মত কাঁপছে ওর সর্বশরীর। মোড় ঘুরবার সময় পাশ ফিরে দেখল রানা সেই তিন-চারজন লোক প্রায় পৌঁছে গেছে গর্তের কাছে। বেশ খানিকটা স্পীড তুলে থার্ড গিয়ারে দিল রানা এবার। পরিষ্কার বুঝতে পারল সে মৃতদেহটা নিয়ে বাঘগুলোর কাড়াকাড়ি, মারামারি, ঝগড়া আর গর্জনের শব্দে কেউ শুনতে পায়নি গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ।

দুই মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল সে রিটার কেবিনের সামনে। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে রিটা রানার অপেক্ষায়। এখান থেকে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে বাঘগুলোর উন্মত্ত চিৎকার।

রিটাকে ঠেলে সরিয়ে ঘরের ভিতর চলে এল রানা। প্রথমেই দেয়ালের গায়ের ক্যাবিনেট থেকে হুইস্কির বোতল বের করল সে একটা। ছিপি খুলে ভরে নিল পুরো এক গ্লাস। পানি খাওয়ার মত ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে শেষ করল সেটুকু। জ্বালা করে উঠল গলার ভিতরটা। আবার ভরল সে গ্লাসটা।

দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল রিটা। ওর মুখটাও একটু যেন

ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'দেখেছে তোমাকে কেউ?'

মাথা নাড়ল রানা বিরক্ত ভঙ্গিতে। কোনও কথা ভাল লাগছে না এখন ওর। মাতাল হয়ে ভুলে যেতে চায় সে বাঘের গর্তের বিভীষিকা।

'এত বিচলিত হয়ে পড়লে চলবে কি করে, রানা?' বলল আবার রিটা। 'ইন্সপেক্টর সেনানায়েক আবার আসতে পারে। হি মে বি ব্যাক এনি মোমেন্ট। বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও। তোমাকে এই অবস্থায় দেখলেই বুঝে ফেলবে কাজটা তুমিই করেছ।'

কোন কথা না বলে গ্লাসটা টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রানা। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই চমকে উঠল সে। ফ্যাকাসে মুখটা ঘামে ভেজা, একগুচ্ছ চুল ঘামে সেঁটে আছে কপালের সঙ্গে, চোখ দুটো লাল।

মুখ-হাত পরিষ্কার করল রানা সাবান দিয়ে। অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা পানি ছিটাল চোখ-মুখে। রক্তমাখা তোয়ালেটা ধুয়ে ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রেখেছে রিটা...ওটা দিয়েই মুছে নিল হাত-মুখ। ব্যাক ব্রাশ করে নিল চুল। শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে এখনও।

বাথরুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রানার দিকে চেয়ে ছিল রিটা এতক্ষণ। হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'মেয়েটা কে, রানা? হু ইজ শি?'

'কি বললে?' ঠিক বুঝতে পারেনি রানা প্রশ্নটা।

'মেয়েটা কে?'

বরফ হয়ে গেল রানার বুকের ভিতরটা।

'কোন্ মেয়েটা কে? কি জিজ্ঞেস করছ বুঝতে পারছি না,' বলল রানা অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বরটা স্বাভাবিক রেখে।

'যে মেয়েটা পৌঁছে দিয়ে গেল তোমাকে তার কথা জিজ্ঞেস করছি। গার্ডদের কাছে শুনলাম। কে মেয়েটা?'

'আশ্চর্য! আমি জানব কি করে? বলেছি তো তোমাকে, পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ও...ই ওদিকে একটা পাকা রাস্তা পেয়ে হেঁটে এগোচ্ছিলাম। এই মেয়েটি সমুদ্রে স্নান করে ফিরছিল বোধহয়। হাত দেখাতেই থামল। বললাম পথ হারিয়ে ফেলিছি, খুব তাড়াতাড়ি গোল্ডেন ক্যাসিনোতে ফেরা দরকার আমার। পৌঁছে দিয়ে গেল। নামধাম জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রিটা রানার দিকে।

'না, এমনি জানতে ইচ্ছে করল, তাই জিজ্ঞেস করলাম।' ডিভানের দিকে এগিয়ে গেল রিটা ধীর পায়ে। রানাও গেল পিছন পিছন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল রিটা। 'শোনো, রানা। এখন থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ একই সুতোয় গাঁথা হয়ে গেল। আমরা একে অপরের গোপন কথা এত বেশি জানি যে ভাল না লাগলেও থাকতে হবে আমাদের একসাথে। বুঝতে পেরেছ?' উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই বলে চলল রিটা, 'একটা পরিষ্কার সমঝোতায় আসতে হবে আমাদের দু'জনকে। শুনে রাখো, আর কোন মেয়েলোক চাই না আমি আমাদের মধ্যে। নো আদার উওম্যান। শুধু তুমি আর আমি। যদি অন্য কোন মেয়েমানুষের সাথে মেলামেশা করো, তাহলে

সর্বনাশ করে ছাড়ব তোমার। সেনানায়েককে লেলিয়ে দেব আমি তোমার পেছনে। সাবধান! কোনও রকম চালাকি কিন্তু বরদাস্ত করব না আমি।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল ঘরের এককোণে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল রিটা। উঠিয়েই 'হ্যালো' বলল রিটা, তারপর আধমিনিট চুপচাপ শুনল উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

'আহ্-হা! বড় দুঃসংবাদ! কী বীভৎস! আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছি আমি এখন। লোকটা বোকা একটা—কতদিন নিষেধ করেছে ওকে কুমার, বাঘের ঘরে ঢুকো না।··· হ্যাঁ, নটরাজ এখানেই আছে। এই কিছুক্ষণ হলো ফিরেছে।···না, না। আমরা এর মধ্যে জড়াতে যাব না। সব ভার আপনার ওপর—আপনিই সব ব্যবস্থা করুন।···ও.ড। কাল দেখা হবে। অনেক ধন্যবাদ।' কিছুক্ষণ শুনল আবার রিটা নিঃশব্দে। হেসে উঠল খিলখিল করে। 'ঠিক আছে। আচ্ছা, রাখি। ঠিক আছে।'

রানার দিকে ফিরল রিটা।

'আর কোন চিন্তা নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে। যেমন যেমন ভেবেছিলাম ঠিক তেমনি পরপর ঘটে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। সেনানায়েক নিজের উপকারিতা প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমরা নিশ্চিন্ত।' কাছে চলে এল রিটা। 'শ্যাম্পেন খাওয়াও ডার্লিং। লেট আস সিলিব্রেট।'

গ্লাস হাতে নিয়ে চক্‌চকে চোখে চাইল রিটা রানার দিকে।

'ব্যস। আর কোন ভয় নেই। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলাম আমরা। আমরা এখন বড়লোক! কথাটা বিশ্বাস হতে চাইছে না, তাই না, রানা?'

তীব্র একটা ঘৃণা বোধ করল রানা এই স্ত্রীলোকটির প্রতি। আঙুলের ইশারায় যা খুশি করিয়ে নিচ্ছে ওকে দিয়ে। অথচ অবাধ্য হবার উপায় নেই। এর মুখের একটি কথায় ফাঁসীর দড়ি গলায় পরতে হতে পারে রানাকে।

আর কোন মেয়েলোক চাই না আমি আমাদের মধ্যে। নো আদার উওম্যান।

সবিতার কথা ভাবল রানা। কী আকাশ-পাতাল তফাৎ দু'জনের মধ্যে!

'জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের সামনে, রানা। কোটিপতি আমরা এখন। বিশ্বাস করতে পারো?'

মাথা নাড়ল রানা।

পঁচিশ

দেখতে দেখতে কেটে গেল দেড়টি মাস। অসহ্য দেড়টি মাস।

সবকিছু দখল করে নিল রিটা। রানাকে পাশে রাখল বডিগার্ড হিসেবে। কোন রকম গুজর-আপত্তি করবার কিংবা কোন কাজে বাধা দেবার উপায় নেই রানার। সেনানায়েকের ভয় তো ছিলই, নতুন ভয় যোগ হয়েছে তার সঙ্গে। হুলুগালের বাঘমারা ইলেকট্রিক চাবুকটা জোগাড় করেছে রিটা—মদের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলেই রানাকে বাগে আনবার চেষ্টা করে সে ওটা চালিয়ে।

একবিন্দু বিশ্বাস করে না সে রানাকে। হুলুগালের মৃতদেহ আগলে যে সাত ঘণ্টা তাকে বসে থাকতে হয়েছিল সেই সময়টা রানা আসলে কোথায় কাটিয়েছিল বের করবার চেষ্টা করে সে মাঝে মাঝে ওর ওপর মৃদু অত্যাচার করে। যে-মেয়েটি রানাকে পৌঁছে দিয়েছিল তাকে রানা চেনে না—একথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি ওর কাছে।

ক্যাশ রিজার্ভ যে সেফে আছে তার কমবিনেশন রিটার কবলে। সমস্ত ফাইল এবং কাগজপত্র যে ড্রয়ারে আছে, তার চাবিও। চোখেও দেখেনি রানা কোনদিন সে চাবি। দশলাখের কথা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল রানা, বলেছিল টাকাটা দিয়ে ওকে বিদায় করে দিতে। মধুর করে হেসেছিল রিটা। বলেছিল সবই রানার—ওই ক'টা টাকা নিয়ে কেটে পড়া ওর পক্ষে বোকামি হবে। তাছাড়া এতবড় ব্যবসা চালাতে গেলে রিজার্ভ টাকা সবটাই হাতে থাকা দরকার—যখন তখন দরকার হয়ে পড়তে পারে।

রানার চিন্তা চলছে অন্যরকম। ও বুঝতে পেরেছে আপনা-আপনি ঠিক হবে না ওর স্মৃতিবিভ্রাট। চিকিৎসা করাতে হবে। কিছু টাকা যদি হাতে পাওয়া যায় তাহলে সবিতাকে নিয়ে চলে যাবে সে। পত্রিকায় লিখেছিল সে নাকি স্পাই একজন—যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই সরকারী সাহায্য পাবে সে ওখানে গেলে। কিন্তু কিছুতেই দশ টাকার বেশি ওর হাতে দেয় না রিটা, পাছে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। প্রশ্ন করলেই বলে, 'ধৈর্য ধরো, রানা। তোমার শেয়ারটা আমি ব্যবসায়ে খাটিয়ে দশগুণ করে তারপর দেব তোমাকে। একটু ধৈর্য ধরো শুধু, তারপর দেখো কি করি।' একবিন্দু বিশ্বাস করে না রানা এসব কথা। কিন্তু রিটা বলেই চলে, 'তাছাড়া তোমার কিসের অভাব বলো? তুমি যখন যা চাইছ, পাচ্ছ না? তোমাকে সুখী করবার জন্যে সবই তো তোমাকে দিয়েছি আমি। আমার মত সুন্দরী বান্ধবী পেয়েছ—এর দামই তো পঞ্চাশ লাখ। যখন যা ইচ্ছে করবে, চাইবে। সত্যিই দিই কিনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেও তো এক-আধবার চেয়ে দেখতে পারো?'

এইসব কথার কোনও উত্তর নেই। মুখে হাসি টেনে এনে ভিতর ভিতর ওকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কোনও পথ রানার সামনে খোলা নেই। অপেক্ষা করতে হবে সুযোগের। তবে এটাও বুঝতে পারছে রানা—বেশি দেরি নেই, সুযোগ আসছে, ভালর দিকে চলেছে ক্রমে রানার অবস্থা।

রিটা চেয়েছিল নিজের ইচ্ছেমত চালাবে ক্যাসিনো। কিন্তু কয়েক দিন যেতে না যেতেই টের পেল সে, কেউ মেয়েমানুষ 'বস্' চায় না। শুধু যে ক্যাসিনোর স্টাফ ব্যাপারটা অপছন্দ করছে তা নয়, কোটিপতি সব খরিদ্দার, তাদের স্ত্রী ছেলেমেয়ে, খরিদ্দারের উপপত্নী, কেউ পছন্দ করছে না মেয়েমানুষ ম্যানেজার।

প্রথম প্রথম হুলুগালের অফিসরূমে ডেস্ক সামনে নিয়ে বসে থাকত রিটা। ওখানে বসেই স্টাফদের ওপর হুকুম চালাত সে এটা করো, ওটা করো। ভিজিটর এলে ব্যবসায়িক কথাবার্তা বলবার জন্যে রিটার কাছে নিয়ে আসার হুকুম ছিল। হাতে ক্ষমতা পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিল সে—যেন বিরাট এক রাজত্ব চালাচ্ছে।

তৃতীয় দিনেই লাফাতে লাফাতে অফিস ঘরে ঢুকল চা বাগানের মালিক কোটিপতি হনুমান দেওয়ার। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ, যুদ্ধংদেহী ভাব। একরাশ কটু কথা তড়বড় করছে ওর পেটের ভিতর। রেল এঞ্জিনের মত ফোঁস ফোঁস শব্দ তুলে ঝড় বয়ে আনছে সে।

রানা ছিল তখন অফিস ঘরে। ভাবল, মজা দেখা যাবে।

মধুর করে হাসল রিটা ডেস্কের ওপাশ থেকে। যেন এক হাসিতেই সব রাগ পানি করে দেবে। কিন্তু কে দেখে কার হাসি। একবার ডেস্কের দিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল হনুমান দেওয়ার। সোজা রানার সামনে এসে ব্রেক কষল।

'অ্যাই! আপনার নাম হিক্কা?' মিলিটারি কণ্ঠস্বর লোকটার। কেঁপে উঠল যেন দরজা-জানালা।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'গত দুই দিন যাবত কমপ্লেন করছি আমার ঘরের এয়ারকুলার নষ্ট হয়ে গেছে। কি ধরনের হোটেল চালান আপনারা, মশাই?'

মুখে মিষ্টি হাসি টেনে এগিয়ে এল রিটা।

'দেখুন, বুঝতে পারছি, আপনার খুবই অসুবিধা...'

ব্যস, এই পর্যন্তই। আর এগোতে পারল না রিটা। লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে বীর হনুমান। তীব্র দৃষ্টিতে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাতের ইশারায় সরে যেতে বলল সে রিটাকে।

'পুরুষ মানুষের কথার মধ্যে আসবেন না, ম্যাডাম। বুঝতে পেরেছেন? এই লোক নটরাজ হিক্কা না? হিক্কা তুলিয়ে ছেড়ে দেব একে আমি। আপনি সরে যান, গাল দেব আমি ওকে এখন।'

অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চেয়ে তিন-চার পা পিছিয়ে গেল রিটা। প্রতি সপ্তাহে হাজার পাঁচেক টাকা লাভ করে কোম্পানী এই লোকের কাছ থেকে—কাজেই তর্কাতর্কি না করে সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে বিবেচনা করল সে। কিন্তু বিছে কামড়ানো মুখের চেহারা হলো ওর।

অতি বড়লোকদের খুশি করতে বেশি সময় লাগে না। অল্প দু'চার কথাতেই শান্ত করে ফেলল রানা ওকে বেশ খানিকটা। মিস্ত্রী পাঠিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, 'যদি আবার আপনার এয়ারকুলার নষ্ট হয়—আপনার এই সপ্তাহের থাকা-খাওয়া ফ্রী, পয়সা দেবেন না। খুশি?'

তবু কিছুক্ষণ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল হনুমান। তারপর হাসল।

'তার মানে ঠিক হচ্ছে এয়ারকুলার? ঘুম হবে আজ রাতে?'

'ঘুম না হলে পয়সা নেই। ঘুম হতেই হবে।'

খুশি হয়ে ফিরে গেল কোটিপতি হনুমান দেওয়ার। গল্পটা ছড়িয়ে দিল চারদিকে। যার যত সমস্যা সব নিয়ে হাজির হতে আরম্ভ করল সবাই রানার কাছে।

'সোজা নটোরিয়াস হিক্কার কাছে চলে যাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। চালু ছোকরা।'

রব উঠে গেল চারদিকে। রাস্তায়, করিডরে, বারে, রেস্টুরেন্টে সবখানেই চেপে ধরতে আরম্ভ করল ওরা রানাকে—রানাও সমস্যার সমাধান করে চলল একটার পর একটা। অফিস ঘরে ঢুকে রানাকে না দেখলে, হিক্কাকে চাই পরে আসছি বলে ফিরে যেতে আরম্ভ করল কাস্টোমাররা।

জোসেফ তো বলেই বসল একদিন।

'মিস্টার হিক্কার উপর স্টাফের ভার দিয়ে দিন, ম্যাডাম। আপনাকে মানায় না। ম্যানেজারের কাজ মেয়েছেলে দিয়ে হয় না, পুরুষ মানুষ চাই।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল রিটাও। ব্যবসার ক্ষতি হবে নিজে মাতব্বরি করতে গেলে। কাজেই অফিস ঘরটা রানার জন্যেই ছেড়ে দিল সে।

'তুমিই চালাও, রানা। ক্যাসিনোর চার্জ তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু দেখো, বেশি বেড়ে যেয়ো না আবার। মাথা বিগড়ে গেলে হুলুগালের অবস্থা হবে তোমার। চাবি আমার কাছেই থাকবে। আর টাকা দরকার হলে আমি নিজে সেফ খুলব।'

রত্নপুরের কাজটা শুধু নিজের হাতে রাখল রিটা। ওরা টের পায়নি এখনও যে মারা গেছে কুমারস্বামী—ভয়ে ভয়ে সবাই ওর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। সপ্তাহে তিনদিন গিয়ে টাকা-পয়সা তুলে নিয়ে আসে সে রত্নপুর থেকে। আর ওর অনুপস্থিতিতে রানা চলে যায় সবিতার কাছে।

রানা জানে রিটা টের পেলে নির্ঘাত মৃত্যু ঘটবে ওর। কিন্তু কিছুতেই লোভ সামলাতে পারে না সে। সর্বক্ষণ সবিতার চিন্তা ওর মাথার মধ্যে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে—প্রেমে পড়েছে।

পর্তুগীজ এভিনিউ-এ একটা বাসা ভাড়া নিয়েছে রানা। সবিতার বান্ধবী ফিরে আসায় বাংলোতে দেখা করায় অসুবিধে হচ্ছিল। তাই দু'জন মিলে গিয়ে পছন্দ করেছে এই বাড়িটা। ঠিক সাগরের ধারে। আশেপাশে সব বাড়ি খালি। শহর থেকে এত দূর ভাড়া নিতে চায় না কেউ, মাঝে মাঝে শুধু বাগান-বাড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয় বাড়িগুলোকে।

ছয় মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স করতে হয়েছে বাড়িটার জন্যে। রানা টাকা পাবে কোথায়? রিটার কাছে চাইলে ধরা পড়ে যাবে। তাই একটু-আধটু বসতে হয়েছে ওকে জুয়ার টেবিলে। ওকে খুশি করবার জন্যে সূক্ষ্ম কৌশলে জিতিয়ে দিয়েছে ওকে ক্রুপিয়েই— পয়সার অভাব হয়নি রানার আর।

লাল একটা টয়োটা ক্রাউন ডিলাক্স কিনেছে রিটা নিজের জন্যে। সপ্তাহে তিনটে দিন গাড়িটা গেট থেকে বেরিয়ে গেলেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রানার মুখ। সোনার ফ্রেমে বাঁধা হয়ে যায় সেই দিনগুলো একটি একটি করে। বুইকে চেপে চলে আসে সে পর্তুগীজ এভিনিউয়ের বাড়িতে। ওর আসা-পথ চেয়ে বসে থাকে সেখানে সবিতা। সাগর পারে বেড়ায় ওরা হাত ধরাধরি করে, ঘরে এসে ছবি দেখে, গান শোনে, ক্যারম খেলে। কোনদিন আবার চলে যায় কোন বাগানে—দেশী-বিদেশী ফুলের সমারোহ সেখানে। কোনদিন চলে যায় বৈদ্যনাথনের রেস্তোরাঁয় কিংবা ডুব দিয়ে মুক্তো তোলে সাগর থেকে। তিনটে ঘণ্টা এক নিমেষে ফুরিয়ে

যায়। বিদায়ক্ষণে আঁধার হয়ে আসে ওদের মুখ। প্রেমে পড়েছে সবিতাও।

সবিতা যে কুমারস্বামীরই একমাত্র কন্যা এবং ওর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী একথা জানতে পারল রানা এখানে আসার প্রায় পনেরো দিন পরে। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা খুলে বলছিল সে সবিতাকে একটি কথাও গোপন না করে—দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল সবিতার গাল বেয়ে।

'কি হয়েছে সবিতা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল রানা।

'কিছু না, রানা, এমনিই।' এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল সবিতা।

'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। নিশ্চয়ই আমি কোন কথায় দুঃখ দিয়েছি তোমাকে।'

'হাজার হোক বাবা তে , যত খারাপই হোক না কেন, তবু তো উনি আমার বাবা।' কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সবিতা। জীবনের বিচিত্র সব কাহিনী শুনিয়েছিল রানাকে। অদ্ভুত একটা সুন্দর মন ছিল কুমারস্বামীর। নিজে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর যা খুশি তাই করে বেড়িয়েছে, কিন্তু চিরকাল আগলে আগলে রেখেছে সবিতাকে, কোন রকম পাপ বা কলুষের ছোঁয়া লাগতে দেয়নি ওর পবিত্র মনে।

এ নিয়ে অনেক ভেবেছিল রানা। দু'দিন পর দেখা হতেই বলেছিল সবিতাকে, 'তাহলে তো গোল্ডেন ক্যাসিনো তোমার। তোমার অধিকার তুমি ছেড়ে দেবে কেন?'

'আমি এ নিয়ে ঝগড়া করতে পারব না। তাছাড়া ক্যাসিনোর পাপ পথে উপার্জন করা টাকা নিলে আমার মঙ্গল হবে না কিছুতেই।'

'তাই বলে ছেড়ে দেবে কেন? ক্যাসিনো চালাতে না চাও বিক্রি করে দাও।'

'আমাকে দিচ্ছে কে যে আমি বিক্রি করে দেব? আমার কাছে উইলের কপি নেই, কোনও দলিলদস্তাবেজ নেই—চাইলেই ক্যাসিনো দিয়ে দেবে রিটা? কি দরকার এসব ঝামেলায়, রানা? বেশ তো আছি। সুযোগ পেলেই চলে যাব তোমার দেশে, আমি ছবি আঁকব, তুমি কাজ করবে অফিসে···চমৎকার দিন কেটে যাবে আমাদের।'

আর কোন কথা বলেনি রানা। কিন্তু ব্যাপারটা কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারেনি মনে মনে। রিটা যদি কুমারস্বামীর স্ত্রী হত তাও কথা ছিল। কিন্তু একটা নষ্ট-চরিত্র স্ত্রীলোক যদি···থাক, পরে চিন্তা করা যাবে এ নিয়ে।

পরে চিন্তা করে স্থির করেছে সে, যে-করে হোক আয়রন সেফের কমবিনেশনটা জোগাড় করতেই হবে ওকে। রানার যতদূর বিশ্বাস, উইলটা হুলুগাল আয়রন সেফেই রেখেছে। টাকাগুলো এবং সেই সাথে উইলটা হাতে পেলে আইনের আশ্রয় নিয়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে সবিতা। তারপর সব ক'টা ক্যাসিনো বিক্রি করে দিয়ে টাকাগুলো যে-কোন ব্যাঙ্কে রেখে দিলেই বছর ভর যা সুদ উঠবে তাতেই চিরকালের জন্যে অর্থ-চিন্তা দূর হয়ে যাবে ওদের।

কিন্তু রিটার ভয় দূর করতে পারেনি রানা মন থেকে। যমের মত ভয় পায় সে রিটাকে, ওর অশুভ প্রভাবকে। প্রচুর পরিশ্রম করে রানা ক্যাসিনোর পিছনে। প্রত্যেক সেকশনের চীফদের নিয়ে প্রতিদিন সকালে মীটিং বসায় সে। অনেক বুদ্ধি পাওয়া যায় ওদের কাছ থেকে। রিটা অপছন্দ করেছিল প্রথম প্রথম, বলেছিল

ডিসিপ্লিন থাকবে না, কেউ কখনও ডাকেনি এদের পরামর্শের জন্যে—কিন্তু অল্প কয়েকদিনেই বুঝতে পারল, এদের পরামর্শের কি দাম। সেল বেড়ে গেল ক্যাসিনোর। নিজেও যথেষ্ট বুদ্ধি খরচ করল রানা। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়ে হেলিকপ্টার ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড তৈরি করল সে। কলম্বোর এদিকে প্লেন সার্ভিস নেই। সারা সিংহলে এয়ারপোর্ট কেবল জাফনা আর কলম্বোর আট মাইল দক্ষিণে রতমালানে। রতমালান এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে সপ্তাহে দু'দিন কলম্বো-গল্ হেলিকপ্টার সার্ভিসের ব্যবস্থা করে ফেলল রানা। হুড়মুড় করে লোক আসতে আরম্ভ করল কলম্বো থেকে গল্-এ শনি-রবিবার।

খুশি হয়ে উঠল রিটা।

'আমি কল্পনাও করতে পারিনি, রানা, যে তোমার মাথায় এত বুদ্ধি আছে।' কেবিনে ডেকে নিয়ে এসে বলল রিটা একদিন। এইমাত্র ফিরেছে সে রত্নপুর থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে, কাজেই মনটা খুশি, কণ্ঠস্বরে আন্তরিক ভাব। রানাও পবিত্র একটা অনুভূতি নিয়ে ফিরেছে সবিতার কাছ থেকে ওর পাঁচ মিনিট আগেই। 'দেড়গুণ বেড়ে গেছে ক্যাসিনোর আয়।'

'এবার আমার দশ লাখ দিয়ে দিলেই তো পারো। তোমার প্রতিজ্ঞাটা পালন করে ফেলো এবার।'

মসৃণ হাসি হাসল রিটা।

'ধৈর্য ধরো, রানা। পাবে তুমি টাকা।'

'কবে?'

'এদিকে এসো। শ্যাম্পেন দাও আমাকে।' চকচক করছে রিটার চোখ।

খিঁচড়ে গেল রানার মন। ইচ্ছের বিরুদ্ধেও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে ক্যাবিনেটের কাছে।

মাঝে মাঝেই দুঃস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করল রানা। একটি দিনও আর যায়নি রানা বাঘের গর্তের দিকে। কিন্তু প্রায়ই স্বপ্ন দেখছে সে, প্রচণ্ড গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওর ওপর একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার, পালাতে পারছে না সে। বৃষ্টির রাতে ভেজা হাওয়ায় কেবিনের পর্দা কেঁপে উঠলেই আঁতকে ওঠে রানা—মনে হয় এক চোখ অদৃশ্য অবস্থায় হুলুগাল এসে দাঁড়াবে এখুনি পর্দা সরিয়ে। কাঁচা-পাকা একজোড়া ভুরুর কথাও মনে পড়ে রানার, তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখে ভর্ৎসনা। চমকে উঠে চিন্তা করে সে, কে এই বৃদ্ধ? টুকরো টুকরো আরও অনেক অর্থহীন কথা মনে পড়ে যায় ওর, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যোগসূত্র খুঁজে পায় না কোন কেবল শনি, মঙ্গল আর বৃহস্পতিবার দু'তিন ঘণ্টার জন্যে পৃথিবীর সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে যায় রানার মাথা থেকে। সোনার রঙে রাঙিয়ে দেয় সবিতা রানার মন। বিভোর হয়ে ভালবাসে ওরা দু'জন দু'জনকে, স্থায়ী মিলনের ভাবনায় উড়িয়ে দেয় কল্পনার ফানুস।

ইন্সপেক্টর সেনানায়েককে দেখলেই কালো হয়ে যায় রানার মন। সবকিছু বুঝে ফেলেছে সে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে, বাঘের কবলে প্রাণ দেয়নি হুলুগাল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছে সে রানাকে।

'একটা মজার ব্যাপার কি জানেন, বাঘগুলো হুলুগালের দেহটা ছিন্নভিন্ন করার কমপক্ষে আট ঘণ্টা আগেই মৃত্যু হয়েছিল ওর,' বলল একদিন সেনানায়েক। 'আশ্চর্যের ব্যাপার, তাই না?'

রানা বলল, 'সত্যিই, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার এটা।' প্রায় আধ মিনিট চোখে চোখে চেয়ে রইল ওরা। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল ইন্সপেক্টর গটমট বুটের আওয়াজ তুলে।

রিটাকে বলেছিল রানা।

'ও কিচ্ছু করবে না,' আশ্বাস দিয়েছে রিটা। 'আমার ইঙ্গিত না পেলে তোমার বিরুদ্ধে কিছুই করবে না সেনানায়েক।'

সত্যিই কিছু করেনি ইন্সপেক্টর। মোটা টাকা পাচ্ছে সে ক্যাসিনো থেকে···কাজেই ওর দায়িত্ব রানা ও রিটাকে ঝামেলা-মুক্ত রাখা। কিন্তু অল্পদিনেই যে আরও টাকা চাইবে সে, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা।

যাই হোক, সুযোগের অপেক্ষায় থাকল ও। এখান থেকে পালাবার প্ল্যান তৈরি করতে থাকল মনে মনে।

ঠিক এমনি সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো।

জাফনা থেকে এসে হাজির হলো নটরাজ হিক্কা।

ছাব্বিশ

কলকাতা থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল হুলুগালের নামে—কুমারস্বামী কলকাতায় যায়নি। রিটা উত্তর দিয়েছে হুলুগালের হয়ে যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে সুইটজারল্যাণ্ডে চলে গেছে কুমারস্বামী। এর ফলে সময় পাওয়া যাবে খানিকটা। রিটা আশা করেছিল নটরাজ হিক্কার কাছেও নিশ্চয়ই টেলিগ্রাম এসেছে কলকাতা থেকে। নিশ্চয়ই টেলিফোনে জানতে চাইবে নটরাজ কুমারস্বামীর খবর। কিন্তু কোন টেলিফোন আসেনি জাফনা থেকে। খুব সম্ভব কিছু একটা সন্দেহ করেছিল নটরাজ—হঠাৎ কোন রকম সংবাদ না দিয়েই এসে উপস্থিত হলো সে।

একা অফিসে বসে কাজ করছিল রানা দুপুর পৌনে একটার দিকে। নিঃশব্দে প্রবেশ করল নটরাজ হিক্কা। পায়ের শব্দ পায়নি রানা, হঠাৎ মুখ তুলেই চমকে উঠল। চারফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন মোটা বেঁটে থলথলে লোক। খসখসে অমসৃণ গায়ের চামড়া। সাপের মত ঠাণ্ডা নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার দিকে। মরণের ওপার থেকে চেয়ে রয়েছে যেন এক অশরীরী আত্মা। মুখে একগাল নিঃশব্দ হাসি। ঠোঁট দুটো পুরু, লালচে। ডান কানে তামার রিং ঝুলছে একটা। মুহূর্তে চিনে ফেলল রানা ওকে। আড়ষ্ট হয়ে গেল হাত-পা।

'আমি নটরাজ হিক্কা,' বলল লোকটা ভারি অথচ কোমল কণ্ঠে। 'হুলুগাল কোথায়?'

একটা বোতাম টিপল রানা। কোন বিপদে পড়লে এটা টিপবার হুকুম

আছে—ছুটে আসবে এক্ষুণি রিটা। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল সে।

'দোজখে,' উত্তর দিল রানা প্রশ্নের। 'মরে ভূত হয়ে গেছে।'

মুখের ভাব একবিন্দু বদলাল না, লালচে হাসিটাও মলিন হলো না একটুও। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল নটরাজ রানার মুখোমুখি। বুক ভরে বাতাস নিয়ে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিল ছাতের দিকে।

'তাহলে, মারা গেছে হুলুগাল?'

'নিশ্চয়ই। বেঁচে থাকার কি যুক্তি থাকতে পারে? মরতে তো একদিন হবেই। আমিও মরব, আপনিও।'

'ঠিক বলেছেন। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না! কে আপনি?'

ড্রয়ার টেনে খামোখা একটা কলম বের করল রানা। খোলাই রাখল ড্রয়ার। পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট অটোমেটিকটা রইল ওর নাগালের মধ্যে। নটরাজ হিক্কার নিঃশব্দ হাসি বিস্তৃততর হলো। চোখটা ঘুরে এল একবার আধখোলা ড্রয়ারটার উপর থেকে।

'আমিই এখানকার বর্তমান ম্যানেজার,' বলল রানা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে।

'বেশ, বেশ।' মাথা দোলাল হিক্কা। 'তা কে আপনাকে বহাল করল এই পদে?'

'আমি।' দরজার কাছ থেকে উত্তর দিল রিটা।

'বাহ্, চমৎকার!'

সাপের চোখ স্থির হয়ে আছে রানার চোখে। 'কুমারস্বামী কোথায়?'

রানার পিছনে এসে দাঁড়াল রিটা হিক্কার দিকে মুখ করে।

'কেমন আছ, নটরাজ?' বলল রিটা। 'অনেক দিন পর দেখা হলো। জাফনার খবর কি? সব খবর ভাল তো?'

পায়ের উপর পা চড়িয়ে আয়েস করে বসল নটরাজ। হাত দুটো ভুঁড়ির উপর। রানা বুঝল গোক্ষুরের চেয়েও ভয়ঙ্কর এই লোক। অর্থহীন হাসিটা এক সেন্টিমিটারও কমেনি, একবিন্দু বিস্ময় প্রকাশ পায়নি ওর চেহারায়। অথচ হুলুগালের মৃত্যু এবং অপ্রত্যাশিতভাবে রিটার আবির্ভাব, দুটোই চমকে ওঠার মত ব্যাপার। কিন্তু একবিন্দু বিচলিত হয়নি সে।

রানার চোখের দিকে চেয়েই উত্তর দিল সে রিটার প্রশ্নের।

'আমি ভাল আছি। সত্যিই অনেক দিন পর দেখা হলো। জাফনার খবর ভাল। সব খবর ভাল। কুমারস্বামী কোথায়?'

'মারা গেছে,' বলল রিটা।

ভাব পরিবর্তন হলো না নটরাজের, পলক পড়ল না চোখের, হাসিটাও তেমনি রইল।

'বেশ, বেশ। মরতে তো একদিন হতই। কিভাবে মারা গেল? সর্দি-কাশি, না কেউ সাহায্য করল এই কঠিন কাজটা করতে?'

'গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

ডানহাতটা তুলে নখগুলো পরীক্ষা করল নটরাজ। তারপর অনেকটা আপন

মনে বলল, 'কাজেই যুবক দেখে একজন লোক জোগাড় করে ক্যাসিনোটা দখল করে নিয়েছ তুমি?'

'ঠিক তাই,' বলল রিটা শান্ত কণ্ঠে। 'এই ব্যাপারে তোমার কিছুই করণীয় নেই, নটরাজ।'

আরও একটু বিস্তৃত হলো নটরাজের হাসি।

'আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, তোমার মত এক্সপার্ট মেয়ে হয় না, রিটা। যাক, তোমরা দু'জন ছাড়া ওর মৃত্যু সংবাদ জানে আর কেউ?'

'না। ধীরে ধীরে আপনিই জানতে পারবে সবাই। ইট্স্ ওনলি ম্যাটার অফ টাইম।'

'তা ঠিক।' মোটা একটা বেঁটে আঙুল দিয়ে রানাকে দেখাল নটরাজ। 'এ কে?'

'ওর নাম তোমার না জানলেও চলবে। কাজের সুবিধার জন্যে ওকে এখানে সবাই ডাকে নটরাজ হিক্কা বলে।'

মাথা ঝাঁকাল নটরাজ।

'অর্থাৎ হুলুগালের কাছে একে আমি বলে চালানো হয়েছিল। ভাল, ভাল। কিন্তু তাহলে আমি কে? কাজের সুবিধার জন্যে এখানে সবাই আমাকে ডাকবে কি বলে?'

'এখানে তোমার বিশেষ কাজ নেই। তবে যদি ক'দিন বেড়িয়ে যেতে চাও আপত্তি নেই আমাদের। তাহলে নাগরাজ হিক্কা বলে ডাকা যেতে পারে তোমাকে। নটরাজের বড় ভাই।' একটা সিগারেট ধরাল রিটা। 'দেখো নটরাজ, কুমার মারা গেছে। তুমি জাফনা ক্যাসিনো নিয়ে নাও, কলম্বো নিক ডি সিলভা, আমি নিচ্ছি গল্। আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করলে খামোকা রক্তারক্তি কাণ্ড হবে। তার চেয়ে যে যেখানে আছি সন্তুষ্ট থাকলেই চুকে যায়। কি বলো?'

'ভাগাভাগিটা চমৎকার হয়েছে। কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষ কি এতবড় ক্যাসিনো চালাতে পারবে? তোমাদের পক্ষে একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা?'

রানার ডান হাতটা ড্রয়ারের কাছে চলে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে প্রয়োজন পড়তে পারে পিস্তলটার।

'মোটেও না,' জবাব দিল রিটা। 'এর মত একজন এক্সপার্ট ফাইটার এবং সেনানায়েকের মত একান্ত বাধ্য ইন্সপেক্টর থাকতে কঠিন হবে কেন? জলের মতই সহজ এই ক্যাসিনো চালানো। দেড়টি মাস তো চালিয়ে দেখলাম।'

মাথা ঝাঁকাল নটরাজ। চোখ দুটো ওর রানার ডান হাতের উপর নিবদ্ধ।

'তাহলে তো ভালই। এক্সপার্ট হলে তো খুবই ভাল কথা। স্মার্ট লোক আমি খুবই পছন্দ করি। তোমরা দু'জনই খুব স্মার্ট।' কান চুলকাল নটরাজ। 'আমি দিন দুয়েক আতিথ্য গ্রহণ করতে পারি? নাগরাজ হিক্কা হিসেবেই বেড়িয়ে গেলাম না হয় দু'দিন?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বলল রিটা রানাকে আপত্তি করবার সুযোগ না দিয়েই।

'চলো, নাগরাজ, জায়গাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখিয়ে আনি তোমাকে। তুমি আসবে নাকি, নটরাজ?'

'আমি একটু ব্যস্ত আছি এখন। দুটোর দিকে জোসেফের রেস্তোরাঁয় চলে এসো তোমরা—একসাথে লাঞ্চ খাওয়া যাবে,' বলল রানা।

'ঠিক আছে।'

উঠে দাঁড়াল নটরাজ হিক্কা। রানা ড্রয়ারটা বন্ধ করবার আগেই চট করে সামনে ঝুঁকে দেখল সে কি আছে খোলা ড্রয়ারে।

'চালু লোক তুমি হে, ছোকরা। বড় সাবধান লোক। অবশ্যি সাবধান থাকাই ভাল। বিপদের যথার্থ পরিমাণটা বুঝতে পারা বুদ্ধিমানের লক্ষণ। চলি, দেখা হবে।'

চলে গেল লোকটা নিঃশব্দ পায়ে রিটার পিছন পিছন। ঘর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ড্রয়ারটা বন্ধ করল না রানা। লক্ষ করল, হাতের তালু ঘেমে উঠেছে ওর।

আশ্চর্য রকমের ধূর্ত এবং ভয়ঙ্কর লোক এই নটরাজ হিক্কা। রানা বুঝল, সাধে আর নটোরিয়াস হিক্কা বলে না লোকে একে। এ লোক করতে পারে না এমন কাজ নেই। হঠাৎ কি মনে করে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল রানা। দেখল নিচে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে রিটা আর নটরাজ। কি যেন বোঝাচ্ছে লোকটা রিটাকে। অনর্গল কথা বলছে নটরাজ, মন দিয়ে শুনছে রিটা। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল রানা কথাগুলো, কিন্তু কিছু শুনতে পেল না সে। কেন জানি খারাপ হয়ে গেল ওর মনটা।

পৌনে দুটোর দিকে রেস্তোরাঁয় পৌছল রানা। দেখল কোণের একটা টেবিলে বসে গল্প করছে রিটা নটরাজের সঙ্গে। আগেই এসে গেছে ওরা।

'হেলিকপ্টারের বুদ্ধিটা ভালই বের করেছ, নটরাজ,' বলল নটরাজ একটা চেয়ার টেনে রানা বসতেই। 'চমৎকার হয়েছে।' নিঃশব্দ লালচে হাসি নটরাজের পুরু ঠোঁটে।

জোসেফ নিজে এসে অর্ডার লিখে নিয়ে গেল। আবার মুখ খুলল নটরাজ।

'বাঘের গর্তটা দেখলাম। হুলুগালের কি হয়েছিল শুনলাম রিটার কাছে। তুমি আবার ওর মত নিজের হাতে খাওয়াতে যাও না তো বাঘগুলোকে?'

'না। একটা দুর্ঘটনাই যথেষ্ট,' বলল রানা মৃদু হেসে। বুঝল, অনেক কথাই বলে ফেলেছে রিটা। এতটা না বললেও চলত।

'রিজার্ভ থেকে সত্যিই ও চুরি করছিল নাকি?' জিজ্ঞেস করল নটরাজ।

'করছিল। তবে খুব বেশি না,' উত্তর দিল রিটা।

'এখানকার রিজার্ভও তো বিরাট। আমার কাছে যা আছে তার ডবল।'

'এর প্রতিটি পাই পয়সা আমাদের দরকার,' বলল রিটা এবার।

'আমি ভাবছিলাম, তোমরা হয়তো এত টাকা এখানে না রেখে অর্ধেকটা জাফনায় ট্র্যান্সফার করবার কথা চিন্তা করতে পারো। আমার অবশ্যি বলবার কিছুই নেই। তবে কুমার মাঝে মাঝে একখান থেকে আরেকখানে টাকা চালাচালি করতে পছন্দ করত। অনেক সুবিধা হয় এরকম করলে। সবাই সন্তুষ্ট থাকে।'

কোনও জবাব দিল না রিটা এ কথার। যেন শুনতেই পায়নি সে। হঠাৎ আধ সেকেণ্ডের জন্যে হাসিটা মিলিয়ে গেল নটরাজের মুখ থেকে। যা দেখবার দেখে নিল রানা।

'অবিশ্য এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তোমাদের ইচ্ছের ওপর।' আবার ফিরে এল হাসিটা।

'বলছি তো, রিজার্ভ থেকে একটি পাই পয়সাও দেয়ার উপায় নেই কাউকে।' কথাটা বলেই খাবারের দিকে মনোযোগ দিল রিটা।

আর চাপাচাপি করল না নটরাজ। কিন্তু রানা বুঝল সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ও নয়। নানান কৌশলে টাকা আদায় করবার চেষ্টা করবে—শুধু হাতে ফিরবে না নটরাজ।

প্রায় নিঃশব্দে খেয়ে উঠল ওরা। কোন আলোচনাই আর জমল না। কফিতে চুমুক দিল রানা। তারপর মুখ তুলেই দেখল রিটা এবং নটরাজ ওর পিছন দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। প্রথমে চিনতে পারেনি রানা, তারপর হঠাৎ মনে পড়ল। অণিমা দেওয়ার। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে সে।

সী-বীচে সেই যে দেখা হয়েছিল, তারপর আর দেখেনি রানা অণিমাকে।

'হ্যালো, হ্যাণ্ডসাম? রানার কাঁধে একটা হাত রাখল অণিমা। 'চিনতে পারো?'

বিচ্ছিরি একটা মিনি স্কার্ট পরেছে সে। শরীরের অর্ধেকটাই অনাবৃত। লাল হয়ে আছে চোখ দুটো। উঠে দাঁড়াল রানা। উঠে দাঁড়াল নটরাজও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রিটা রানার মুখের দিকে। রানার ভিতর থেকে কে যেন বলে দিল ওকে, বিপদের সম্মুখীন হয়েছে সে।

'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে।

'বলছি,' রানার জামা খামচে ধরে নিজেকে সোজা রাখল অণিমা। 'বলতেই তো এসেছি।'

'আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি মিসেস কুমারস্বামী, ইনি হচ্ছেন মিস্টার হিক্কা…আর ইনি হচ্ছেন মিস্ অণিমা দেওয়ার।'

মাথা নিচু করে অভিবাদন করল নটরাজ, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না অণিমা।

'আমি জানতাম তুমিই নটরাজ হিক্কা?' বলল সে রানার দিকে চেয়ে।

'হ্যাঁ। ইনি হচ্ছেন আমার বড় ভাই নাগরাজ হিক্কা। বাপ এক, মা আলাদা।'

'তোমার মত হারামি লোকের আবার বাপও আছে নাকি?' হঠাৎ বলে বসল অণিমা।

স্তব্ধ হয়ে গেল রেস্তোরাঁর সবাই। একটি কথাও বলল না রানা। নটরাজও চুপ করে রইল। সিগারেট ধরাল রিটা একটা। ঘরের সবাই চেয়ে রয়েছে রানার মুখের দিকে।

'কি হে, হারামজাদা! কথা বলছ না কেন?'

নটরাজের মুখে সেই অর্থহীন হাসিটা দেখা দিল। কৌতুক বোধ করছে সে রানার দুরবস্থা দেখে। ফ্যাকাসে মুখে বসে রইল রিটা চুপচাপ। রানা বুঝল ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ওর নিজেকেই করতে হবে।

'কি চান আপনি?' জিজ্ঞেস করল সে।

রানার গায়ের সঙ্গে সেঁটে এল অণিমা। লাল দুই ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

'আমি জানতে চাই ঢলো ঢলো চেহারার ঐ রোদিয়াটা (গণিকা) কে? পর্তুগীজ এভিনিউ-এর বাসায় রেখেছ যেটাকে। প্রত্যেক শনি-মঙ্গল-বিস্যুৎবার গলের বাগানে বাগানে, সাগর তীরে, বৈদ্যনাথনের রেস্তোরাঁয় যে মেয়েলোকটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াও। কে সে?'

লাল হয়ে উঠল রানার মুখ, তারপর ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিচ্ছু ভাবতে পারছে না সে আর। মুখ খুলল সে কিছু বলবার জন্যে—শব্দ বেরোল না একটিও।

নটরাজ সাহায্য করল এতক্ষণ পর।

'ও হচ্ছে এর ছোট বোন। মা এক, বাপ আলাদা। এবার আপনি যেতে পারেন। শুধু শুধু মাতলামি করে লোক হাসাচ্ছেন কেন? বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে আপনার মুখ থেকে...লজ্জা করছে না আপনার?'

হেসে উঠল কে যেন দূরের একটা টেবিল থেকে।

পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপসে গেল অণিমা। ছুটে চলে গেল সে রেস্তোরাঁ থেকে। নটরাজের মুখের দিকে চাইল এবার রানা।

'খারাপ কিছু বলে ফেলিনি তো?' জিজ্ঞেস করল নটরাজ।

'না। একদম মাতাল ছিল ভদ্রমহিলা।'

রিটার দিকে চাইল এবার রানা। চমকে উঠল মনে মনে।

'পর্তুগীজ এভিনিউ-এ বাড়ি নিলে কবে, রানা?' জিজ্ঞেস করল রিটা হাসি মুখে। কিন্তু চোখ দুটো অস্বাভাবিক জ্বলছে ওর। 'অবশ্য না বলতে চাইলে জোর নেই।'

'মাতালের কথায় কান দিচ্ছ কেন, রিটা?' বলল রানা অন্যদিকে চেয়ে।

'হ্যাঁ। এদের কথায় কান দেয়া ঠিক না,' বলল নটরাজ আসর জমানো ভঙ্গিতে। 'আমাদের জাফনায় প্রায়ই এরকম দু'একটা ঘটনা...'

উঠে দাঁড়াল রিটা।

'আমি আর নাগরাজ রত্নপুর যাচ্ছি,' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘোষণা করল রিটা। 'পরে আলাপ করা যাবে এ নিয়ে।'

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল রিটা রেস্তোরাঁ থেকে। একমাইল লম্বা হাসি নিয়ে পিছন পিছন গেল নটরাজ হিক্কা।

সাতাশ

অফিস ঘরে বসে আছে রানা। মাথায় দ্রুত চিন্তা।

সময় হয়ে গেছে। স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেয়েছে সে রিটার মুখে। ওর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি রানা। আজ সন্ধ্যার আগেই পর্তুগীজ এভিনিউ-এর বাড়ি আর বৈদ্যনাথনের রেস্তোরাঁ থেকে সব খবর সংগ্রহ করে ফেলবে সে। সবিতাকে পাবে না—সে গেছে কলম্বো। দু'দিন থাকবে এক বান্ধবীর বাসায়, কিছু রঙ আর তুলি কিনে নিয়ে আসবে। কিন্তু সবিতাকে না পেলেও সবিতার খবরই যথেষ্ট। আজই এখানে রানার শেষ দিন···হয়তো বা জীবনেরও। সব জেনে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রিটা তা সে-ই জানে।

কাজেই সময় থাকতে কেটে পড়তে হবে।

ঘাড় ফিরিয়ে আয়রন সেফের দিকে চাইল রানা। টাকাগুলো এবং উইলটা রয়েছে ওর মধ্যে। কিন্তু কমবিনেশন ছাড়া হাতুড়ি পিটালেও খুলবে না আয়রন সেফ। একটি মাস অপেক্ষা করেছে রানা, ভেবেছে ভাগ্যক্রমে পেয়ে যাবে কমবিনেশন। পায়নি। এখন মাত্র দুটো ঘণ্টা সময় আছে হাতে। এর মধ্যে পাবে কি করে?

রিটার কাছ থেকে কোন কৌশলে কমবিনেশন বের করা অসম্ভব। আর কার কাছ থেকে জানা যায়? হুলুগাল জানত, কিন্তু মারা গেছে সে। সেফটা যে কোম্পানীর তৈরি তারা জানতে পারে, কিন্তু বলবে না কিছুতেই। আচ্ছা, জোসেফ জানে নাকি? জিজ্ঞেস করে দেখবে? রিসিভার কানে তুলে ডায়াল ঘোরাল রানা।

'জোসেফ? আমি হিক্কা বলছি। একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। মিস্টার পরানাভিতান বসে আছেন আমার সামনে। একটা চেক ভাঙাতে চাইছেন, কিন্তু মিসেস কুমারস্বামী বাইরে। সেফের কমবিনেশনটা জানা আছে তোমার?' স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি তো জানি না কমবিনেশনটা, মিস্টার হিক্কা। বড় মুশকিল হলো তো!' গলার স্বরে রানা বুঝল সত্যিই জানে না সে। জানলে বলত।

'আহ্-হা! কি যে করি ভাবছি। ভদ্রলোকের খুব জরুরী দরকার।'

'রত্নপুরে ফোন করে দেখবেন নাকি? আমার মনে হয় আপনার ভাইকে নিয়ে মিসেস কুমারস্বামী রত্নপুরের দিকেই গেলেন।'

'এই তো আধ ঘণ্টা আগে রওনা হলো। পৌঁছতে পৌঁছতে আরও এক ঘণ্টা লাগবে। ততক্ষণে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন ভদ্রলোক আমাকে। তোমার কাছেও তো চল্লিশ হাজার টাকা হবে না, তাই না?'

না বাচক উত্তর এল জোসেফের তরফ থেকে।

'ঠিক আছে। কি আর করা। বিরক্ত করলাম তোমাকে,' নামিয়ে রেখে দিচ্ছিল রানা রিসিভারটা, হঠাৎ চিঁ চিঁ শব্দ শুনে কানে লাগাল আবার। 'কি বললে?'

'বলছিলাম, মিস অনুরাধা থাকলে সে বলতে পারত। তাকে তো বিদায় করে দিলেন আপনারা।'

মিস অনুরাধা? ওহ-হো, হুলুগালের সেক্রেটারি। ক্যাসিনোর চার্জ নেবার দু'দিনের মধ্যেই বরখাস্ত করেছিল রিটা ওকে। ইন্সপেক্টরকে ডাকার জন্যে ভয়ানক খেপে গিয়েছিল রিটা।

'মিস্ অনুরাধা কি জানত কমবিনেশনটা?'

'জানত। মিস্টার হুলুগাল বাইরে কোথাও গেলে সে-ই তো ক্যাশ নাড়াচাড়া করত।'

'যাক্, সে তো নেই। এখন আর ওর কথা ভাবলে লাভ কি? রাখলাম, জোসেফ।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। তারপর ডায়াল ঘুরাল আবার স্টাফ সুপারভাইজারের নম্বরে।

'হিক্কা বলছি। মিস্ অনুরাধার ঠিকানাটা দরকার। লেখা আছে আপনার কাছে?'

'ধরুন, একমিনিট, স্যার,' বলল সুপারভাইজার।

একমিনিটই একঘণ্টা মনে হলো রানার কাছে।

'৪৭৩-পি, প্রিন্স রোড।'

'ফোন আছে?'

'আছে, স্যার। টু ওয়ান সেভেন এইট।'

'আচ্ছা, ধন্যবাদ।' রিসিভারটা নামিয়ে তুলে নিল রানা আবার। ডান হাতের শার্টের আস্তিনে ঘাম মুছল কপালের। তারপর ডায়াল ঘুরাল আবার।

বিশেষ পরিচয় নেই রানার সঙ্গে মিস্ অনুরাধার। দুই একদিন দেখা হয়েছে শুধু। রানা ভদ্র ব্যবহার করেছে। বরখাস্তের দিনও অনেক কটু কথা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সে অনুরাধাকে। কিন্তু তাই বলে টেলিফোন করলেই কমবিনেশন বলে দেবে ওকে তার কোন মানে নেই। দেখা করতে হবে ওর সঙ্গে ওর বাড়িতে।

'মিস্ অনুরাধা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা হ্যালোর উত্তরে।

'হ্যাঁ। আপনি কে?'

'আমি নটরাজ হিক্কা। আপনার সঙ্গে আমার দেখা করা খুব দরকার। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি এসে হাজির হতে পারি আপনার বাসায়। অসুবিধে হবে আপনার?'

একটু চুপ করে থাকল অনুরাধা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপারে দেখা করতে চান?'

'সেটা সামনাসামনিই না হয় বলতাম?'

'বেশ, আসুন। সন্ধ্যার আগে অবশ্যি আমি কোনও পুরুষ মানুষকে আসতে দিই না আমার ঘরে, তবে আপনি আসতে পারেন।'

'ধন্যবাদ। আমি রওনা হয়ে গেলাম। ছাড়ি এখন।'

এক তলায় নেমে এল রানা সিঁড়ি বেয়ে। লবি পেরিয়েই কিছুদূরে রাখা আছে

ওর বুইকটা। কে যেন কি বলল রানাকে, কিন্তু শুনতে না পাওয়ার ভান করে হন হন করে হেঁটে চলে এল সে গাড়িটার পাশে। দূর থেকে রানাকে দেখেই গেট খুলে দিল গার্ড দু'জন। বড় রাস্তায় উঠেই ষাট মাইল স্পীডে চলল রানা শহরের মাঝামাঝি এলাকায় প্রিন্স রোডের দিকে।

বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না কোন। প্রকাণ্ড বাড়ি—অনেকগুলো অ্যাপার্টমেন্টে বিভক্ত। অ্যাপার্টমেন্ট পি, পেল রানা চারতলার উপর। টোকা দেয়ার সাথে সাথেই খুলে গেল দরজা। হাসছে দাঁড়িয়ে অনুরাধা।

'উড়ে চলে এসেছেন মনে হচ্ছে! আসুন, ভেতরে আসুন।'

ছোট্ট ঘর। রানাকে একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে বিছানার উপর বসল অনুরাধা। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল দু'জনেই। রানার মনে হলো এর কাছ থেকে কমবিনেশন পাওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে।

'আর কোন চাকরি পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। হাতে আছে নাকি কোন চাকরি?' হাসল অনুরাধা। 'কিছু একটা চাকরি থাকলে উপার্জন অনেক কমে যায় আমাদের, কিন্তু সেই সঙ্গে পুলিসের ঝামেলাও কমে। আছে নাকি চাকরি?'

মাথা নাড়ল রানা।

'ক্যাসিনোর আয়রন সেফের কমবিনেশনটা দরকার আমার। জোসেফ বলল আপনার জানা আছে সেটা। সেজন্যেই এসেছি আমি।' সোজাসুজি স্পষ্ট জানাল রানা নিজের উদ্দেশ্য।

'সময় নষ্ট করতে নিশ্চয়ই আসেননি আপনি,' বলল অনুরাধা মুচকি হেসে। 'আমি বলব সে ধারণা হলো কি করে আপনার?'

'ধারণা নয়। চেষ্টা করলে ক্ষতি নেই, তাই এলাম। কিন্তু আপনি অবাক হলেন না তো একটুও?'

'অবাক হওয়ার কি আছে? আপনি আসবেন, আমি জানতাম। এত দেরি হলো দেখেই বরং আমার অবাক হওয়ার কথা। যাক, কি করতে চাইছেন? টাকা নিয়ে ভাগবেন, না মেয়েলোকটাকে শেষ করে দিয়ে নিজেই জমে বসবেন?'

'আমি আসলে এই লাইনের লোকই নই। ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছি এর সঙ্গে। সে অনেক কথা—বলবার সময় নেই। আমাকে অর্ধেক শেয়ার দেবার কথা ছিল ওর—মত পরিবর্তন করেছে ও কাজ উদ্ধারের পর। আজ আমার চলে যেতে হচ্ছে এখান থেকে। ভাবলাম টাকাগুলো শুধু শুধু রেখে যাই কেন?'

'আমার সাহায্য পাবেন এই ধারণা হলো কেন আপনার?'

'বললাম তো, চেষ্টা করে দেখলাম। আপনি যখন রাজি নন, তখন চলি।' দেয়াল ঘড়ির দিকে চাইল রানা। সোয়া পাঁচটা বাজে। সময় নেই আর হাতে।

'একটু সাধাসাধি করলে তো বলতেও পারি?' বলল অনুরাধা মৃদু হেসে। 'অত ঝট্‌পট্‌ কাজ সেরে পালাতে চাইছেন কেন?'

'দেখুন, আমার জীবন বিপন্ন। সাধাসাধির সময় নেই। আর একঘণ্টার মধ্যে যদি গল্‌ ছেড়ে রওনা হতে না পারি তাহলে এই গলের মাটিতে মিশে যেতে হবে

চিরকালের জন্যে। সাহায্য করুন আর না-ই করুন এক্ষুণি রওনা হতে হবে আমাকে।'

'একটা কথা বলুন,' চাইল অনুরাধা রানার চোখের দিকে সোজাসুজি। 'কে খুন করেছিল হুলুগালকে? আপনি না রিটা?'

'রিটা। তবে লাশটা সাত ঘণ্টা পর আমাকেই ফেলতে হয়েছিল বাঘের গর্তে। নইলে খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে দিত ও আমাকে।'

ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অনুরাধা। একটা পাউডারের কৌটোর মধ্যে থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল। সেটা রানার হাতে না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'টাকা নিয়ে পালাতে পারবেন তো ঠিক?'

'চেষ্টার ক্রুটি করব না।'

'কি করবেন? টাকার বাণ্ডিল বগলে চেপে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন? গার্ডরা খুব খুশি হবে তাহলে।'

'সুটকেসের মধ্যে ভরে গাড়িতে করে নিয়ে বেরোব।'

'তার চেয়ে এই জানালা দিয়ে নিচে লাফিয়ে নামাও কম বিপজ্জনক।'

রানা মনে করল শেয়ারের জন্যে এইসব আবোলতাবোল বকছে অনুরাধা। তাই সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে কত দিতে হবে বলে ফেলুন!'

'আমি যা চাইব তা দিতে পারবেন না আপনি। আমার হুলুগালকে ফিরিয়ে দিন। পারবেন দিতে? টাকা দিয়ে কি করব আমি? পারবেন আপনি একটা মেয়ের বিয়ের তৃতীয় দিনটা ফিরিয়ে দিতে? পারবেন না। এই নিন কমবিনেশন। ওই রক্তলোভী ভ্যাম্পায়ার-টাকে যদি একটুও শায়েস্তা করতে পারেন সেই আমার পরম পাওয়া হবে।'

হাঁ হয়ে চেয়ে রইল রানা অনুরাধার মুখের দিকে। কতবড় ক্ষতি করেছে ওরা এটা ভাবতেই মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল সে। টপ টপ করে জল পড়ছে অনুরাধার গাল বেয়ে। জল তো নয়—তাজা রক্ত যেন ওগুলো। আপনা থেকেই মাথাটা নিচু হয়ে গেল রানার।

'আশ্চর্য লোক তো আপনি! আপনার আবার অনুভূতিও আছে! লাশটা বাঘের গর্তে ফেলবার সময় এ অনুভূতি কোথায় ছিল?'

জবাব দিল না রানা। কাগজের টুকরোটা রয়ে গেল অনুরাধার হাতে। পায়ে পায়ে দরজার দিকে সরে যাচ্ছে সে। পালিয়ে যেতে চায় রানা। কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না সে অনুরাধার হৃদয় মথিত চোখের জল।

'নিন, ধরুন। এটা নিয়ে যান। আমার যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

হাত বাড়িয়ে কাগজের টুকরোটা নিল রানা।

'ক্ষমা চাইবার অধিকারও নেই আমার আর। নইলে ক্ষমা চাইতাম...'

'থাক, আপনি ক্ষমা চাইলেই যদি আমার স্বামীকে ফিরে পেতাম, তাহলে ক্ষমা করতে দ্বিধা করতাম না। ওসব কথা থাক। এখনও কি গাড়িতে করে টাকাগুলো নেবার কথা ভাবছেন?'

'এছাড়া আর...'

'শুনুন। টাকাগুলো ক্যাসিনো থেকে বের করবার শুধু একটাই উপায় আছে। খুব সম্ভব জানেন না আপনি, প্রতিদিন সন্ধ্যে ছ'টার সময় লাগেজ কিংবা অন্যান্য মালপত্র নেবার জন্যে রেল কোম্পানীর একটা ট্রাক আসে ক্যাসিনোতে। প্রত্যেকদিনই রেলে পাঠাবার মত কিছু না কিছু জিনিস থাকেই। টাকাগুলো একটা সুটকেসের মধ্যে ভরে কলম্বো, কাণ্ডি বা জাফনা যে-কোন স্টেশনে পাঠিয়ে দিন ওটা নিজের নামে বুক করে। একটা রশিদ দেবে ট্রাকওয়ালা। লাগেজ এণ্ট্রান্সে ট্রাকটায় মাল তোলা হয়—কাছাকাছি সাধারণত লোক থাকে না কেউ। ওখানেই ওর কাছে গছিয়ে দেবেন সুটকেসটা। গার্ডরা ওই ট্রাক চেক করে না। আপনি খালি হাতে বেরিয়ে যাবেন ক্যাসিনো থেকে, কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।'

রানা বুঝল, সত্যিই এছাড়া উপায় নেই আর কোন। বেরিয়ে এল সে অনুরাধার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। বিশ মিনিটের মধ্যে একটা চামড়ার সুটকেস, গজ বিশেক সরু শক্ত নারকেলের রশি আর একটা বড় সাইজের মাংস ঝুলাবার লোহার হুক কিনে ফেলল রানা। তারপর দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল ক্যাসিনোতে। নাক-চওড়া গার্ডটাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ফেরেনি এখনও রিটা।

ক্যাসিনোর পিছনে এসে দাঁড়াল রানা গাড়িটা নিয়ে। বিশফুট উঁচুতে ওর অফিসঘরের জানালা। আশপাশে কেউ নেই। জানালার নিচে নামিয়ে রাখল সে সুটকেস, তারপর গাড়ি নিয়ে সামনের দিকে চলে এল।

কয়েক লাফে সিঁড়িগুলো টপকে দোতলায় উঠে এল রানা। লবিতে, সিঁড়িতে কয়েকজন ওকে থামাবার চেষ্টা করল—কমপ্লেন আছে হয়তো, কিংবা খুচরো আলাপ। পাশ কাটিয়ে চলে এল রানা মৃদু হেসে ব্যস্ত পায়ে।

রিটা যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে জানতে পারবে যে রানা কোনও সুটকেস বা ওই জাতীয় কিছু নিয়ে ঢোকেনি অফিসঘরে, শুধু ছোট্ট একটা বাদামী রঙা কাগজের প্যাকেট ছিল ওর হাতে।

অফিসে ঢুকেই দরজায় বল্টু লাগিয়ে দিল রানা। জানালার ধারে গিয়ে দড়ির একমাথায় বাঁধা হুকটা নামিয়ে দিল নিচে। হ্যাণ্ডেলে বাধিয়ে উপরে টেনে তুলে আনল সে সুটকেসটা। তারপর টেনে নিয়ে এল সেটাকে আয়রন সেফের কাছে। ডেস্কের উপর রাখা ঘড়িটার দিকে একনজর চাইল সে। ছয়টা বাজতে দশ। জলদি কাজ সারতে হবে—সময় নেই।

দ্রুত টাম্বলার ঘুরাতে আরম্ভ করল রানা। একহাতে ধরা আছে কমবিনেশন লেখা কাগজের টুকরোটা। ঢিব ঢিব করছে বুক। শেষ অক্ষরটায় আসতেই স্পষ্ট অনুভব করতে পারল রানা ঠিক জায়গা মত পড়ল টাম্বলার। দম বন্ধ করে হ্যাণ্ডেলটা চাপ দিল সে। খুলে হাঁ হয়ে গেল দরজা।

দুটো শেলফ ভর্তি শুধু টাকার বাণ্ডিল—পাঁচশো টাকার নোট সব থরে থরে সাজানো। সুটকেস খুলে টাকাগুলো সব সাজিয়ে ভরে ফেলল রানা। এত টাকা একসঙ্গে জীবনে কখনও দেখেনি সে আর। বিশ লক্ষ টাকা!

এবার উইলটা দরকার। ছোট একটা ড্রয়ার টান দিল রানা। ভাঁজ দেখেই

চিনতে পারল সে—এই কাগজটাই দেখেছিল সে হুলুগালের হাতে। কিন্তু ভাঁজ খুলে অবাক হয়ে গেল। নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ঠিকই, কিন্তু কিচ্ছু লেখা নেই ওর উপর। একেবারে সাদা। আরেকটা ড্রয়ার টান দিয়ে ঠিক একই রকম আরেকটা কাগজ পেল সে। হঠাৎ বুঝতে পারল রানা ব্যাপারটা। ইনভিজিবল ইঙ্ক দিয়ে লেখা হয়েছে উইল। ঠিকই বলেছিল রিটা—হুলুগালের কাছে উইলের এক কপি রেখেছিল কুমারস্বামী, দ্বিতীয় কপি ছিল ওর নিজের সিগারেট কেসের গোপন কুঠরিতে। এই দুটো একই জিনিস। দুটোই সুটকেসের ভিতরের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ডালা বন্ধ করে দিল রানা। চাবি লাগিয়ে কোটের পকেটে রেখে দিল সে চাবি দুটো। সেফটা বন্ধ করে দিল এবার। রুমাল দিয়ে মুছে ফেলল সে আঙুলের ছাপ। ঘড়িতে এখন বাজছে ছয়টা। যে-কোন মুহূর্তে রিটা তো এসে পড়তে পারেই, রেলওয়ে ট্রাকটা সময় মত ধরতে না পারলেও সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হবে ওর।

জানালার ধারে নিয়ে গেল রানা এবার সুটকেসটা, চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলে দিল সেটা নিচে। এবার দরজার বল্টু খুলে দিল রানা, কিন্তু ভিড়ানোই রইল সেটা। জানালার সঙ্গে হুকটা আটকে দড়ি বেয়ে নেমে এল সে নিচে। নিচে নেমে দড়িতে ঝাঁকি দিতেই খুলে এল হুক জানালা থেকে। ওটাকে পেঁচিয়ে কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে। ছুটল লাগেজ এণ্ট্রান্সের দিকে।

কাজ শেষ করে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল ড্রাইভার, এমনি সময় হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছল রানা।

'একটু দেরি হয়ে গেল,' বলল রানা।

রানার দিকে চেয়ে একটু দ্বিধা করল ড্রাইভার, কিন্তু রানার হাঁপানো দেখে দয়া হলো বোধহয়। হাসল সে।

'কোথায় পাঠাবেন?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'লেবেল আছে?'

একটা লেবেল বের করে দিল সে। রানা লিখল:

মাসুদ রানা
কেয়ার অভ, স্টেশন মাস্টার,
রেলওয়ে স্টেশন,
কলম্বো।

রিসিট লিখে দিল ড্রাইভার।

'আপনাকে দেরি করিয়ে দিলাম অনেক। কিছু মনে করবেন না।' ভাড়া হবে বড় জোর সাড়ে তিন টাকা, পঞ্চাশ টাকার একটা নোট দিল রানা ড্রাইভারের হাতে। 'ভাঙতিটা আপনার।'

প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার দশা হলো ড্রাইভারের। স্যালুট দিয়ে ফেলল একটা।

'আমি আজই এটা নিজের হাতে ট্রেনে তুলে দেব, স্যার। আজই পৌঁছে যাবে কলম্বো।'

চলে গেল ট্রাক। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা একটা। আশপাশে কোন লোকজন নেই। জুতোর ফিতে ঠিক করার ছলে জুতোর গোড়ালির একটা গোপন কুঠুরিতে রেখে দিল সে রসিদটা ভাঁজ করে। সপ্তাহখানেক আগে হঠাৎ বিপদে পড়ে আবিষ্কার করেছিল সে কুঠুরিটা। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা টিক পোলোঙ্গার (বিষাক্ত সিংহলী গোক্ষুর) মাথায় পা দিয়ে ফেলেছিল সবিতা, সাথে সাথে লেজ দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছিল সাপটা সবিতার পা। ওটাকে ছাড়াবার কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না, হঠাৎ প্রায় নিজের অজান্তে—যেন অনেকটা অভ্যাসবশে জুতোর গোড়ালির একটা বিশেষ জায়গায় চাপ দিয়ে বসল সে। ঝটাং করে খুলে গেল একটা ছোট্ট কুঠুরির মুখ। ছুরি রয়েছে তার মধ্যে একটা। অবাক হয়েছিল রানা, কিন্তু বুঝতে পারল নিজের অবচেতন মনে সে স্থির নিশ্চিত ছিল, আর কিছু নয়, ছুরিই পাওয়া যাবে ওখানে। প্রথমেই মাথাটা কেটে আলাদা করে ফেলেছিল রানা সাপটার, তারপর সহজেই ছাড়ানো গিয়েছিল বাকি দেহ। কিন্তু ছুরিটা আর যথাস্থানে রাখতে দেয়নি সবিতা, বলেছিল, 'ভয়ঙ্কর এই সাপের বিষ, ফেলে দাও ছুরিটা, রানা। বিষ লেগে গিয়েছে ওতে।'

হঠাৎ সচকিত হয়ে বাস্তবে ফিরে এল রানা। পালাতে হবে। রিটার হাত থেকে বাঁচতে হলে এক্ষুণি পালাতে হবে। টাকা এবং উইল এখন নিরাপদ, এবার নিজেকে নিরাপদ করতে হবে।

পিস্তলটা রয়ে গেছে ডেস্কের ড্রয়ারে। যে-কোন সময় প্রয়োজন পড়তে পারে ওটার। দ্রুতপায়ে এগোল রানা অফিসের দিকে। দুই মিনিটে পৌঁছে গেল সে অফিসের বন্ধ দরজার সামনে। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে এক পা এগিয়েই।

রিটা এবং নটরাজ বসে আছে ডেস্কের কাছে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে। নটরাজের হাতে ড্রয়ারের সেই পিস্তলটা। সোজা রানার বুকের দিকে লক্ষ্য করে ধরা।

আটাশ

'আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা,' বলল নটরাজ।

ফিরে আসার জন্যে নিজের মাথাটাই চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করল রানার। অনেক চেষ্টা করে মুখের চেহারাটা ঠিক রেখে এগোল সে ডেস্কের দিকে।

'ওখানে আর তোমাকে বসতে হবে না,' বলল রিটা। 'এখন থেকে আমার নতুন পার্টনার বসবে ওই চেয়ারে।' চাপা উষ্মা বেরিয়ে আসতে চাইছে রিটার মার্জিত কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে।

'তাই নাকি?' বলল রানা। 'তোমাদের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেছে তাহলে! কিন্তু এর মধ্যে আবার পিস্তল কেন?'

বসে পড়ল রানা একটা চেয়ারে। পকেট থেকে রুমাল বের করল।

সুটকেসের চাবি দুটোও বের করল সাথে। চাবি দুটো কৌশলে ছেড়ে দিল চেয়ারের উপরের ফোম রাবার কুশনের ফাঁক দিয়ে। তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছে চাইল রিটার দিকে। টগবগ করে ফুটছে রিটা, কিছুতেই সামলাতে পারছে না নিজেকে। টর্চ লাইটের মত জ্বলছে দুই চোখ।

'মাতাল একটা মেয়েলোকের কথা শুনেই এত উত্তেজিত হয়ে উঠলে তুমি, রিটা? সামান্য…'

'তুমি কি মনে করেছ সত্যিই আমি রত্নপুর গিয়েছিলাম? সমস্ত খোঁজ-খবর বের করে এনেছি আমি এইটুকু সময়ের মধ্যে। ফিয়াট গাড়িটার নম্বর লেখা ছিল গার্ডদের লগ-এ। সেই সূত্র ধরেই সব বেরিয়ে গেছে। সবিতার কপাল ভাল ৩২৫-এর বি, পর্তুগীজ এভিনিউ-এ পেলাম না ওকে। একটু চাপ দিতেই বৈদ্যনাথন স্বীকার করেছে সব কথা।'

'এসব ব্যাপারের মধ্যে নটরাজ কেন?' বলল রানা আর কোন কথা না পেয়ে। 'আমাদের প্রাইভেট কথার মধ্যে ওকে না রাখলেই কি ভাল হত না?'

বিস্তৃততর হলো নটরাজের নিঃশব্দ হাসি।'

'তোমার নিরাপত্তার জন্যেই আমার এখানে থাকা প্রয়োজন বলে বোধ করছি,' বলল সে। 'রিটার মেজাজের কোন নিশ্চয়তা নেই। ও তো গুলিই করতে চেয়েছিল তোমাকে ঘরে ঢোকা মাত্র। অনেক কষ্টে বুঝিয়েছি আমি। আমি না থাকলে হয়তো ছিঁড়েই কুটি কুটি করে ফেলবে তোমাকে।'

'তাহলে তো দেখছি তোমার থাকাই দরকার।'

ঝট করে বাঘ-মারা চাবুক বের করল রিটা।

'তুমি কি অস্বীকার করছ যে পর্তুগীজ এভিনিউ-এ তোমার কোনও বাড়ি নেই? সবিতা থাকে না সেখানে? আমি রত্নপুর গেলেই তুমি যাও না ওখানে? উইলের জোরে সবিতাকে সামনে ধরে সব ক'টা ক্যাসিনো দখল করবার ইচ্ছে নেই তোমার? সবিতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক নেই তোমার?' এগিয়ে এল রিটা দুই পা। দুই চোখে ওর টিক পোলোঙ্গার বিষ।

'একটি কথা ছাড়া আর কোন কিছুই অস্বীকার করছি না আমি,' বলল রানা। 'সম্পর্ক বলতে তুমি যা বোঝো সেইরকম কিছু গড়ে ওঠেনি আমাদের মধ্যে। এছাড়া আর সবই ঠিক বলেছ। স্বীকার করছি আমি। আরও একটা কথা বলছি তোমাকে, রিটা—আর এক পা-ও সামনে এগিয়ো না। এতদিন কিছুই বলিনি, কিন্তু আজকে একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমি একজন দুর্ধর্ষ ফাইটার। আর এক পা সামনে এগোলে পরে অনুতাপ করবে।'

'কি? এতবড় স্পর্ধা তোমার? আমারই ঘরে বসে আমাকে…'

'হয়েছে, হয়েছে। থামো এবার, রিটা।' একহাতে টেনে পিছিয়ে নিল রিটাকে নটরাজ। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে এই লোকটাকে নিয়ে বেশি ঘাঁটানো ঠিক হচ্ছে না। পিস্তল হাতে থাকলেও এই লোকটার সামনে বসে নিরাপদ বোধ করছে না সে। 'সময় নষ্ট না করে একেবারে শেষ দৃশ্যে চলে আসা যাক।'

'ঠিক আছে,' সামলে নিল রিটা। 'তোমাকে আমি অনেক আগেই সাবধান

করেছিলাম, রানা, অন্য কোন মেয়েলোক চাই না আমি আমাদের মধ্যে। নো আদার উওম্যান।'

'মনে আছে আমার সে কথা।'

'কাজেই এর পরিণামটাও স্বীকার করে নিতে হবে তোমাকে।' তিক্ত হাসি হাসল রিটা। 'ঠিক যে অবস্থায় গ্রহণ করেছিলাম, সেই অবস্থায় বিদায় করে দেব আমি তোমাকে। প্রাণভয়ে ভীত কপর্দকহীন একজন তৃতীয় শ্রেণীর ফাইটার। কেমন বুঝছ?'

এতক্ষণে রিটার প্ল্যানটা জানতে পেরে কিছুটা স্বস্তি বোধ করল রানা। বের করে দেবে—এর বেশি আর কিছু না। আয়রন সেফের দিকে চাইল রানা একবার। কেউ জানে না ওর ভিতরটা ফক্কা করে দিয়েছে সে।

'কিন্তু আমার টাকা? দশ লাখ দেয়ার কথা ছিল আমাকে—সে টাকা তাহলে দিয়ে দাও,' বলল রানা বোকার মত। নইলে সন্দেহ হতে পারে ওদের মনে। সেফটা খুলে দেখলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে রানার। এখন রাগারাগি করা দরকার।

'আরেকটা কথাও ছিল। সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন? আমি বলেছিলাম, আর কোন মেয়েলোক চাই না। নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মেরেছ তুমি, রানা। তোমার কথা তুমি রাখোনি, আমার কথা আমি রাখব না।'

ভুরু কুঁচকে চোখ গরম করে মুখ বিকৃত করে ফেলল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে এগোতে যাচ্ছিল সে রিটার দিকে, বাধা দিল নটরাজ।

'বসে থাকো! খবরদার!'

বসে পড়ল রানা।

'ঠিক আছে। দাও বের করে। কিন্তু মনে রেখো, আমার ভাগের টাকা আমি আদায় করে ছাড়ব। যে-কোন উপায়ে হোক, আদায় করে ছাড়ব আমি আমার টাকা।'

'যা খুশি তাই চেষ্টা করে দেখতে পারো তুমি। গার্ডদের বলে দিয়েছি আমি, কোন রকম মালপত্র ছাড়া পায়ে হেঁটে যদি বেরোতে চাও তাহলে বেরোতে দেবে, নইলে আটকাবে। কপর্দকশূন্য অবস্থায় বেরোতে হবে তোমাকে এখান থেকে। এবার পকেট থেকে যা আছে সব বের করে রাখো ডেস্কের ওপর।'

'এসো। বের করে নাও। আমি দেখতে চাই কার সাহস আছে আমার পকেটে হাত দেবার।'

উঠে দাঁড়াল নটরাজ হিক্কা। বলল, 'তোমাকে যা বলা হয়েছে চটপট তাই করে ফেলো মাসুদ রানা। নইলে পায়ে গুলি করব। হামাগুড়ি দিয়ে বেরোতে হবে এখান থেকে।'

'তোমাকেও দেখে নেব আমি, শয়তানের বাচ্চা!' বলেই পকেট থেকে কাগজপত্র, রুমাল, পেন, মানিব্যাগ, সবকিছু বের করে রাখল রানা ডেস্কের উপর। পকেট উল্টে দেখাল যে কিছুই নেই আর। মনে মনে ভাবল, ভাগ্যিস চাবি দুটো সরিয়ে ফেলেছিলাম আগেই।

'ঠিক আছে, রানা,' বলল রিটা। 'এবার যেতে পারো তুমি। সোজা জাহান্নামে

চলে যাও। যাবার আগে আরেকটা সুখবর শুনে যাও। তোমাকে যে অবস্থায় গ্রহণ করেছিলাম, ঠিক সেই অবস্থায় দূর করে দেব বলেছি। টেলিফোনে খবর দিয়ে দিয়েছি আমি। কাণ্ডির লোরী আর পেরেরা রওনা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। পৌঁছে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ছুটে আসছে ওরা। অ্যাণ্ড দে আর কামিং ফাস্ট। কাণ্ডির সেই ফাইটের ঠিক পরের অবস্থাটার কথা মনে পড়ছে না? যাও এবার। রওনা হয়ে যাও।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, ঠিক এমনি সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল জোসেফ। পিস্তল ধরা হাতটা পিছনে লুকাল নটরাজ।

'কি চাও তুমি? দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকতে পারো না?' তিরস্কার করল রিটা।

ভীত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাইল জোসেফ।

'মাফ করবেন। আমি মনে করেছিলাম মিস্টার হিক্কা একা আছেন।'

'না। তিনি একা নেই। এখন বলো কি চাও তুমি?'

প্রমাদ গুনল রানা। বুঝল, সেফটা রানা খুলতে পেরেছিল কিনা জিজ্ঞেস করতে এসেছে জোসেফ। এখন যদি আয়রন সেফের কথা জিজ্ঞেস করে বসে···

'এদের সঙ্গে কথা বলো, জোসেফ। আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ওই কুৎসিত মোটা লোকটা এখন থেকে তোমাদের ম্যানেজার।' জোসেফকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল রানা দরজার কাছে।

'দাঁড়াও!' ডাকল রিটা। কিন্তু দাঁড়াল না রানা। এক মিনিটের মধ্যে জানতে পারবে রিটা যে বোকা বানিয়েছে সে ওদের। কাজেই দ্রুত পালাতে হবে এখন।

তিনলাফে নেমে এল রানা নিচে। প্রায় দৌড়ে লবি পেরিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল বুইকের ড্রাইভিং সীটে। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা ক্যাসিনোর সামনে থেকে। গেটের কাছাকাছি এসেই স্পীড একটু কমাল রানা। গার্ড দু'জনকে স্পষ্ট দেখতে পেল রানা। দু'জনের হাতেই পিস্তল। অর্থাৎ টেলিফোনে খবর পেয়ে গেছে ওরা আগেই যে রানা আসছে, থামাতে হবে ওকে। কিন্তু থামবে না রানা কিছুতেই।

সীট থেকে নেমে আধশোয়া হয়ে গেল রানা। মাথাটা উঁচু করে রাখল শুধু।

আগেই লক্ষ্য করেছিল রানা প্রকাণ্ড লোহার গেট হলে কি হবে, দুটো দুর্বলতা আছে ওটার। বাইরের দিকে খোলে গেটটা, আর শুধু একটা বল্টু দিয়ে আটকানোর ব্যবস্থা। চলন্ত গাড়িকে আটকাতে পারবে না। গাড়ি থামাল না সে।

ডোবার ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে ছিটকে সরে গেল গার্ড দু'জন দুই দিকে। স্টিয়ারিংটা শক্ত করে চেপে ধরে মাথা নিচু করল রানা। স্টীলের বাম্পার প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল গেটের মাঝ বরাবর। দু'পাট হাঁ হয়ে খুলে গেল গেট। স্টিয়ারিংটা নড়ে যেতে চাইল, কিন্তু শক্ত হাতে চেপে রাখল রানা ওটাকে। মাথাটা একটু উপরে তুলে অ্যাক্সিলারেটার চাপল। একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল সে পিছনে। এখন আর ভয় নেই, বেরিয়ে এসেছে সে ক্যাসিনোর গেট দিয়ে। আশি মাইল স্পীড উঠে গেল গাড়িটার বড় রাস্তায় পৌঁছবার আগেই।

কলম্বো যেতে হবে ওকে। সোজা রাস্তায় যাবে, না রত্নপুর ঘুরে যাবে? রানা যে স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে, রিটা ছাড়া আর কেউ ওকে ধরতে পারবে না। রানার

গন্তব্যস্থল জানে রিটা। অতএব সোজা কলম্বোর পথে ছুটবে সে। কাজেই রত্নপুর ঘুরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ডানদিকে মোড় নিল রানা।

আশি মাইল স্পীডে ছুটল রানা রত্নপুরের রাস্তায়। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হেড লাইট জ্বেলে দিল সে। স্পীড কমিয়ে ষাটে নিয়ে এল। চিন্তা নেই, অন্তত আট মাইল এগিয়ে আছে সে রিটার থেকে।

তাহলে শেষ পর্যন্ত রিটার হাত থেকে নিস্তার পেল সে। হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। গুনগুন করে গান গাইতে ইচ্ছে করল ওর। উইল, টাকা আর নিজের জীবন—তিনটেই রক্ষা করেছে সে। আর চিন্তা নেই কোন। সবিতাকে নিয়ে আজই প্লেনে উঠবে সে।

মাইল তিরিশেক এসেই হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল রানার। এতক্ষণ লক্ষই করেনি সে পেট্রল ইণ্ডিকেটারটা। লজ্জাবতী নতুন বউয়ের মত নুয়ে পড়েছে ইণ্ডিকেটারের কাঁটা। আধ গ্যালন তেলও আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু স্পীড কমাল না রানা।

রানার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। তিন মাইলের মধ্যেই পেট্রল পাম্প পেয়ে গেল একটা। পকেটে পয়সা নেই। কিন্তু চিন্তা নেই তার জন্যে। গাড়ির ড্যাশ বোর্ডে পাঁচশো টাকার নোট লুকানো আছে একখানা।

অফিস ঘর থেকে বৃদ্ধ একজন লোক বেরিয়ে এল। ট্যাঙ্ক ফুল করবার হুকুম দিয়ে চলে এল সে কাঁচ দিয়ে ঘেরা ঘরটায়।

সবিতার বান্ধবীর টেলিফোন নম্বরটা জানা আছে রানার। চেষ্টা করে দেখবে নাকি লাইন পাওয়া যায় কিনা? আগে থেকে জানিয়ে রাখলে প্রস্তুত থাকবে সবিতা ওর জন্যে। রানা যদি সঙ্গে থাকে তাহলে গাছতলায়ও থাকতে রাজি আছে সে, বলেছিল সবিতা। ওকে আজ রাতের ঢাকা-গামী প্লেনের দুটো টিকেট কাটতে বলে দিলে কাজ এগিয়ে থাকবে কিছুটা। দরকার হলে কেএলএম-এর একটা প্লেন চার্টার করবে রানা।

একটা খোলা জানালার ধারে নড়বড়ে এক টেবিলের উপর টেলিফোন। রিসিভার তুলে নিল রানা কানে।

ভাগ্যটা সত্যিই সুপ্রসন্ন আজ। পাঁচ মিনিটেই কলম্বোর লাইন পাওয়া গেল।

'হ্যালো?' খুব সম্ভব সবিতার বান্ধবীর কণ্ঠ।

'আমি মাসুদ রানা বলছি। সবিতা আছে?'

'আছে, ডেকে দিচ্ছি।'

এক মিনিট অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করল সে। বেশ কয়েক মিনিট নষ্ট হয়ে গেল এখানে। তার চেয়ে রওনা হয়ে গেলেই বোধহয় ভাল হত। ছয় মিনিটে রিটার মত এক্সপার্ট ড্রাইভার আট মাইল রাস্তা চলে আসতে পারবে। হয়তো এসে পড়েছে—কে জানে!

'কি ব্যাপার রানা?' সবিতার সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এল।

'শোনো, সবিতা। এক মিনিটে তাক লাগিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। আমি দুই ঘন্টার মধ্যে কলম্বো আসছি। আজই চলে যাচ্ছি আমরা ঢাকায়।'

'তাই নাকি!' প্রায় চিৎকার করে উঠল সবিতা। 'এতদিনে আমাদের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে তাহলে? কিন্তু আজই কেন, রানা? আজ কি প্লেন আছে?'

'তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো। যদি থাকে ভাল, নইলে কেএলএম-এর একটা প্লেন চার্টার করব আমরা।'

'ওরেব্বাবা! অনেক টাকা লাগবে...'

'লাগুক। টাকার অভাব নেই আমাদের আর। আজই সিংহল ছাড়তে হবে আমাদের। তুমি যাচ্ছ তো আমার সাথে?'

'আজই? আচ্ছা, ঠিক আছে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আমি তৈরি। তুমি চলে এসো জলদি, আমি প্লেনের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে রাখছি।'

'কলম্বো পৌঁছেই প্রথমে আমাদের বিয়েটা সেরে নিতে হবে, সবিতা। তারপর ভেসে পড়ব আমরা...'

'কল্পনার উড়োজাহাজে।'

হেসে উঠল ওরা দু'জন। রিসিভার নামিয়ে রেখে পয়সা চুকিয়ে দেয়ার জন্যে এদিক-ওদিক চাইল রানা। বাইরে বুইকটার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ। কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ ওর মুখটা দেখে থমকে দাঁড়াল রানা। চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে সে রানার পিছন দিকে। থরথর করে কাঁপছে সর্বশরীর। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

খোলা জানালাটার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রিটা। মুখে বিষাক্ত এক টুকরো হাসি। হাতে পিস্তল।

'এই যে, রানা! কি খবর?'

রানা বুঝল, একটু নড়াচড়া করলেই গুলি করবে রিটা। রিটার চোখের দিকে চেয়েই হিম হয়ে গেল ওর বুকের ভিতরটা।

'গাড়িতে উঠে পড়ো। চলো কলম্বো থেকে বেড়িয়ে আসা যাক,' এগিয়ে এল রিটা।

রানা বুঝল, একটু ইতস্তত করলেও গুলি করবে রিটা। ধীর পায়ে এগিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সে। রিটা উঠল পিছনের সীটে। হতবুদ্ধি বৃদ্ধের সামনে পাঁচশো টাকার নোটটা ফেলে দিয়ে স্টার্ট দিল রানা গাড়িতে। রত্নপুরের দিকে চলতে আরম্ভ করল বুইক।

মাইল খানেক নিঃশব্দে চলে এল ওরা। তারপর জিজ্ঞেস করল রিটা। 'টাকাগুলো কোথায়?'

ড্রাইভিং মিররে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা রিটাকে। পিস্তলটা স্থির হাতে ধরা আছে রানার মাথার দিকে লক্ষ্য করে। ধক্ ধক্ জ্বলছে রিটার চোখ। হঠাৎ অশরীরী প্রেতাত্মা মনে হলো রানার রিটাকে।

'ও তুমি হাজার খুঁজলেও পাবে না,' বলল রানা।

'পাব। নটরাজকে পাঠিয়ে দিয়েছি কলম্বো, সোজাপথে। বাধ্য করবে ও তোমাকে টাকাগুলো বের করে দিতে। তারপর নিজ হাতে খুন করব আমি তোমাকে, রানা।'

চুপ করে রইল রানা। এসব কথার কোন উত্তর নেই।

'সবিতাকে বিয়ে করা বের করে দিচ্ছি। ওকেও ধরে নিয়ে আসা হবে। ওর ওপর টরচার না করলে তোমার পেট থেকে কথা বেরোবে না জলদি। কি করে ব্যথা দিতে হয় জানা আছে আমার। ওকেও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হবে না। সম্পত্তির লোভ চিরতরে ঘুচিয়ে দেয়া হবে।'

অর্থাৎ টেলিফোনের আলাপটা শুনেছে রিটা। সবিতা যে কলম্বো রেলওয়ে স্টেশনে রানার জন্যে অপেক্ষা করবে সেটা রিটা ছাড়া আর কেউ জানে না। কাজেই বেশি চিন্তা করবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। এখন কাজটা খুবই সহজ। সবিতাকে কিছুতেই নটরাজ বা রিটার হাতে পড়তে দেয়া চলবে না। একমাত্র রানাই ঠেকাতে পারে সবিতার উপর এদের নির্যাতন। নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও ঠেকাবে রানা।

রাস্তাটা সোজা। দুইধারে ছায়া দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি বিশাল আকারের শিরীষ গাছ। স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। মনে মনে বলল, 'পারলাম না আমি, সবিতা। তোমাকে সুখী করতে পারলাম না। ক্ষমা কোরো আমাকে। এছাড়া আর কোন পথ এখন খোলা নেই।'

সাঁ করে ঘুরিয়ে দিল রানা স্টিয়ারিং। ডান পায়ে টিপে ধরল অ্যাক্সিলারেটার মেঝের সঙ্গে। উড়ে চলেছে যেন গাড়িটা একটা শিরীষ গাছের দিকে। ড্রাইভিং মিররের দিকে চেয়ে রইল রানা স্থির দৃষ্টিতে। ঠোঁটে এক টুকরো দুর্বোধ্য হাসি।

স্পষ্ট দেখতে পেল রানা রিটার মুখ। ভয়ে বিকৃত হয়ে গেছে রিটার চেহারা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল সে। পিস্তল পড়ে গেল হাত থেকে। দুই হাতে মুখ ঢাকল রিটা।

প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা খেল গাড়িটা গাছের সঙ্গে। পিছিয়ে এল বেশ খানিকটা। আরেকটা গাছের সাথে ধাক্কা লাগল পিছন দিকে। ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছে এখন রাস্তার পাশের বারো ফুট নিচু ডিচের মধ্যে। প্রবল একটা ঝাঁকি লাগল। মাথাটা প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেল ছাতের সঙ্গে। অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু।

ঊনত্রিশ

ভুলে যাওয়া বাহান্ন দিনের প্রতিটি ঘটনা ছায়াছবির মত দেখতে পেল রানা মনের পর্দায়। পরিষ্কার মনে পড়ল সবকিছু। হঠাৎ ঠাস করে গালে একটা চড় পড়তেই বর্তমানে ফিরে এল সে।

চোখ মেলতে লোরীর চোখে চোখ পড়ল রানার। জামার কলার ধরে আছে লোরী। ঠাস করে আরেকটা চড় মেরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল সে রানাকে বিছানার উপর।

নটরাজের গলার আওয়াজ শুনতে পেল রানা এবার।

'এত জোরে মারিস না, গর্দভ কোথাকার! কথা বলাতে হবে ওকে দিয়ে।'

'আরে, চিন্তা করবেন না। পড়পড়িয়ে সব কথা বলবে শালা। ফেরেববাজি রেখে চোখ মেলো চাঁদ, নইলে কান দুটো টেনে ছিঁড়ে ফেলব এবার।'

চোখ মেলে চাইল রানা চারপাশে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে সে ওর নিজেরই পর্তুগীজ এভিনিউ-এর বাড়িতে একটা খাটের উপর। লোরী বসে আছে খাটের এক ধারে। আর খাটের পায়ের কাছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নটরাজ হিক্কা আর পেরেরা। অবাক হলো রানা। লোরী আর পেরেরার সঙ্গে নটরাজ কেন? এদের সঙ্গে নটরাজের মৈত্রী হলো কি করে?

হঠাৎ সবিতার কথা মনে পড়ল রানার। ওকে তো দেখা যাচ্ছে না! গেল কোথায় সবিতা? রানার মনে পড়ছে কলিং বেল টিপেছিল সে এই বাড়িতে এসে। দরজা খুলেছিল সবিতা, তারপর ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছিল ওর মুখের চেহারা। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল ওর মুখ থেকে। খুব সম্ভব পিছন দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখেছিল সে লোরী ও পেরেরাকে।

'সবিতাকে কোথায় রেখেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা ভাঙা কর্কশ কণ্ঠে।

'আছে, আছে। পাশের ঘরেই আছে,' বলল নটরাজ। 'যা তো পেরেরা, নিয়ে আয় ছুঁড়িটাকে! তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে আমাদের।'

চলে গেল পেরেরা পাশের ঘরে। রানার দিকে চেয়ে ভয়ঙ্কর বাঁকা হাসি হাসছে লোরী। বিশ্রী দেখাচ্ছে ওর বাম গালের কাটা চিহ্ন। রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা আবার এর সঙ্গে জুটলে কি করে?'

'জুটবে না?' কথা বলে উঠল নটরাজ, 'প্রাণে যে বেঁচে আছে, এই তো বেশি। ঢাকা থেকে দিন সাতেক আগে চার-পাঁচজন ছোকরা এসে রঘুনাথ জয়ামান্নেকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চলে গেছে। পাঁচতলা নাথ লাগজারি হোটেল এখন ধ্বংসস্তূপ। এরা দু'জন টের পেয়ে আগেভাগেই কেটে পড়েছিল। আমার লোক দরকার ছিল না, কিন্তু এমন হারামি লোক একবার হাতছাড়া করলে আর পাওয়া যাবে না, তাই রেখে দিয়েছি। এরা এখন আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

রানার গালে হালকা করে দুটো টোকা দিল লোরী। 'অনেক বিল পাওনা হয়ে গেছে তোমার, চাঁদ, আজ সব শোধ করে দেব। তোমার সাঙ্গপাঙ্গগুলো বেশি চালু, সুবিধা করতে পারিনি ওদের সঙ্গে, কিন্তু তুমি যাবে কোথায়? সব শোধ করে নেব তোমার ওপর দিয়ে।'

টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল পেরেরা সবিতাকে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। ব্লাউজ ছিঁড়ে গেছে খানিকটা। ভীত দৃষ্টিতে চাইল সে নটরাজের দিকে, তারপর চোখ পড়ল ওর রানার উপর।

'রানা! এরা মারছে কেন আমাকে? কি করেছি আমি?'

'মেরেছে ওরা তোমাকে?' বাঁধন খুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা।

'কিছুই তো করা হয়নি এখনও,' বলল নটরাজ। 'এখন করা হবে। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে তোমার চোখের সামনে নির্যাতন করা হবে তোমার প্রিয়তমাকে।'

'ছেড়ে দাও ওকে,' বলল রানা মরিয়া হয়ে গিয়ে। 'যা জিজ্ঞেস করবে উত্তর

দেব আমি। ওর কোন দোষ নেই। ওকে যদি ছেড়ে দাও সব কথা স্বীকার করব আমি।'

'ওকে ছেড়ে না দিলেও কথা বলতে হবে তোমাকে, মাসুদ রানা। কাজেই তোমার প্রস্তাবে রাজি নই আমি,' বলল নটরাজ। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। 'তাছাড়া অনেক জেনে ফেলেছে ও। ওকে ছেড়ে দিলে বিপদে পড়তে পারি আমরা।'

'শোনো, নটরাজ। তুমি আমাকে চেনো না। আমার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই তোমার। যারা অনায়াসে রঘুনাথের মত একজন দুর্ধর্ষ লোককে তারই এলাকায় এসে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে, আমি তাদেরই একজন। স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছে আমাদের। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে একটা কথাও বের করতে পারবে না তুমি আমার মুখ থেকে। টাকাগুলোর জন্যেই তো এতসব করছ? যদি ওকে ছেড়ে না দাও তাহলে যেখানকার টাকা সেখানেই থাকবে, একটা পয়সাও পাবে না তুমি।' কথাগুলো বলল রানা এক নিঃশ্বাসে।

'নিজের ওপর আস্থা থাকা ভাল। কিন্তু এতটা ভাল না। তোমাকে কিভাবে কথা বলাতে হবে তা জানা আছে আমার,' বলল নটরাজ একবিন্দু বিচলিত না হয়ে।

'সবিতাকে ছেড়ে দাও, নইলে টাকাগুলো ফস্কে যাবে তোমার হাত থেকে।'

'বুঝতে পারছি, খুবই ভালবাস তুমি সবিতাকে। কিন্তু আমি দুঃখিত। ওকে এখন ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয়। ওকেও মরতে হবে তোমারই মত।'

রানা বুঝল ঠাট্টা করছে না নটরাজ, যা বলছে তাই করবে সে। নড়চড় হবে না ওর কথায়। মরতে হবে সবিতাকেও। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখল একবার।

'সবিতা যদি কথা দেয় যে কাউকে কিছু বলবে না, তাও ছাড়া যাবে না ওকে?'

'না,' মাথা নাড়ল নটরাজ। 'এবার চিন্তা করে দেখো, কোন্‌টা তোমার পছন্দ···সবিতার কপাল বরাবর একটা বুলেট, না লোরীর হাতের নির্যাতন? তোমার চোখের সামনে নির্যাতন করবে ওকে লোরী। এই লাঞ্ছনার হাত থেকে ইচ্ছে করলেই তুমি রক্ষা করতে পারো ওকে। কি বলো? বুলেট, না লোরী?'

একটানে সবিতার জামার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে ফেলল লোরী। 'উহ্!' বলে তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরোল সবিতার মুখ থেকে। পাগলের মত টানাটানি করল রানা হাত-পায়ের বাঁধন খুলবার চেষ্টায়। আরও চেপে বসে গেল রশিটা।

বুঝল রানা, হার হয়ে গেছে ওর। বুলেটে মৃত্যুই অনেক সুখের হবে সবিতার পক্ষে। সবিতার মুখের দিকে না চেয়ে বলল রানা, 'ওকে স্পর্শ করতে নিষেধ করো ওই জানোয়ারটাকে। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি আছি আমি।'

হাঁটুর উপর তবলা বাজাল নটরাজ।

'আমি জানতাম, বলতেই হবে তোমাকে। টাকাগুলো কোথায়?'

'ব্যাঙ্ক অব সিলোনের সেফ ডিপোজিটে।'

একটু যেন থমকে গেল নটরাজ, পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে।

'তাই নাকি! মাথা খাটিয়ে জায়গাটা ভালই বের করেছ তো?'

রানার মনে পড়ল সুটকেসের মধ্যে রাখা পয়েন্ট টু-টু পিস্তলটার কথা। হঠাৎ আশার আলো দেখতে পেল সে। পিস্তলটা কাজে লাগাতে পারলে লোরী, পেরেরাকেও ঘায়েল করা যাবে হয়তো।

'তা বেশ, একটা চিঠি লিখে দাও...' রানাকে মাথা নাড়াতে দেখে মাঝ পথেই থেমে গেল নটরাজ।

'চিঠি-ফিঠিতে কাজ হবে না, নটরাজ। আমি ছাড়া আর কেউ টাকা আনতে পারবে না। আমার নির্দেশ দেয়া আছে ওদেরকে, আমি ছাড়া আর কেউ ঢুকতেই পারবে না স্ট্রংরুমে, চাবিও পাবে না।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করল নটরাজ মাথা নিচু করে। তারপর পেরেরাকে ইশারা করল সবিতাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। পিছন থেকে ঠেলা দিতে দিতে নিয়ে গেল পেরেরা সবিতাকে পাশের ঘরের দরজার সামনে। তারপর জোরে এক লাথি লাগাল ওর পিছন দিকে। দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

'মাগো...'

দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করল রানা।

'তৈরি থেকো, পেরেরা। প্রতিশোধ নেব আমি।'

'দোষ তোমার,' বলল নটরাজ মৃদু হেসে। 'ওর মত একটা হারামি জানোয়ারের কাছে আর কি ব্যবহার আশা করো তুমি?' মুখ ভেংচি কেটে হাসল পেরেরা এই কথায়। 'যাক, তুমি আর আমি যাচ্ছি টাকাগুলো আনতে। কাজটা হয়ে গেলেই আমি কথা দিচ্ছি, খুব দ্রুত মুক্তি দেয়া হবে তোমাদের দু'জনকে এই পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে। স্বর্গে গিয়ে অনেক টাইম পাবে, মিস্টার, চুটিয়ে প্রেম কোরো।' কান চুলকাল নটরাজ। 'সত্যি, টাকাগুলো হাতে পেয়ে গেলেই তোমার বিরুদ্ধে আমার আর কোন বিদ্বেষ থাকবে না। বরং রিটাকে খতম করে দেয়ায় কৃতজ্ঞ আছি আমি তোমার কাছে। ক্যাসিনোটা এখন আমার। সেনানায়েক এখন আমার বাঁদর।'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা নটরাজের চোখের দিকে।

'আরেকটা কথা। ব্যাঙ্কে গিয়ে কোনরকম গোলমালের চেষ্টা করে লাভ হবে না। টাকাগুলো গোল্ডেন ক্যাসিনোর। তার প্রমাণও আছে আমার কাছে। ইন্সপেক্টরও সাক্ষ্য দেবে আমার হয়ে। কাজেই গোলমাল করলে লাভ হবে না তোমার—মাঝখান থেকে সবিতাকে অসহ্য নির্যাতন করে মারা হবে, খুনের দায়ে তোমাকে পাঠানো হবে ইলেকট্রিক চেয়ারে। বোঝা গেছে ব্যাপারটা?'

উঠে দাঁড়াল হিক্কা। লোরী এবং পেরেরাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় কি যেন বলল। শেষেরটুকু কেবল একটু জোরে বলল যাতে রানাও শুনতে পায়।

'আমি যদি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না আসি তাহলে সবিতাকে সরিয়ে ফেলবি এখান থেকে। তারপর কি করতে হবে তা তো জানাই আছে তোদের।' রানার দিকে ফিরে বলল, 'কাজেই কোনও কৌশল করে লাভ হবে না।'

রানার হাত-পায়ের দড়ি খুলে দেয়া হলো। আগে আগে বেরিয়ে এল রানা,

পিছন পিছন নটরাজ। সোজা রানার ওপেলের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।'

'তুমিই চালাও, আমি রিটার মত পিছনে বসছি। বিশ মাইলের বেশি স্পীড তুললেই গুলি করব।'

জবাব দিল না রানা। ভিতর ভিতর প্ল্যান করছে সে। নিরাপদেই এসে পৌঁছল ওরা ব্যাঙ্ক অব সিলোনের সামনে। গার্ড এগিয়ে এল একজন।

'আমি একটা সুটকেস রেখে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে। ওটা নিতে এসেছি,' বলল রানা।

'সোজা চলে যান, স্যার। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সীটেই আছেন।'

রানার পিছন পিছন চলে এল নটরাজ ব্যাঙ্কের ভিতর। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার একটু অবাক হলো রানাকে আবার ফিরে আসতে দেখে, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাতে বিলম্ব করল না।

'আমার পার্টনার হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন। দু'দিনের জন্যে সুটকেসটা একটু দরকার।'

'নিশ্চয়ই, স্যার। আমি আসব আপনার সঙ্গে?'

'তার দরকার হবে না। রাস্তা তো চিনিই আমি।'

'ঠিক আছে। আমি তাহলে রসিদটা তৈরি করে রাখছি, একটা সই লাগবে আপনার।'

'আমি আসছি এখুনি।'

তেতলায় উঠে এল ওরা লিফটে করে। সর্বক্ষণ রানার গায়ের সাথে সেঁটে আছে নটরাজ, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে রানার ঘাড়ের পিছনে। করিডর ধরে কিছুদূর এসে কোলাপসিবল গেটের সামনে দাঁড়াল ওরা। গার্ড এসে দাঁড়াল।

'ছাব্বিশ নম্বর ঘরের চাবিটা দাও,' বলল রানা।

রানাকে ভাল করে দেখে নিয়ে চলে গেল গার্ডটা। আধ মিনিট পর চাবি এনে দিল রানার হাতে।

ছাব্বিশ নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

'তোমার সাহায্য ছাড়া টাকাগুলো বের করা প্রায় অসম্ভব ছিল দেখতে পাচ্ছি। ভাল নিরাপদ জায়গা বেছে বের করেছিলে কিন্তু!'

দরজা খুলে ভিতরে চলে এল রানা।

'বাহ্। চেয়ার-টেবিলও আছে দেখছি,' বাইরে দাঁড়িয়ে বলল নটরাজ। 'আমি বাইরে দাঁড়াই, টাকাগুলো নিয়ে চলে এসো তুমি।'

কিন্তু ওকে ঘরের ভিতর আনা দরকার।

'দরজাটা বন্ধ না করলে সেফ খুলবে না,' বলল রানা। 'ইচ্ছে করলে বাইরে থাকতে পারো, আমি দরজা লাগিয়ে দিচ্ছি।'

জনশূন্য করিডরের এদিক-ওদিক চাইল একবার নটরাজ। তারপর পিস্তলটা বের করে হাতে নিল।

'তাহলে বরং ভেতরেই আসি। তোমাকে চোখের আড়াল করা ঠিক হবে না। বাঘের চেয়েও বেশি ভয় পাই আমি তোমাকে। কিন্তু সাবধান, রানা, একটু এদিক-

ওদিক দেখলেই গুলি করব।'

মনে মনে হাসল রানা। এদিক-ওদিক কোনদিক বুঝবার আগেই খতম হয়ে যাবে তুমি, নটরাজ। বন্ধ ঘরের মধ্যে টু-টু-র আওয়াজ হলে শোনা যাবে না বাইরে থেকে। খুন করতে দ্বিধা নেই রানার। এই বিষাক্ত সাপের চেয়ে ওদের দু'জনের জীবনের দাম ওর কাছে অনেক বেশি। সবিতাকে রক্ষা করতে হবে লোরী আর পেরেরার হাত থেকে।

সেফের সামনে দাঁড়িয়ে নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্করপিয়ন বানান করে চলল রানা। ঝটাং করে খুলে গেল দরজাটা।

'পেছনে সরে থাকো,' বলল রানা। 'সেফ খোলা অবস্থায় চালু থাকে একটা অটোমেটিক ক্যামেরা।'

'সব দিক ভেবে তৈরি করেছে শালারা এই ভল্ট,' বলল নটরাজ। কিছুমাত্র সন্দেহ করেনি সে। 'টাকাগুলো আছে তো?'

'থাকবে না কেন?' টান দিয়ে সুটকেসটা বের করে টেবিলের উপর রাখল রানা। এদিকে এসে রানার পাশে দাঁড়াবার জায়গা নেই, তাই রানার সামনেই দাঁড়িয়ে রইল নটরাজ পিস্তল হাতে। সুটকেসের ডালাটা খুলে ফেলল রানা। ডালার ওপাশ থেকে ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে না নটরাজ। কয়েক বাণ্ডিল নোট ছড়িয়ে দিল রানা টেবিলের উপর সামনের দিকে নটরাজকে ঝুঁকে আসতে দেখে। নোটগুলোর উপর চোখ পড়তেই সুটকেসের ভিতরে কি আছে দেখবার আগ্রহ কমে গেল ওর। টেবিলের দিকে চেয়েই নিঃশব্দ হাসিটা দেখা দিল ওর লালচে পুরু ঠোঁটে। পয়েন্ট টু-টু পিস্তলটা তুলে নিল রানা।

ডালার এপাশ থেকেই হৃৎপিণ্ড সই করে ট্রিগার টিপল রানা।

টাশশ্ করে শুকনো ডাল ভাঙল যেন একটা। এক পা পিছিয়ে গেল নটরাজ, ব্যথায় কুঁচকে গিয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে ওর মুখ, দুই হাতে বুক চেপে ধরেছে সে। এইবার সামনে ঝুঁকে পড়ে যাচ্ছে। পিস্তলটা পড়ে গেল ওর হাত থেকে। হুড়মুড় করে টেবিলের উপর পড়ল ওর মোটা দেহটা, মাথাটা পড়ল বাক্সের ডালার উপর।

এক ধাক্কায় মাথাটা সরিয়ে দিল রানা। ধড়াস করে মাটিতে পড়ল নটরাজের ভারি থলথলে দেহ। ছটফট করছে সে, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দুই হাতে বুক চেপে ধরেছে সে। রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে আঙুলগুলো।

পিস্তলটা তুলে নিল রানা মাটি থেকে। সেফটি ক্যাচটা অন করে দিয়ে ব্যারেল ধরে ঝুঁকে পড়ল নটরাজের মাথার কাছে। দুই সেকেণ্ড চেয়ে রইল ওরা দু'জন দু'জনের দিকে। মুখ থেকে ফেনা বেরিয়ে এসেছে নটরাজের। কপালের ঠিক মাঝখানটা তাক করে প্রচণ্ড জোরে মারল রানা পিস্তলের বাঁট দিয়ে। চামড়া কেটে গেল খানিকটা, কপালের অল্প একটু জায়গা বসে গেল নিচের দিকে।

গড়াগড়ি বন্ধ হয়ে গেল নটরাজের। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর শরীর। ক্ষীণভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কেবল। যথেষ্ট হয়েছে। পিস্তলটা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে রেখে দিল রানা নটরাজের মাথার কাছে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল সুটকেসের দিকে।

পয়েন্ট টু-টু পিস্তলটা পকেটে ফেলল রানা। নোটের বাণ্ডিল ক'টা আবার সুটকেসে ভরে ডালা বন্ধ করে তালা টিপে দিল। তারপর বেরিয়ে এল দরজা খুলে। করিডর জনশূন্য। চাবি লাগিয়ে দিয়ে পকেটে ফেলল রানা চাবিটা। এবার দ্রুতপায়ে চলে এল সে কোলাপসিবল গেটের কাছে গার্ডরুমের ধারে।

'আমি যাচ্ছি, আমার পার্টনার কয়েকটা দলিলপত্রের ওপর চোখ বুলাচ্ছেন, থাকবেন আরও কিছুক্ষণ। কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'চাবিটা ওঁর কাছেই। যাবার সময় দিয়ে যাবেন। কতক্ষণ পর্যন্ত খোলা থাকবে?'

'পাঁচটা পর্যন্ত?

অর্থাৎ আরও ঘন্টাখানেক কেউ টের পাবে না নটরাজের মৃত্যুর কথা। এরই মধ্যে সবিতাকে উদ্ধার করে নিয়ে পালাতে হবে এখান থেকে।

'আমিও তাই বলেছি ওঁকে। পাঁচটার আগেই চলে যাবেন উনি।'

নিচে নেমে এল রানা। কাগজপত্র তৈরি করে অপেক্ষা করছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

'আমার পার্টনার কিছু কাগজপত্র দেখছেন ওপরে। গার্ডদের বলে এসেছি। পাঁচটার আগেই দেখা হয়ে যাবে ওঁর।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'সুটকেসটা নিয়ে যাচ্ছি আমি। দিন, কি কি সই করতে হবে সই করে দিই।'

টিক চিহ্ন দেয়া জায়গাগুলোতে সই করে বেরিয়ে এল রানা। গাড়ির পিছনের সীটে সুটকেসটা রেখে চেপে বসল ড্রাইভিং সীটে।

দ্রুত চলল রানা পর্তুগীজ এভিনিউ-এর দিকে।

হঠাৎ করে লক্ষ করল রানা, শহরটা ওর চেনা। সমস্ত রাস্তাঘাট ওর নখদর্পণে।

সাগরের তীর ধরে যেতে যেতে মনে পড়ল ঠিক কোন্ জায়গায় মুক্তাঝিনুক তুলতে গিয়ে হাঙ্গরের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিল সে সবিতাকে। লোরী আর পেরেরার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে কি?

ত্রিশ

পিছন দিক দিয়ে বুক সমান দেয়াল টপকে ঢুকল রানা বাড়িটায়। আশপাশের সবক'টা বাড়িই জনশূন্য। কাজেই কারও চোখে পড়বার ভয় নেই। কয়েকটা সজনে আর আমগাছের আড়ালে আড়ালে চলে এল সে বাড়ির পিছনে রান্নাঘরের দশহাতের মধ্যে। দরজাটায় বাইরে থেকে শিকল তোলা। ভিতর থেকে বন্ধ না থাকলেই হয়।

তিনলাফে ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে সেঁটে গেল রানা দেয়ালের গায়ে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কোন সাড়াশব্দ নেই। চট করে রিস্টওয়াচের দিকে চাইল

রানা। একঘন্টা প্রায় হয়ে এসেছে। সবিতাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেল নাকি ওরা?

শান বাঁধানো সিঁড়ির চারটে ধাপ উঠে নিঃশব্দে শিকল খুলে ফেলল রানা। আস্তে ঠেলা দিতেই ক্যাঁচ করে শব্দ তুলে খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল দরজা। ভিতরটা অন্ধকার। রান্নাঘরের এই দরজা ব্যবহার করেনি ওরা কোনদিন। পিস্তল হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে আরও খানিকটা ফাঁক করল সে কপাট দুটো। বাইরের আলোয় দেখা গেল। ওপাশের দরজাটাও খোলা। পা টিপে টিপে চলে এল রানা রান্নাঘরের মধ্যে। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, ছোট্ট একটা করিডরের ওপাশে ডাইনিংরুমের দরজাও খোলা। কেউ নেই আশপাশে। পা টিপে চলে এল রানা ডাইনিংরুমে। নিস্তব্ধ চারদিক। চলে গেল নাকি ওরা সবিতাকে নিয়ে? অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল রানার বুক।

পাশের ঘরটাতেই লাথি মেরে আছড়ে ফেলেছিল পেরেরা সবিতাকে। দরজাটা ভিড়ানো। মিটসেফের উপরে রাখা দুটো কাঁচের প্লেট নিয়ে দরজার পাশে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল রানা। তারপর ছুঁড়ে দিল প্লেট ঘরের মাঝ বরাবর।

ঝন ঝন করে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল প্লেট দুটো। এত জোরে শব্দ হলো যে মরা মানুষও জেগে যাবে। দম বন্ধ করে দেয়ালের গায়ে সেঁটে থাকল রানা। ওরা ভাববে, নিশ্চয়ই বিড়ালের কাজ। কিন্তু তবু একবার আসতে হবে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে।

এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট। কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই। দরজার উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অপেক্ষা করল রানা। কেউ এল না।

আস্তে টান দিল রানা কড়া ধরে। এই দরজাটাও খোলা। আধ ইঞ্চি ফাঁক করে চোখ রাখল সে দরজার ফাঁকে। কেউ নেই পাশের ঘরে। ওপাশের দরজা খোলা। দ্রুত অথচ নিঃশব্দে এগিয়ে গেল রানা।

সবশেষের ঘরেও কেউ নেই। চলে গেছে ওরা! বাইরে বেরোবার দরজাটাও দু'পাট খোলা।

বেরিয়ে আসছিল রানা, হঠাৎ চোখ পড়ল ওর অ্যাটাচড্ বাথরুমের খোলা দরজার দিকে। বাথরুমের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে সবিতা রানার দিকে পাশ ফিরে।

'সবিতা! ওরা কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করল সে উত্তেজিত কণ্ঠে।

কোন উত্তর নেই।

'সবিতা, কি হয়েছে, জবাব দিচ্ছ না কেন? কোথায় গেল ওরা?'

ধীরে ধীরে ফিরল সবিতা রানার দিকে।

বাথরুমের আবছা অন্ধকারে ভাল করে কিছুই দেখতে পেল না রানা চোখ দুটো ছাড়া। চমকে উঠল রানা। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথাটা। ছুটে চলে এল বাথরুমের দরজার কাছে। সুইচ টিপতেই জ্বলে উঠল বাতি।

দাঁড়িয়ে নেই সবিতা, ঝুলে আছে। বাতাসে দুলছে অল্প অল্প। সরু একটা নাইলন কর্ডের ফাঁস চেপে বসে আছে গলায়, দড়ির অপর প্রান্ত শাওয়ারের পাইপের সঙ্গে বাঁধা।

বীভৎস দৃশ্য। জিভটা বেরিয়ে আছে লম্বা হয়ে, মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে সবিতা। রানা আর নটরাজ বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করেছে ওরা ওকে। কেবল ঝুলিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, নিশ্চিত হবার জন্যে হৃৎপিণ্ড বরাবর দুটো গুলিও করেছে। লাল হয়ে আছে ছেঁড়া ব্লাউজের খানিকটা অংশ।

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা পাঁচ সেকেণ্ড। তারপর ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল সবিতার মৃতদেহ। দেহটা খানিক উঁচু করে একহাতে টেনে ফাঁসটা খুলে ফেলল রানা সবিতার গলা থেকে। পাঁজাকোলা করে নিয়ে এল ওকে বিছানার ধারে। পালস পরীক্ষা না করেই বুঝতে পারল রানা—মারা গেছে সবিতা। ধীরে, যত্নের সঙ্গে শুইয়ে দিল সে মৃতদেহ বিছানার উপর।

হু-হু করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। কেন এমন হয়? তুমুল ঝড় বইছে যেন ওর রক্তের মধ্যে। ঝাপসা হয়ে আসতে চাইছে দৃষ্টি। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করল রানা। ভেঙে পড়লে চলবে না। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে হবে!

হঠাৎ কান খাড়া হয়ে গেল রানার। পুলিসের গাড়ি না? ক্রমেই এগিয়ে আসছে সাইরেনের শব্দ।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখল রানা তিন-চারটে জীপ ভর্তি পুলিস এগিয়ে আসছে এই বাড়ির দিকে। প্রথম গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসে আছে ইন্সপেক্টর বিজয়তুঙ্গ সেনানায়েক।

পালিয়ে যাবার তাড়া অনুভব করল না রানা। সবিতাকে এইভাবে ফেলে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না ওর। কিন্তু সাথে সাথেই বুঝতে পারল, তাহলে সবিতার হত্যার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পাবে না সে আর। কুমারস্বামী, হুলুগাল, রিটা, নটরাজ, সবিতা—সবাইকে হত্যার অভিযোগ আনবে ইন্সপেক্টর ওর বিরুদ্ধে। হত্যার দায়েই যদি ধরা পড়তে হয় তাহলে আরও দুটো খুন বাকি রাখে কেন সে? প্রতিশোধ না নিতে পারলে মরেও শান্তি পাবে না যে।

গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে জীপগুলো। নেমে আসছে সেনানায়েক গাড়ি থেকে। সিপাইগুলোও নামছে রাস্তার উপর লাফিয়ে। আলনা থেকে সবিতার সাদা একটা শাড়ি এনে ঢেকে দিল রানা ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ইন্সপেক্টরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে সে পরিষ্কার। কয়েকটা ভারি পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

পাশের ঘরে চলে এল রানা। সেনানায়েক এসে পড়েছে বাইরে দরজার কাছে। ডাইনিংরুমের মধ্যে দিয়ে রান্নাঘরে চলে এল রানা, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। দরজার শিকল তুলে দিয়ে কয়েক লাফে পৌঁছে গেল সে সজনে গাছের আড়ালে। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে দেয়াল টপকে বেরিয়ে এল বাইরে। ডান দিকে এগোল সে দ্রুতপায়ে।

এত সহজে পেয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি রানা। বাড়িটার বামধারে গলির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল সে গাড়িটা ঝোপের আড়ালে। পিছনের দেয়াল ছাড়িয়ে মোড় ঘুরতেই দেখতে পেল জানালার কাঁচ ভেঙে গাড়ি থেকে টাকা ভর্তি

সুটকেসটা বের করার চেষ্টা করছে লোরী আর পেরেরা। নিজেদের কাজে এতই ব্যস্ত যে রানা দশ গজের মধ্যে চলে আসার আগে টের পেল না কেউ।

প্রথম টের পেল লোরী। ঝট করে ঘুরেই পিস্তল বের করল সে। কপাল সই করে টিপে দিল রানা ট্রিগার। স্থির হয়ে গেল লোরী, দুই সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল স্ট্যাচুর মত। তারপর দড়াম করে পড়ল মুখ থুবড়ে।

গুলির শব্দে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল পেরেরা। রানাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল। রক্তশূন্য হয়ে গেল মুখটা। দুই চোখে ফুটে উঠল ভীতির চিহ্ন। হঠাৎ প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠে দৌড় দিল সে।

টাশশ্! টাশশ্!

হুড়মুড় করে পড়ে গেল পেরেরা হুমড়ি খেয়ে। মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে।

এগিয়ে এল রানা। পা দিয়ে উল্টে দেখল মারা গেছে লোরী। ডাঙায় তোলা মাছের মত ছটফট করছে আর লাফাচ্ছে পেরেরা। লাংস ফুটো হয়ে গেছে খুব সম্ভব···মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। কাছে এসে দাঁড়াল রানা।

এমনি সময়ে হৈ-হৈ শব্দে মুখ তুলে দেখল সে সাত-আটজন সিপাই লনের উপর দিয়ে দৌড়ে আসছে ওর দিকে। গুলির শব্দ শুনে বেরিয়ে এসেছে ইন্সপেক্টরও। চিৎকার করে সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে সে রানাকে ধরবার জন্যে। হাতে রিভলভার।

কোনদিকে দৃকপাত না করে এক এক করে পিস্তলের বাকি তিনটে গুলি নিঃশেষ করল রানা পেরেরার উপর। স্থির হয়ে গেল দেহটা। ফেলে দিল রানা পিস্তল—প্রতিশোধ নিয়েছে সে।

এবার?

আবার মুখ তুলল রানা। ছুটে আসছে সিপাইগুলো। কিন্তু খামোকা ধরা দেবে কেন সে? এদের হাতে ধরা দেয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। কি অপরাধ করেছে সে যে বিনা বাধায় মৃত্যু বরণ করবে?

তিন লাফে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল রানা। কম্পাউণ্ডের ভিতর থেকে গুলি ছুঁড়ল কেউ। চাবি লাগিয়ে খুলে ফেলল রানা দরজা। আরেকটা গুলির আওয়াজ। ঠং করে গাড়ির বডিতে লাগল গুলি। উঠে বসল রানা ড্রাইভিং সীটে।

পেরেরার গায়ের উপর দিয়ে টপকে ছুটল গাড়ি রাস্তার দিকে। আরও কয়েকটা গুলির শব্দ পাওয়া গেল। দেয়াল টপকে চলে এসেছে কয়েকজন, হৈ-হৈ করে ছুটছে গাড়ির পিছন পিছন।

রাস্তায় উঠেই বামদিকে স্টিয়ারিং কেটে চট করে ডানদিকে চাইল একবার রানা। চারটে জীপেরই এক্জস্ট পাইপ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নড়ে উঠল গাড়িগুলো। নিশ্চয়ই সেনানায়েকের আদেশে পিছন পিছন তাড়া করবার জন্যে ঘুরানো হচ্ছে জীপগুলো।

অ্যাক্সিলারেটার চাপল রানা। যতটা এগিয়ে থাকা যায় ততই লাভ। রিয়ার ভিউ মিররে দেখতে পেল সে টপাটপ উঠে পড়ছে সিপাইগুলো জীপের মধ্যে।

সামনের দুটো জীপ রওনা হয়ে গিয়েছে। সাইরেন বাজিয়ে আসছে ওরা তেড়ে।

এভাবে পালানো যাবে না, বুঝতে পারল রানা। দশ মাইলও যেতে পারে কিনা সন্দেহ। দ্রুত চিন্তা চলল ওর মাথার মধ্যে। কিছু একটা ব্যবস্থা না করলে নির্ঘাত ধরে ফেলবে ওকে সেনানায়েক। বিশ লাখ টাকা আছে ওর কাছে—কিন্তু টাকায় আর কাজ হবে না। সেনানায়েক টাকাগুলো তো নেবেই, ফাঁসীকাঠেও ঝোলাবে ওকে।

লোকের ভিড়ে বেশি স্পীড তোলা যাচ্ছে না গাড়িতে। পিছন পিছন চারটে জীপকে সাইরেন বাজিয়ে আসতে দেখে সব গাড়ির ড্রাইভার কৌতূহলী হয়ে স্পীড কমাচ্ছে আরও। ভারি অসুবিধায় পড়ল রানা। ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তার সবার চোখে পড়ে যাচ্ছে সে আরও বেশি করে। সামনের একটা ট্রাফিক পুলিস হাত দেখাল রানাকে থামাবার জন্যে। থামল না ও। রানার মতলব টের পেয়েই হাতের ব্যাটন ছুঁড়ে মারল লোকটা। চট করে মাথা নিচু করল রানা। চুরচুর হয়ে গেল সামনের উইণ্ডশীল্ড।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলল মাথায়। ধরা যদি পড়তেই হয় টাকাগুলো ইন্সপেক্টরকে দিয়ে লাভ কি? তারচেয়ে এই টাকা ব্যবহার করে যাতে এদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সে চেষ্টা করাই ভাল। চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই। তাছাড়া যার জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করে টাকাগুলো জোগাড় করেছিল, সে-ই তো নেই। নিজের জন্যে তো সে চুরি করেনি, কি করবে এত টাকা দিয়ে?

একটানে পিছনের সীট থেকে সুটকেসটা নিয়ে এল রানা পাশের সীটে। বাম হাতে খুলে ফেলল ডালা। থরে থরে সাজানো আছে বিশ লাখ টাকা। পাঁচশো টাকার নোটের বাণ্ডিল। একটা বাণ্ডিল তুলে নিল রানা, দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলল রাবার ব্যাণ্ড, তারপর ছুঁড়ে দিল উইণ্ডশীল্ডের ফাঁক দিয়ে উপর দিকে।

প্লেন থেকে ছাড়া হ্যাণ্ডবিলের মত ছিটিয়ে গেল টাকাগুলো চারদিকে। পুলিস জীপের সাইরেন শুনে রাস্তার পাশের লোকগুলো অবাক হয়ে দেখছিল, টাকা দেখে টপাটপ টোকাতে আরম্ভ করল। কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ওদের মধ্যে। দিশা হারিয়ে রাস্তার মাঝখানে চলে এল অনেক লোক। ব্রেক চাপতে হলো পিছনের জীপকে।

ততক্ষণে আরেক বাণ্ডিল উড়িয়ে দিয়েছে রানা।

জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো। টাকার ক্ষমতা টের পেল রানা স্পষ্ট। শেষ বাণ্ডিলটা যখন উড়িয়ে দিল রানা তখন পুলিসের জীপ মাইল চারেক পিছিয়ে পড়েছে। গল্ থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে চলে এসেছে সে। যেখানেই হাটবাজার বা লোকের ভিড় দেখেছে, সেখানেই টাকা ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে রানা। হুলস্থুল পড়ে গেছে লোকজনের মধ্যে।

কালুতারায় এসেই প্ল্যান পরিবর্তন করল রানা। মেইন রোড ছেড়ে একটা সরু রাস্তা ধরে চলে এল বেশ খানিক দূর। পেট্রল পাম্প বা সার্ভিস স্টেশন খুঁজছে সে—খোলা গ্যারেজ পেয়ে গেল একটা। ছোট্ট একটা একতলা বাড়ির গ্যারেজ। সাহেব আর মেমসাহেব বোধহয় বেড়াতে গেছে। সোজা ঢুকে পড়ল রানা

গ্যারেজে। গাড়িটা ওখানেই রেখে দরজা টেনে দিয়ে হেঁটে চলে এল সে বড় রাস্তায়।

একটা স্টেশনারী স্টোরে ঢুকে চেহারা পাল্টাবার কিছু সরঞ্জাম কিনল রানা। দোকান থেকে বেরিয়ে লোকের ভিড়ে মিশে গিয়ে দেখল অ্যালার্ম সাইরেন বাজাতে বাজাতে দ্রুত চলে গেল চারটে জীপ কলম্বোর পথে।

মুচকে হাসল রানা একটু। তারপর চলে এল কালুতারা রেলওয়ে স্টেশনে।

কাণ্ডির টিকেট কাটল রানা। এক ঘন্টা পর আসবে ট্রেন।

মনে পড়েছে, খিরুগনসম্পন্দমুথিউনাইনার পিল্লাইয়ের হোটেলে একটা কাবার্ডের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল সে ওর পাসপোর্ট। একঘন্টা সময় আছে হাতে—চেহারাটা পাল্টে নিতে হবে। তারপর প্রচুর মদ খেয়ে ভুলে যেতে হবে সবকিছু।

ভেঙে গেছে মনটা।

পৃথিবীর কারও কোন স্মৃতি আর মনে রাখতে চায় না রানা।

— ০ —

মাসুদ রানা

বিস্মরণ

কাজী আনোয়ার হোসেন

ছুটিতে বেড়াতে গেল রানা সিংহলে।
নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ল সে কান্ডির দুর্ধর্ষ সর্দার রঘুনাথ জয়ামান্নের এক হীন চক্রান্তে।

তারপরই ঘটল বিস্মরণ।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০